স্বামী বিবেকানন্দ
ও
বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দ
ও
বাঙলায় উনবিংশ শতাব্দী

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী
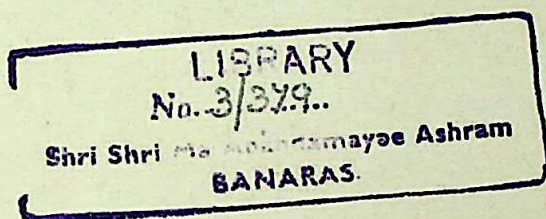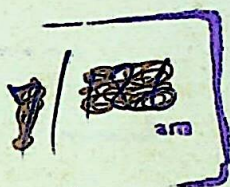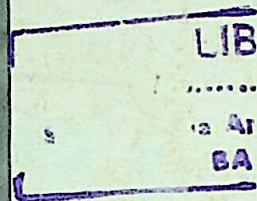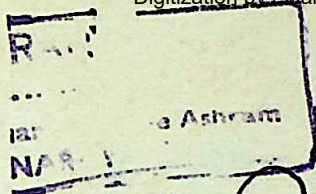
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী
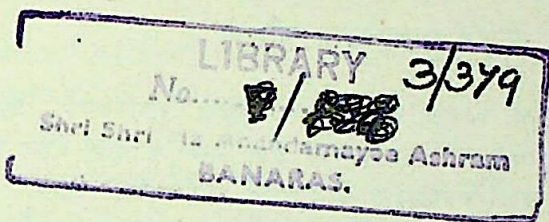
নবভারত পাবলিশার্স
কলিকাতা—১

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, আই-সি-এস,
বোম্বাই হাইকোর্টের জজ (অবসরপ্রাপ্ত)
করকমলেষু

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

১৯১৮। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে আমি বারোটি বক্তৃতা দিয়াছিলাম। তাহাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী পুস্তকাকারে প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়। আজ ঊনত্রিশ বৎসর পরে ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য ও নবভারত পাবলিশার্সের উদ্যোগে এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ ছাপা হইল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ আরো অনেকবার ছাপা হইতে পারিত, কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। সেজন্য পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার গুরু পরলোকগত ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "Dynamic from beginning to end Thrilling without indulging in cheap emotionalism."

আমার এই গ্রন্থ প্রথম ছাপাইবার পূর্বে ইহার পাণ্ডুলিপি আর্তের ত্রাণকর্তা দয়ার-সাগর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে দেখাইয়াছিলাম। রাজা রামমোহনের লেখায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া দেশবন্ধু আমার অভিমত সমর্থন করিয়াছিলেন।

আমি নূতন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অভিমতই বহাল রাখিলাম। কোন পরিবর্তন করার মত কিছুই পাইলাম না।

৭।১, বিপ্রদাস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৯

গ্রন্থকার

ভূমিকা
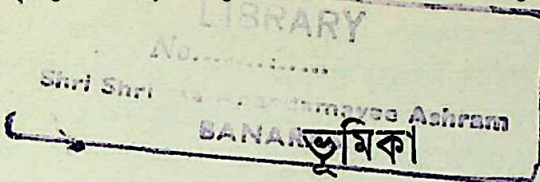
এই পুস্তকের দ্বাদশটি পরিচ্ছেদে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন বিভাগের সমস্যাগুলি, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকা সত্ত্বেও, ঐ সকল বিভাগের পৃথক্ ও স্বাধীন আলোচনা বিজ্ঞান-সম্মত ও সম্ভব মনে করিয়া—ক্রমে তাহার আলোচনা করিব—আশা করিতেছি। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। তথাপি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়াও সমাজের একটা পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, জীবন আছে, গতি আছে। গত শতাব্দীর আলোচনায়—রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মহাপুরুষদিগের প্রখর ব্যক্তিত্বের উপর, এবং তদতিরিক্ত সমাজের পৃথক্ প্রাণ-শক্তি ও গতির উপর সমানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বাঙ্গলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীই মুখ্যতঃ এই বক্তৃতাগুলির আলোচ্য বিষয়। এই শতাব্দীতে রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে চিন্তার যে অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা রহিয়াছে, আমি তাহাকেই অনুসরণ করিয়াছি। এই শতাব্দী একটি সভ্য জাতির সভ্যতার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, গ্রন্থের আলোচ্য সংস্কারের ধারা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আরম্ভ কিংবা শেষ হয় নাই। ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে কোন নূতন চিন্তা বা ভাবরাশি সন তারিখ দেখিয়া আরম্ভ হয় না। ইতিহাসের পথে অবিচ্ছিন্ন এক বা একত্রে বহু ধারা অব্যাহত রাখিয়া মাঝে মাঝে নূতন তরঙ্গ তোলে মাত্র। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে, ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালী-সভ্যতার এক অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। অন্য দিক্ দিয়া যদি দেখা যায়, তবে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্বেই রাম-মোহনের চিন্তা নবোদিত সূর্যের মত রক্তিম হইয়া দেখা দিয়াছে—এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেলেও বিবেকানন্দের প্রতিভা নির্বাপিত হয় নাই—দীপ্তি পাইতেছে।

একদিকে স্বদেশীয় রক্ষণশীল পণ্ডিতগণ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া মরিতে ইচ্ছুক; অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঘর ছাড়িয়া একেবারে বাহিরে যাইবার জন্য উন্মনা। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার ধারা, ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিবার বিষয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমার—রাজনারায়ণ

—বিদ্যাসাগর—কেশবচন্দ্র এবং শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, পণ্ডিত বিজয়-কৃষ্ণ প্রভৃতি শতাব্দীর ইতিহাসে চিরপূজ্য স্মরণীয় ব্যক্তিগণ, কে কি ভাবে কোন দিকে চিন্তার ধারাকে চালিত করিয়াছেন যথাক্রমে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।

এই শতাব্দীকে যেরূপভাবে ভাগ করা হইয়াছে তাহা আমার নিজের ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি করিয়াছি। পুরাণ এবং তন্ত্রের যুগকে আমি কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কেননা উনবিংশ শতাব্দী হইতে এখনো পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ আপামর সাধারণের মধ্যে রাজত্ব করিতেছে।

এই বক্তৃতাগুলি ৯।১০ বৎসর পরে ছাপা হইল। ছাপাইবার পূর্বে কোন কোন স্থানে সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছি। শতাব্দীর আলোচনায় আমার যে মত তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। গ্রন্থে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-সভ্যতা এক অতি জটিল ব্যাপার। প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু-সভ্যতার একটা স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। গত শতাব্দীর আলোচনায় বাঙ্গালী-সভ্যতাকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-সভ্যতার সহিত তুলনা-মূলক বিচার করিতে পারি নাই। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা একে অন্যকে কিরূপ-ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহারও বিশ্লেষণ করি নাই। অথচ, বাঙ্গালী-সভ্যতার সহিত ইহাদের একটা ঘনিষ্ট যোগসূত্র আছে। কেননা, সমগ্র হিন্দু-সভ্যতাই একটা অখণ্ড বস্তু—একটা জীবন্ত প্রাণিবিশেষ। প্রদেশ ভেদে উন্নতি বা অবনতির পথে স্তরভেদে হিন্দু-সভ্যতা বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—আজও চলিতেছে। বাঙ্গলাদেশের যে ধারা আমি তাহারই আলোচনা করিয়াছি মাত্র।

১৯১৮ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দশটি বক্তৃতা বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়োজনে, কলিকাতা থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে আমি পাঠ করি। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নবম ও একাদশ এই দুইটি বক্তৃতা লিখিয়াছি ও 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে।

এই বক্তৃতাগুলি ছাপা হইবার সময় প্রথম দিকে আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শেষের দিকে 'আশুতোষ কলেজে'র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ইহার প্রুফ্ সংশোধন করিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিবেকানন্দ সোসাইটির যে সকল সভায় আমি এই বক্তৃতা-গুলি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, °মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, °পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় °সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

ভবানীপুর,
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭।

বিনীত
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শতাব্দীতে মূর্তিপূজার সমস্যার গুরুত্ব, ৮৩—ব্রহ্মসভার আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ৮৩—মূর্তি পূজা সম্পর্কে রাজা রামমোহনের পরে, তত্ত্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে নূতন কিছু নাই, ৮৪—দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করিয়াছেন মাত্র। বিশ্লেষণমূলক কোন গবেষণা তাহাতে দেখা যায় না, ৮৪—মূর্তিপূজা সম্পর্কে অক্ষয়কুমার প্রত্যক্ষবাদী ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী, ৮৪—কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান, ৮৪—কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের কোন কোন দিক রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের সাধনার অনুরূপ, ৮৫—সমগ্র সংস্কার যুগে কেশবচন্দ্রের এই শ্রেণীর ধর্মানুভূতির তুলনা নাই, ৮৫—কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্মের প্রেরণা দ্বারা মূর্তিপূজাকে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের সিদ্ধান্ত হইতে কেশবের খৃষ্টধর্মের সিদ্ধান্তে পার্থক্য বিদ্যমান, ৮৫—রামমোহনে মূর্তিপূজার প্রেরণা প্রথমে মুসলমান ধর্ম হইতে আসিয়াছিল, ৮৬—রামমোহনের সিদ্ধান্ত ও কেশবচন্দ্রের সাধনায় মূর্তিপূজা আংশিকভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা রূপকের আকারে স্বীকৃত হইয়াছে, ৮৬—গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ প্রথম ধর্মজীবনে মূর্তিপূজা বিরোধী। পরে মূর্তিপূজক সিদ্ধমহাপুরুষ। সংস্কার ও সমন্বয়যুগের প্রভাব তাঁহার জীবনে যেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে, এমন কাহারও জীবনে হয় নাই, ৮৬—রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ যুগ না বলিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যুগ বলিবার কারণ, ৮৭—রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ ছিল, বিজয়কৃষ্ণের বিবেকানন্দ বা তাঁহার মত প্রচারক ছিল না, ৮৭।

মূর্তিপূজা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ — পৃঃ ৮৮—৯৬

পরমহংসদেব মূর্তিপূজক ছিলেন, ৮৮—পরমহংসদেবের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে পণ্ডিত মোক্ষমূলার, ৮৮—পরমহংসদেব কালীমূর্তি পূজা করিতেন, সুতরাং প্রধানতঃ তাঁহাকে তান্ত্রিক বা শাক্ত বলা যাইতে পারে, ৮৮—পরমহংসদেব মূর্তিপূজার জীবন্ত আলেখ্য, ৮৮—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মূর্তিপূজক, প্রধানতঃ বৈষ্ণব মতাবলম্বী, ৮৯—মূর্তিপূজার অপরাধে ব্রাহ্ম-সমাজ বিজয়কৃষ্ণকে তাঁহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, ৮৯—বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মের যুগাবতার, ৮৯—বিজয়কৃষ্ণের তীর্থ ভ্রমণ, ৯০—বিবেকানন্দের মতে মূর্তিপূজা পাপ নহে, ৯০—দুর্গোৎসবে রামমোহন ও বিবেকানন্দ, ৯০—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র মূর্তিপূজা বিরোধী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মূর্তিপূজক, ৯১—মূর্তির সাহায্যেও ব্রহ্মলাভ হয়, ৯১—অমূর্তের ধ্যানেও ব্রহ্মলাভ হয়, ৯২—কেবল মূর্তি অথবা অমূর্তের পূজা দেখিয়া সাধকের বুদ্ধি বা জ্ঞানের তারতম্য করা উচিত নয়, ৯২—নৈতিক বলেরও তারতম্য করা উচিত নয়, ৯৩—সকল জাতির মূর্তিপূজা অথবা একজাতির মধ্যেই সর্বপ্রকার মূর্তিপূজা একশ্রেণীর নহে, এক স্তরেরও নহে, ৯৩—নিগ্রোজাতির কালপাথর পূজা আর বাঙ্গালী হিন্দুর শালগ্রাম শিলাপূজা এক বস্তু নহে, ৯৩—নিগ্রোজাতির ঈশ্বরজ্ঞান আর বাঙ্গালী হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান যাহা কালপাথরে আরোপিত হইয়া পূজিত হয় তাহা এক বস্তু নয়, স্বতন্ত্র, ৯৪—বাঙ্গালীর মূর্তিপূজায় একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ৯৪—রাজা রামমোহনের তন্ত্রে পক্ষপাতিত্ব, ৯৪—রামমোহন বাঙ্গালীর মূর্তিপূজার বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই, ৯৫—মূর্তিপূজায় রামকৃষ্ণের মাতৃভাব, বিজয়কৃষ্ণের কান্তভাব, বাঙ্গালীর ধর্মসাধনার দুইটি বৈশিষ্ট্য এ যুগে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত, ১২১—কল্পনার বাহুল্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদই সমীচীন বলিয়া মনে হয়, ১২২—স্বামী বিবেকানন্দ রাজার সংস্কার প্রণালীর মধ্যে সৃজন করিবার চেষ্টা ও শক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহা রাজার পরবর্তীদের মধ্যে ছিল না, ১২২—স্বামী বিবেকানন্দের মতে রামমোহনের দুইটি ভ্রমের উল্লেখ, ১২২—আমেরিকার জনৈক শিষ্যার নিকট রামমোহন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত, ১২৩—সমাজ একটি জীবন্ত প্রাণীর মত কিনা? সমাজের একটা গতি ও পরিবর্তন স্বাভাবিক কিনা? সমাজস্থ নরনারী সামাজিক গতিমুখে সৎ অসৎ বিবেচনা করিয়া কার্য করিবে কিনা, ১২৩—রামমোহনের সিদ্ধান্তে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সৎ অসৎ বিবেচনা করিয়া ও ক্রিয়ার দোষগুণ বিচার করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবে। কেবল পশুর মত স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করিবে না, ১২৩—রামমোহনের উক্তির বিশ্লেষণ, ১২৪—রামমোহন ও সমাজ-বিজ্ঞান, ১২৪—ধর্ম ও সমাজ সংস্কার অংগাংগীভাবে আবদ্ধ। রামমোহনের সিদ্ধান্তে ধর্ম সমাজের একটা অংগ বিশেষ, ১২৪—অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সমাজ সংস্কারের ভিত্তি হইতে পারে কিনা, ১২৫—লর্ড আমহার্স্টের নিকট রামমোহনের চিরস্মরণীয় চিঠি, ১২৫—রামমোহন মায়াবাদের উপর সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিয়া খৃষ্টান নীতিবাদের আশ্রয় লইয়াছেন, ১২৫—অদ্বৈতবাদ স্বীকার ও মায়াবাদ অস্বীকারের অসংগতি, ১২৫—ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সমন্বয় ঠিক সমন্বয় বলা যায় না, ১২৫—মায়াবাদী হইলে ব্যবহারিক লোকযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, ১২৬—রামমোহন ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহস্থ হইবার উপদেশ দিয়াছেন, ১২৬—সমাজ সংস্কারে রামমোহনের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে কিঞ্চিৎ স্ববিরোধিতা দৃষ্ট হয়, ১২৬—দেবেন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারক নহেন। তাঁহার অদ্বৈতের ভূমি পরিত্যাগের কারণ, ১২৭—দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারে উৎসাহী। সমাজ-সংস্কারে অপেক্ষাকৃত উদাসীন, ১২৭—রামমোহনের ধর্মের সহিত সমাজ-সংস্কারের অভিপ্রায় দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই, ১২৮।

সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগর পৃঃ ১২৮—১৩২

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত ১২৮—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা আইন বিধিবদ্ধ হয়। বিধবা বিবাহ ও রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ ও স্যার রাধাকন্ত দেব বাহাদুর, ১২৯—বিদ্যাসাগরী সংস্কার প্রণালী রামমোহনী সংস্কার প্রণালীর অনুরূপ-শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়মূলক, ১৩০—বিধবা বিবাহ ও স্বামী বিবেকানন্দ, ১৩০—বিধবারা নিজেরাই নিজেদের বিবাহ সম্বন্ধে জ্ঞানধর্মে-উন্নত হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবেন, ১৩০—কেশবচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে হিন্দু-ভাবাপন্ন নহে, ১৩১—হিন্দু আইনের অন্তর্ভুক্ত হইলেই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না, ১৩১।

সমাজ-সংস্কারে স্বামী বিবেকানন্দ পৃঃ ১৩২—১৩৬

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক তৎকালীন সমাজ-চিত্র আশাপ্রদ নহে, ১৩২—সমাজ-সংস্কারে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী সংস্কারকদের সহিত একমত নহেন। আবার যুক্তিহীন, উন্নতির পরিপন্থী রক্ষণশীল সমাজের কুসংস্কারেরও পক্ষপাতী নহে, ১৩৩—বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের

নবম পরিচ্ছেদ

বাঙগলা সাহিত্যে বীরের উপযোগী সৎসাহসের অভাব, ১৪৯—রাজশক্তি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অন্যান্য বিভাগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবনতি দেখা যায়, ১৫০—অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত ও বৈষ্ণব পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ১৫০।

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বাঙগালী-সভ্যতা পৃঃ ১৫১—১৫৯

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ও শেষ যথাক্রমে রামমোহন ও বিবেকানন্দ বাঙগলার মধ্য-যুগকে অতিক্রম করিয়া নবযুগের, বিশ্বমানবের বিশালতর ক্ষেত্রে, বাঙগালী তথা ভারতবাসীকে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ১৫১—রামমোহন, ১৫১—স্মৃতি, দায়ভাগ, মীমাংসা, ১৫২—শাক্ত ও বৈষ্ণবের কলহের মধ্যে শাঙ্কর অদ্বৈতের প্রয়োজন, ১৫২—দর্শনশাস্ত্রের অবনতি, ১৫২—বাঙগলা সাহিত্যে গদ্য, ১৫৩—রাজনীতিক্ষেত্রে বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ, ১৫৩—রামমোহন ও বাঙগালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ১৫৩—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৫৪—ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, ১৫৪—দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক শাঙ্কর অদ্বৈত খণ্ডনের চেষ্টা, ১৫৪—ব্রাহ্ম-ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ইউরোপের দর্শন, ১৫৫—শাক্ত ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি অনেকাংশে অদ্বৈত বেদান্ত। বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ"; ১৫৫—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহ ও সমাজ-সংস্কার, ১৫৬—শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়, ১৫৬—কেশবচন্দ্র ও অসবর্ণবিবাহ; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের বিবাহ, ১৫৬—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙগলায় ছিল শাক্ত আর বৈষ্ণব। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙগলায় দেখা গেল শাক্ত বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম, ১৫৭—কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না, ১৫৮।

দশম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস আলোচনা পৃঃ ১৫৯—১৭০

রামমোহন-প্রতিভার সর্বতোমুখী বিস্তার, ১৫৯—শঙ্কর দার্শনিক। রাম-মোহন ও বিবেকানন্দ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, ১৬০—সমাজ-সংস্কারে অতীত ইতিহাস আলোচনার আবশ্যকতা, ১৬০—বিবেকানন্দের ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার, ১৬১—স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাসের আদর্শে ব্যষ্টিমুক্তি ছাড়িয়া সমষ্টি মুক্তির অবতারণায় মধ্যযুগের অদ্বৈতবাদ-সংশ্লিষ্ট মায়াবাদ ও কর্ম সন্ন্যাস প্রশ্রয় না পাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ১৬২—ভারতেতিহাসের গবেষণায় বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত রামমোহনের সিদ্ধান্তের অনুরূপ, ১৬২—উভয়ের অনুরূপ সিদ্ধান্তের মধ্যেও মৌলিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান, ১৬৩—হিন্দুযুগে রামমোহনের মতে রাজশক্তি এবং বিবেকানন্দের মতে প্রজাশক্তির মধ্যে একতার অভাব। বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে রামমোহন নীরব, ঐ যুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত, ১৬৩—মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতেতিহাস সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দ একমত, ১৬৪—রামমোহনের মতে মুসলমান আক্রমণের কারণ, ১৬৪—বিবেকানন্দের মতে মুসলমান আক্রমণের কারণ, ১৬৫—মুসল-মান যুগে রামমোহনের দৃষ্টি রাজনীতির দিকে, বিবেকানন্দের দৃষ্টি ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের দিকে, ১৬৬—বাঙগলাদেশে মুসলমান যুগের ধর্মবিপ্লবে রাম-মোহন ও বিবেকানন্দের মত পার্থক্য, ১৬৬—ভারতেতিহাসে বৌদ্ধ দলনে ব্রাহ্মণ ও

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী ১৮০০ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ

(সংস্কার যুগ) পৃঃ ১৮৬—১৯৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সংস্কারক্ষেত্রে চারিটি বিভিন্ন ধারা, ১৮৬—পঁচিশ বৎসর আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-প্রথা আইনদ্বারা রহিত করা হয়, ১৮৬—সতীদাহ রহিতকল্পে আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৬—সতীদাহে বলপ্রয়োগ, ১৮৭—সতীদাহে বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে রামমোহনের উক্তি, ১৮৮—রাজা রামমোহনের মতে সতীদাহে বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে লোকসকলের উদাসীনতার কারণ, ১৮৮—সতীদাহ নিবারণকল্প রামমোহনের শাস্ত্র যুক্তির সমন্বয়ে তিনটি অভিমত, ১৮৯—রামমোহনের অভিমত—সমস্তদেশের লোক একমত হইয়া যাহা করে তাহাও অধর্ম হইতে পারে। সতীদাহ সমস্তদেশের লোক একমত হইয়া করিলেও অধর্ম, ১৮৯—রামমোহন রায়ের মতে স্ত্রীলোকদের দুর্বলতা সংস্কারের ফল হয়, স্বভাবসিদ্ধ নহে, কেবল শারীরিক বলে তাহারা পুরুষ অপেক্ষা হীন, ১৮৯—বুদ্ধির বিষয়, ১৯০—অস্থিরান্তঃকরণের বিষয়, ১৯০—বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, ১৯০—'সানুরাগ' স্ত্রী কিংবা পুরুষ অধিক, ১৯০—স্ত্রীলোকের ধর্মভয় অল্প বিষয়ে, ১৯১—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গার্হস্থ্যে অর্থাৎ পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের কর্তব্য অর্থাৎ করণীয় কার্য দাস্য-বৃত্তি, ১৯১—জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ৪৮ বৎসর পূর্বে রামমোহন বাঙ্গালীকে তাহাদের নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে অধিকতর উদার কথা বলিয়াছেন, ১৯২—রামমোহন ও নারীজাতির দায়ভাগ আইনে বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার, ১৯৩—মধ্যযুগে বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার হইতে নারীজাতি বঞ্চিত হওয়াতে সতীদাহ ও বহু বিবাহের প্রচলন ক্রমে অধিক হইতেছিল, ১৯৩—স্যার রাধাকান্ত দেব সহ-মরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার বিরোধী হইলেও স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে শতাব্দীর প্রথমে অগ্রণী ব্যক্তি, ১৯৩।

ঊনবিংশ শতাব্দী ১৮২৫ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ

(সংস্কার যুগ) পৃঃ ১৯৪—১৯৭

বেথুন ও বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৪—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ইতিহাস, ১৯৪—দেশীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিচার—যুক্তি ও শাস্ত্র—দেশাচার ও সামাজিক আচার পরিবর্তনশীল—সমাজ সংস্কারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ, ১৯৪—বিধবা বিবাহে জাতিভেদ রহিয়া গেল, ১৯৫—বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া সম্পর্কে দুইটি কারণ, প্রথম সামাজিক দুর্নীতি; দ্বিতীয় বিধবাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ১৯৬—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের বিবাহ, এই বিবাহে জাতি-ভেদ নাই, ১৯৬।

ঊনবিংশ শতাব্দী ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ

(সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অথচ সমন্বয়যুগ) পৃঃ ১৯৭—১৯৯

ঊনবিংশ শতাব্দীর চারিভাগের শেষভাগে সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ১৯৭—ভগিনী নিবেদিতা ও বিধবা-বিবাহ, ১৯৭—হিন্দুনারীগণ পরিবারের পবিত্রতা রক্ষাকল্পে যত্নবতী, পাশ্চাত্য নারীগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি উদ্বোধনে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ একুশ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও মাদ্রাজের যুবকগণ

সাক্ষাৎ শিবতুল্য স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে, বাঙ্গালী মাত্রেরই মান্দ্রাজের যুবকগণ ও বিশেষভাবে স্যার * সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয়ের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। খেতড়ির মহারাজা অজিৎ সিংএর নামও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কেন না, ইঁহারাই স্বামিজীকে পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমেরিকা যাওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া, তাঁহার অভ্যুদয়ের ও তাঁহার পৃথিবী-ব্যাপী প্রচার-ব্রতের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজী নিজেই বলিয়াছেন ঃ

"মান্দ্রাজের যুবক, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সব করিয়াছ—আমি সাক্ষীগোপাল মাত্র।"

মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া হলে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন,

"আমি মান্দ্রাজের কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে আমেরিকায় পৌঁছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন—কেবল একজনকে অনুপস্থিত দেখিতেছি—জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার। আর আমি এই ক্ষেত্রে উক্ত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি আমার গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাতে প্রতিভাশালী পুরুষের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান আর এ জীবনে ইঁহার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু আমি পাই নাই, তিনি ভারতমাতার একজন যথার্থ সুসন্তান।"

ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহার সমস্ত কারণ আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আনিয়া ধরা যায় না। কার্য-কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দৃশ্য কারণই আমাদের আলোচ্য ও বিচার্য। অদৃশ্য কারণ আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। আমাদের জ্ঞানের পরিধি সহসা কোন আশ্চর্য উপায়ে পরিবর্তিত না হইলে, এবং সিদ্ধ মহাপুরুষ বা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাদের আবির্ভাব ব্যতিরেকে, ঐতিহাসিক ঘটনার অদৃশ্য

---

* ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে ইনি চিঠি লেখাতে গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হয়েন। জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ার তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের এই কার্যের প্রতিবাদস্বরূপ স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি ৫।১২।২৪ তারিখে রাত্রি ৮।৪৫ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

কারণ সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ মানুষকে চিরকালই বহু পরিমাণে অজ্ঞান অথবা সংশয় তিমিরে আচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। অথচ সৃষ্টির মূলদেশে, আমাদের চক্ষুর অন্তরালে, কি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে যাহাতে মহাপুরুষেরা যুগে যুগে সংসার-রঙ্গমঞ্চে আসিয়া একের পর আর আবির্ভূত হন। সেই অদৃশ্য শক্তি, সেই অদৃশ্য কারণকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে না পারিলেও, তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করি কি করিয়া?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ যে কি, কি অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় যে তিনি একদিন আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তা সেই অদৃশ্য শক্তিই জানেন। শুধু, যাহা দেখিতে পাই, এমন সব ঘটনার পূর্বাপর সংযোগ করিয়া, তাঁহার উপদেশের সহিত তাঁহার কালের যে অভিপ্রায়টি, তাহার কোথায় মিল আর কোথায় বিরোধ, খুঁজিয়া লইয়া, তাঁহার আগমনের, তাঁহার জীবনের, তাঁহার প্রচারের সাফল্য, এবং কোথায় কতদূর পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত, বুঝিবার চেষ্টা করি। সুতরাং আমাকে আবার বলিতে হইতেছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের দৃশ্য কারণ ও তাহার ফলই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। অদৃশ্য কারণ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী না হইয়াও আমরা নীরব থাকিতে বাধ্য।

ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, মানুষের চিন্তা ও ভাবনা সকল অত্যন্ত সংক্রামক। মনুষ্য-উদ্ভাবিত এই সমস্ত চিন্তা ও ভাবরাশি এক যুগ হইতে অন্য যুগে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংক্রামিত হয়। এই সমস্ত ভাবরাশি গতিশীল, তাহারা কোথায়ও স্থির থাকে না। স্থানে ও কালে, অবস্থাভেদে, নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহারা উত্তরোত্তর ছড়াইয়া পড়ে। কোন বিশেষ জাতিতে বিশেষ যুগে, যে সকল মনুষ্যের মধ্যে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ভাবরাশি একত্রিত হইয়া সংহত হয়, সেই সমস্ত মনুষ্যেরা সেই জাতির ও সেই যুগের সংহত ভাবরাশির দ্যোতক ও প্রকাশক বলিয়া যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষরূপে স্বীকৃত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর উন্মেষ কাল হইতেই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কতকগুলি নূতন ভাবের প্রেরণা আসিয়া দেখা দেয়। এই সমস্ত ভাবরাশি ক্রমে শতাব্দীকাল ধরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের মধ্যে, প্রকৃতিভেদে পরিবর্তিত ও আবর্তিত হইয়া একদিন কিরূপে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাহা কি রূপ ও সুর পাইয়া জাতীয় জীবনের গতিকে কোন্ পথ হইতে কোন্ পথে চালিত করিয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভাবই জাতিকে চালিত করে। নূতন নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইতেই নূতন নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। বহুবিচিত্র নূতন ভাবের সমাবেশ যে জীবনে দেখা যায়, তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হন। মহাপুরুষেরা মহান্ মহান্ ভাব দ্বারা চালিত হন মাত্র এবং তাঁহাদের অভ্যুদয়ের সহিত জাতির অভ্যুদয় হয়,

তাঁহাদের গতি ও মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিও গতি-মুক্তি লাভ করে। কেন না, মহাপুরুষেরা জাতীয় শরীরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গবিশেষ।

বাঙ্গালী জাতির মধ্যে, গত এক শতাব্দীর এইরূপ ভাবরাশির গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া, কোন্ কোন্ মহাপুরুষের মধ্য দিয়া, কোন্ কোন্ ভাব কিরূপে স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—মুখ্যতঃ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

অথচ কার্য-কারণ সম্পর্কে আমরা কিছুই উপেক্ষা করিতে পারি না বলিয়াই, তাঁহার মহৎ জীবনের অভ্যুদয় যে ঘটনা দ্বারা সম্ভাবিত হইল, সেই আমেরিকা গমন সম্পর্কে মহানুভব ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও তাঁহার সহযোগীদের সময়োপযোগী উৎসাহ ও সহায়তা, আমরা বাঙ্গালীরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় চাঞ্চল্যের কারণ

আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করি তাহার কারণ কি? ইহার দুই প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। এক স্বাভাবিক অর্থাৎ ভিতরের কারণ, আর কৃত্রিম অর্থাৎ বাহিরের কারণ। প্রত্যেক জীবন্ত জাতিই গতিশীল, চঞ্চলতা তাহার জীবনের লক্ষণ। চলিবার পথে প্রত্যেক জাতিই একবার নিজকে সঙ্কোচন করে, আবার নিজকে সম্প্রসারণ করিয়া চলে। যখন এই সম্প্রসারণের ক্রিয়া ভিতর হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আরম্ভ হয়, তখন জাতির উপরিভাগে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ বাঙ্গালী জাতির এইরূপ একটি সম্প্রসারণ করিয়া চলিবার কাল। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই বাঙ্গালী জাতির সঙ্কোচনের কাজ শেষ হইয়া আসিতেছিল। কাজেই নিজের স্বভাব হইতেই, ভিতর হইতেই, বাঙ্গালী জাতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথমে নিজকে আর একবার সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভিতরের দিক হইতে জাতীয় চাঞ্চল্যের ইহাই স্বাভাবিক কারণ।

প্রত্যেক জাতিই আবার চলিবার পথে, তাহার বাহিরের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা দ্বারা অনেকটা নিয়মিত হইতে বাধ্য। প্রত্যেক জাতিই গতিমুখে তাহার আত্ম-স্বভাবকেই বিকাশ করে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই ঋজু-কুটিল গতি বহু পরিমাণে তাহার সাময়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা দ্বারা নিয়মিত হয়। বাঙ্গালী জাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে তাহার জীবন ধর্মের, তাহার স্বভাবধর্মের অনুবর্তী হইয়া পুনরায় এ যুগে আর একবার আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি তাহার তৎকালীন বাহিরের অবস্থা ও ঘটনা, এই জাতীয় চাঞ্চল্যের আকার ও প্রকৃতিকে বহু অংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গলা দেশ ও তৎসঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে ক্রমে আবদ্ধ

ও নিবন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত সমগ্র ইউরোপ ও পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের একটা সাধারণ ভাবগত সাদৃশ্য আছে। ইংলণ্ডের সহিত রাজা ও প্রজা, বিজেতা ও বিজিত—এই সম্পর্কের ভিতর দিয়া শুধু ইংলণ্ড নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির ভাব ও আদর্শ বাঙ্গলাদেশের উপরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ অনেক স্থলেই আমাদের সভ্যতার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। আর পাশ্চাত্য জাতিসমূহ, হয় আমাদের রাজা, না হয় রাজার সগোত্র। আমরা ছিলাম পরাজিত, পদদলিত, মুমূর্ষু ও নিঃসহায় একটা প্রাচীন জাতি। এইরূপ অসমান অবস্থায়, ভাগ্যাধীনে নিপাতিত, বাঙ্গালী জাতির উপর, পরাক্রমশালী একটা বিরুদ্ধ সভ্যতা তাহার স্বতন্ত্র আদর্শ লইয়া নিদারুণ ভাবে আঘাত করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে যে চাঞ্চল্য আমাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার আকার ও প্রকৃতি এইরূপে বহু পরিমাণে পাশ্চাত্যের আঘাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। বাহিরের এই বিরুদ্ধ পাশ্চাত্য শক্তির আঘাতজনিত যে চাঞ্চল্য, তাহা কৃত্রিম উপায়ে প্রসূত কৃত্রিম চাঞ্চল্য। বাহির হইতে আঘাত আসিতে পারে, শক্তি ভিতরের। আঘাত শক্তি নহে, শক্তির উদ্বোধনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে। আবার বাধাও জন্মাইতে পারে।

অনেকের বিশ্বাস যে ইংরেজের আগমনই আমাদের জাতীয় জাগরণের একমাত্র কারণ। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই বিশ্বাসের মূলে বিশ্লেষণ-মূলক বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ অতি অল্প। ইহা এক প্রকার অনুমান এবং সর্বাংশে সত্য নহে। ইংরেজ বা পাশ্চাত্য জাতির আঘাত—আঘাত মাত্র। আঘাত জাগরণ নহে। জাগরণ জাতির নিজের। বাহিরের এই কৃত্রিম আঘাতে আমাদের জাগরণে সহায়তা করিয়াছে, ইহাও অবিমিশ্র সত্য নহে। কেন না এই বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত যে শতাব্দীকাল ধরিয়া জাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও জাগরণকে কত দিকে কত মতে বাধা দিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে, তাহা অনুমান নহে, তাহা প্রত্যক্ষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আঘাত ও আক্রমণ একদিকে, আবার অন্য দিকে জাতির স্বাভাবিক জাগরণ এবং পাশ্চাত্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নানাবিধ উদ্যম; এই বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধ টানে আবর্তিত হইয়া যে সমস্ত চাঞ্চল্য বাঙ্গালী জাতি বিগত শতাব্দীতে প্রকাশ করিয়াছে, সেই চাঞ্চল্যের ইতিহাসই বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণীয় জীবনকে মিলাইয়া দেখিবার জন্য চেষ্টা করিব।

জাতীয় চাঞ্চল্যের লক্ষণ ও গতি

পাশ্চাত্যের এই আঘাত সমস্ত বাঙ্গালী জাতির উপরে কিছু একদিনে পতিত হয় নাই। ইহা সহসা বারিপ্রপাত নহে। ইহা শিশিরবিন্দুর মত অলক্ষ্যে পতিত

হইয়াছে। শতাব্দী কাল ধরিয়া দিনের পর দিন এই আঘাত আসিয়াছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই আঘাত তাহার রূপ বদলাইয়াছে, সুর বদলাইয়াছে। এই আঘাতের এক সম্মোহন শক্তি ছিল, আমরা আহত হইয়াও ইহাকে ধরিতে গিয়াছি, অনুকরণ করিতে গিয়াছি। আবার কেহ কেহ মুখ ফিরাইয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টাও করিয়াছি। তথাপি বাঙ্গালী জাতির সব অংশটা পাশ্চাত্যের এই আঘাত দ্বারা আহত হয় নাই। যে অংশ আহত হয় নাই, জাতির প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রেরণায় তাহাতেও চঞ্চলতা জাগিয়াছে। সেই অংশই জাতির নিম্নতর অথচ বড় অংশ। অথচ আমরা তাহার সংবাদ অতি অল্পই রাখি। বাহিরের কৃত্রিম আঘাতে মুষ্টিমেয় তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে কৃত্রিম চাঞ্চল্য জাগিয়াছে তাহাই আমাদের দৃষ্টিকে সমধিক আকর্ষণ করে। জাতির বড় অংশটা দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়।

এইরূপে জাতির যে অংশটা পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ দ্বারা আহত হইয়াছে, সে অংশটাও শিক্ষা-দীক্ষায় এক এবং অখণ্ড ছিল না। মানুষ মাত্রেই বিচিত্র। বিশেষতঃ জাতির ভাঙ্গা-গড়ার যুগের মানুষগুলি অতীব বিচিত্র। এইরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের উপর, দিনের পর দিন পাশ্চাত্যের যে সমস্ত বিচিত্র রকমের আঘাত আসিয়া পতিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের মধ্যে জাতীয় চাঞ্চল্যের বহুবিধ ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

এইরূপে জাতীয় চাঞ্চল্যের শতাব্দীব্যাপী বহুবিধ স্রোতধারা কখনও মিলিত হইয়া, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখনও এক পথে, কখনও বিপরীত পথে, কখনও একটানা স্রোতে, কখনও ঘুরিতে ঘুরিতে, একদিন শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে, স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কোন একটি বিশেষ স্রোতধারার সহিত স্বামিজীর জীবনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে পারে। কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে অল্পাধিক প্রায় সকল স্রোত-ধারাই, তাঁহার মধ্যে আসিয়া, তাহাদের পুণ্য-তীর্থ-বারি সিঞ্চনে, এই তেজস্বী প্রাণের, এই প্রবুদ্ধ বিবেকের অভিষেক করিয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান এবং ইতিহাস প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে বাধ্য।

যে কোন দিক দিয়াই বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শত বৎসরের জাতীয় চাঞ্চল্য, যাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহা শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক ও কেন্দ্র হইতে আহৃত ও সংহত হইয়া বাণী লাভ করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দ একটা জাতির দীর্ঘ এক বিচিত্র বিক্ষিপ্ত শতাব্দীর যোগফল। এই দিক হইতে দেখিলে, তাঁহার কথার ও কার্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এক শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়া-ছিল। যে সমস্ত ভাব ও প্রেরণা সুস্পষ্টরূপে এই জাতীয় চাঞ্চল্যের মধ্যে একটা

বিশেষ আকার ও বাণী লাভ করিয়াছিল, ইতিহাসের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া, তাহাদের ক্রমবিকাশ ও গতি, এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সেই সমস্ত ক্রমবিকাশমান গতিশীল ভাব ও প্রেরণাসমূহের কিরূপ পরিবর্তন, স্থলবিশেষে প্রতিবাদ এবং পরিণতি হইয়াছিল তাহাই আলোচ্য বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৮০০—১৮২৫)

আমরা বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রথম ভাগে জাতীয় চাঞ্চল্যের যে কয়েকটি ধারা বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া, শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে, স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের কাল অবধি, কখনও স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া, কখনও বা মিলিত ও মিশ্রিত হইয়া, কোথাও ঋজু, কোথায়ও বা বক্র-কুটিল গতিতে ধাবিত হইয়াছে, তাহার গতিবিধি যথাসাধ্য পর্যালোচনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন ভাবরাশির এই সমস্ত বিচিত্র স্রোতধারা কোন্ পথে, কোথায় কোন্ মহাপুরুষের মধ্যে, কিরূপ আকার ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রসঙ্গতঃ আমাদের দেখিতে হইবে। শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগে যদি কোন নূতন ভাবস্রোতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার গতিকেও যতদূর পারা যায়, লক্ষ্য করিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্যের বহিরাক্রমণ প্রসূত চারিটি বিশেষ বিশেষ পৃথক ভাবস্রোত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই চারিটি বিচিত্র ধারার মধ্যে তিনটির উৎপত্তি কলিকাতায়, অপর একটিও কলিকাতার অতি নিকটবর্তী শ্রীরামপুর হইতে জন্মলাভ করে।

(১) শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করিবার জন্য প্রাণপণ যে ধর্মান্দোলন, যে মূর্তিপূজার বিচার, যে হিন্দুর ষড়দর্শন ও পুরাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা, বাঙ্গলা ভাষার গদ্য ও ব্যাকরণ সৃষ্টিতে যে উদ্যম, সংবাদপত্র প্রকাশ ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠায় যে খৃষ্টানী সংস্কার-স্পৃহা জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সংস্কারযুগের একটি স্বতন্ত্র ধারারূপে ইতিহাসে গৃহীত হইবে।

(২) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, তাহা হইতে যেরূপ একটি বিশুদ্ধ অহিন্দু সংস্কারস্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার স্বাতন্ত্র্যগৌরবও কম নয়। ডিরোজীও এবং তাঁহার শিষ্যদের যে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন চিন্তাবাদীদের দল সংগঠিত হইল, হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রকাশ্য ও নির্ভীক আক্রমণ ও বিপ্লববাদের অঙ্গীয় স্বাভাবিক দুই চারিটি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখিয়া অনেকেই তেজস্বী ও মহাপ্রাণ ডিরোজীওর দেশপ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা, যাহা তাঁহার মনস্বী শিষ্যদের মধ্যেও বিশেষরূপে সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যান এবং ভুলিয়া গিয়া এই তীক্ষ্ণমেধা মহানুভব যুবকের প্রতি ও তাঁহার

অনুষ্ঠিত সংস্কার উদ্যমের প্রতি যে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা অনেক স্থলেই নিতান্ত অবিচার।

(৩) রাজা রামমোহন রায়ের রংপুর হইতে কলিকাতা আগমন, উপনিষদ ও বেদান্তপ্রচার, বেদান্ত প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার বিধি, পণ্ডিতদের সহিত বিচার, তুহাফ্‌তুলমোহায়িদ্দিনের পরে, রাজার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের পঙ্কোদ্ধার, সতীদাহ নিবারণ, ব্রহ্ম-সভার উদ্বোধন, শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগকে দমন ও তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন, রাজার বিলাত গমন প্রভৃতি এক বিশাল, প্রবল, প্রচণ্ড ধারা।

(৪) রামমোহনের বিরুদ্ধে সমগ্র রক্ষণশীল বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের মুখ-পাত্রস্বরূপ স্যার রাধাকান্ত দেবের সংরক্ষণ-নীতি ও রামমোহনের ব্রহ্মসভার বিরুদ্ধে রাধাকান্তের ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা ও মূর্তিপূজার সমর্থনকারীর শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি আর একটি ধারা। রামমোহন প্রতিদ্বন্দ্বী রাধাকান্তের স্ত্রীশিক্ষায় অনুরাগ ও স্ত্রী-শিক্ষাকল্পে তাঁহার আন্দোলন, এই রক্ষণশীল ধারার এক অতি গৌরবময় কীর্তি, ইতিহাস ইহাও বিস্মৃত হইতে পারে না।

এই চারিটি ধারা অল্পাধিক স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এক জাতির মধ্যে বলিয়া ইহাদের মধ্যে যে একটা ঐক্য আছে তাহা কখনও সুপরিস্ফুট হইয়া কোনরূপ সুর পায় নাই। ইহার প্রত্যেকটিই ইউরোপের সংঘাতজনিত। প্রত্যেকটিই অল্পাধিক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ। প্রত্যেকটিই কলিকাতার নব নাগরিক সংস্কার। অথচ আমরা বিস্মৃত হইব না যে, বিশাল বিস্তৃত বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতা তখন কতটুকু। যে নাগরিকগণ পাশ্চাত্যের এই ঘাত-প্রতিঘাত-রূপ দুই বিরুদ্ধ শক্তির বিপরীত টানে ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাঁহারাই বা কোন্ ক্ষুদ্র অংশ। তথাপি আঘাত যেখানে পাইবে সমাজ অঙ্গের সেখানেই প্রতিঘাত জাগিবে। জীব-শরীর হইতে সমাজ-শরীরের ইহাই অল্পবিস্তর পার্থক্য। বাহির হইতে কলিকাতার উপর যে কৃত্রিম আঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল, এই কৃত্রিম জাতীয় চাঞ্চল্য সেই আঘাতজনিত বিক্ষোভ মাত্র এবং এই সমস্ত বহু বিক্ষোভের ধারা, প্রকৃতি ও শিক্ষাভেদে, এই জাতীয় চাঞ্চল্যের বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন প্রকাশ।

এখন দেখা যাক, ইহার কোন্ ধারা কতদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া, চতুর্থ ভাগে স্বামী বিবেকা-নন্দের মধ্যে মিলিত হইয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই বা ইহার কিরূপ পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ইহার কোন্ ধারাই বা আবার মধ্যপথে লুপ্ত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত পৌঁছাইতেই পারে নাই। স্রোতমুখে কোনো খণ্ড ধারার উৎপত্তি হইয়াছে কিনা? এবং এই বিচিত্র চারিটি ধারা পথে আসিতে আসিতে মিলিত হইয়াছে কিনা। সে মিলনে মিলিত ধারার স্রোতাবেগ বৃদ্ধি

পাইয়াছে, না বিরোধজনিত আবর্তের সৃষ্টি করিয়া, ক্লেদ ও পঙ্ক বমন করিতে করিতে নিঃশেষিত হইয়াছে? স্বামী বিবেকানন্দ এই স্রোতাবর্তের পরিণতি নিজ জীবনে কিরূপে ধারণ করিয়াছেন? তাঁহার ব্যাপক ও গভীর জীবনের সাগর সঙ্গমে—এই সমস্ত খণ্ড ধারা এক অখণ্ড, উদ্বেলিত সমুদ্রের মত কিরূপ গর্জন করিয়াছে, সে গর্জনের, সে আরাবের সঙ্কেত কি, ইঙ্গিত কি, তাহাও লক্ষণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ (১৮২৫—১৮৭৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ লইয়া যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব—

(১) মহানুভব ডফ্ সাহেব শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের আরব্ধ সংস্কার-কার্যের ধারাকে অনেকটা গতিমুখে রাখিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মকে শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ যেরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ডফ্‌ও তাঁহাদেরই অনুকরণে হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা ও বিশেষভাবে অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা প্রচারেও মহাত্মা ডফের উদ্যম শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের মতই প্রশংসনীয়। বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করিবার অভিপ্রায়েও ডফ্ অগ্রগামীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এই ধারা যথেষ্ট নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই ধারা এক অতি ভীষণ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল। খৃষ্টান জাতিদিগের মধ্যে স্বামিজীর হিন্দুধর্ম প্রচারই এই প্রতিক্রিয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংস্কারযুগের খৃষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে ইহা এক প্রবল পাল্টা জবাব। তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাজাত্যাভিমান এ অংশে পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান। স্বামিজীর অদ্বৈতবাদ প্রচারকেও আমরা এই ধারার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি।

(২) ডিরোজীও ও তৎশিষ্যদের যে স্রোত-ধারা, তাহা ধারাবাহিকরূপে পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে নাই। মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে ডিরোজীওর মৃত্যু হয়। ডিরোজীওর অকালমৃত্যুই এই ধারার গতিবেগকে সহসা অপ্রত্যাশিতরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডিরোজীওর শিষ্যগণ অনেকেই খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং প্রায় সকলেই অল্পাধিক প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ শেষ পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। কাজেই হিন্দুসমাজে তাঁহাদের স্থান হয় নাই। এবং নিজেরাও কোন স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা সকলেই অসাধারণ তেজস্বী ও মেধাবী ছিলেন এবং উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথিক হইয়া এক এক কেন্দ্র বা বিভাগে একক দাঁড়াইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব ধারণার অনুবর্তী দেশপ্রীতি ও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় সংস্কার-যুগের ইতিহাসকে উপঢৌকন দিয়া, লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবন বিকাশের একটি স্তরে যে উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও নাস্তিক্যবাদের আভাষ আমরা পাই, তাহার তুলনা এক ডিরোজীও বা তৎ-শিষ্যদের জীবনেই মিলে। কিন্তু স্বামিজী তাঁহার নাস্তিক্যবাদ কাহাকেও অনুকরণ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। তাঁহার স্বভাবের বিকাশে উহা এক সময়ে আপনিই ফুটিয়াছিল এবং সেই বিকাশের পথেই তিনি ইহাকে আত্মবলেই অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৩) রামমোহনের ধারা রাজার মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর নিষ্ঠাবান আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় নানা বিঘ্নের মধ্যে অগ্নিহোত্রীর মত রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্রথম অক্ষয় ও রাজনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া এবং পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও সত্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণকে দলভুক্ত করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে যথাক্রমে যে দুইটি পরিপূর্ণ জোয়ার রামমোহনের ধারার মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন আমরা এইক্ষণে তাহার আলোচনা করিব। রামমোহন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে যে বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনীর দল, মুখ্যতঃ রাজাকে অনুকরণ করিয়া, ডফ্‌কেও সেইরূপ ভাবেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের 'দি ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন' চারি সংখ্যা ও তত্ত্ববোধিনী সভার "বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্ ভিনডিকেটেড" চারি সংখ্যা মিলাইয়া দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

রাজার 'দি ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন'গুলির প্রতিপাদ্য হইতেছে, হিন্দুর শাস্ত্র ও দর্শন এক নিরাকার ও নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরমাত্মা নির্গুণ নিরাকার। মনুষ্যোচিত কোন গুণ তাহাতে আরোপ করা যায় না বা থাকিতে পারে না। এই পরমাত্মার কোন গুণ নির্দেশ করা যায় না। আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তনই প্রকৃত বৈদান্তিক উপাসনা এবং তাহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত সর্বোচ্চ উপাসনা। অবশ্য নিম্নাধিকারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে মূর্তিপূজা ও স্বগুণ ব্রহ্মোপাসনার বিধিও আছে। বেদান্ত-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনের আলোচনাও ইহাতে করিয়াছেন। কেন না শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ যেমন একদিকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে বেদের মধ্যে প্রকৃতিপূজা, জড়োপাসনা প্রভৃতিকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন এই সমস্ত আপত্তি দার্শনিক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যথাযথ খণ্ডন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সম্প্রদায়ের 'বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্ ভিনডিকেটেড' নিবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, এক নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব এবং ব্রহ্মে মানবীয় কোন গুণ আরোপ করা যাইতে পারে না। মহাত্মা ডফ্ শ্রীরাম-পুরের পাদ্রীদের মত হিন্দুর অন্যান্য দর্শন ও বেদের পূর্বভাগ সম্বন্ধে কোন আপত্তি

তুলেন নাই বলিয়া, ইহাতে "ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন"-এর মত ঐ সব বিষয়ে কোন আলোচনা নাই। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু অথবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার রচয়িতা বলিয়া যাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিয়াছি এবং পুনরায় এখানেও বলিতেছি যে, স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর দেব ইহার রচয়িতা।

আমার ধারণা 'বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্‌ ভিনডিকেটেড' নিশ্চয়ই "দি ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন"গুলির অনুকরণ। কিন্তু যেমন সর্বত্র, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অনুকরণ কখনই মূলের সমতুল্য নহে। কেন না 'বৈদান্তিক ডকট্রিনস্‌ ভিনডিকেটেড', 'দি ব্রাহ্মানিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর মত স্থানে স্থানে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

তবে রামমোহন যে ভাবে হিন্দুর শাস্ত্রকে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানারূপ পরস্পরবিরোধী মতবাদ থাকা সত্ত্বেও, আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, রামমোহন-অনুবর্তী কোন সংস্কারকই রাজার শাস্ত্র-ব্যাখ্যার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে রাজার যে অভিমত, তুহাফতুলমোহায়িদ্দিন গ্রন্থের পরে দেখা গিয়াছিল, রাজার অনুবর্তীয়েরা কেহই তাহা অনুকরণ করিতে সক্ষম হন নাই। যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও অকৃত-কার্য হইয়াছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। রামমোহন ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মোপাসনার যে পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তীয়েরা তাহা অবলম্বন করেন নাই এবং না করিবার হেতুও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তীদের মতে বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের মতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। সমাজ-সংস্কারেরও যে পন্থা রামমোহন প্রকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন এবং নিজে তদ্বিষয়ে যেরূপ ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, রামমোহন-শিষ্যেরা, তাহাও সম্ভবতঃ বুঝিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম, সমাজ, ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার যে অঙ্গাঙ্গীযোগে আবদ্ধ তাহা রামমোহন বুঝিয়া-ছিলেন, পরবর্তীয়েরা বুঝেন নাই।

এই প্রসঙ্গে তথাকথিত রামমোহন-শিষ্যদের স্ব স্ব প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য গৌরব যে অস্বীকার করা হইতেছে তাহা নহে। তাঁহারা নিজদিগকে রামমোহন-পন্থী বলিয়া পরিচয় দিয়া রামমোহনকে কোথায়ও জ্ঞাতসারে এবং অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞাতসারে অকারণে এত অধিক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন যে, রামমোহন-পন্থী বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিলে রাজার উপর অবিচার করা হয়। রাজার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আজ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্য আমরা যেরূপ দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে হইলে রাজার পতাকাবাহী অনুবর্তীয়েরাই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। মহাপুরুষকে না জানা দুর্ভাগ্য। ভুল করিয়া জানা আরো দুর্ভাগ্য। কিন্তু মহাপুরুষ সম্বন্ধে নিজের ভ্রান্ত ধারণা,

জাতির মধ্যে সংক্রামক করিবার চেষ্টা পাপ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ কতকটা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আরো অনেকের করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখের আর একটি বিশেষ কারণ এই যে স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন হইতেই বাঙ্গালী জাতির এ যুগে সম্প্রসারণ-শক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। রামমোহনকে তিনি অন্যান্য সংস্কারক হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র গড়িয়া তুলিবার বা উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন সংস্কারক বলিয়া বহু সম্মান করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের পরবর্তীদিগকে তিনিও রামমোহন হইতে স্খলিত ও বিপথগামী মনে করিয়া তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই। কাজেই সংস্কার-যুগ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীন মতকে আপনাদের সমক্ষে আমি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিবার একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি এবং দীর্ঘ এক শতাব্দীর সহিত সংশ্লিষ্ট স্বামিজীর জীবন আলোচনায় রামমোহন প্রসঙ্গও যে প্রচুর পরিমাণে আসিয়া পড়িবে তাহাও আগে হইতেই আপনাদিগকে বলিয়া হয়ত আপনাদের শঙ্কা বৃদ্ধি করিলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে বস্তুতঃ রামমোহন-পন্থীরা কেবল এক মূর্তিপূজা অস্বীকার ব্যতিরেকে, আর সকল বিষয়েই রাজাকে উপেক্ষা করিয়া অনেকটা বাহিরের কৃত্রিম আঘাতজনিত উচ্ছৃংখল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে বিচরণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও উপরোক্ত সমালোচনার অতীত নহেন। এমন কি মূর্তিপূজার অস্বীকারেও, রামমোহন শাস্ত্র ব্যাখ্যার মর্মানুযায়ী দুর্বল অধিকারীর জন্য মূর্তিপূজাকে যেরূপ প্রয়োজন বোধে স্থান দিয়াছেন, রামমোহন-পন্থীরা তাহা করেন নাই এবং না করিয়া শিক্ষা, প্রবৃত্তি ও স্তরভেদে বিভিন্ন লোক চরিত্র সম্বন্ধে এবং হিন্দুর ধর্ম-সাধন-পদ্ধতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে, বিশিষ্টরূপ অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের মতের পার্থক্য সত্ত্বেও, যেরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, রামমোহনের অনুবর্তীয়দের সহিত তদ্রূপ সাদৃশ্য কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না।

রামমোহনী ধারার শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে, এই এক ধারা হইতে আরো খণ্ড ধারার উদ্ভব হইল। দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী অক্ষয়-কুমারের প্রতিবাদ সত্যই এক খণ্ড ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল, যদিও সংস্কার-যুগের ইতিহাস এই ধারাটিকে একরূপ বিলুপ্ত করিবার চেষ্টাই এতাবৎ করিয়া আসিতে-ছিলেন। রামমোহন-বিস্মৃত রামমোহন-পন্থীরা ক্রমে বেদ ও ব্রাহ্মধর্ম সঙ্কলনে, শাস্ত্র সংগ্রহ লইয়া, জাতিভেদ ও অসবর্ণ বিবাহ লইয়া, কেশবচন্দ্রের আদেশবাদ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া উত্তরোত্তর ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া গেলেন এবং কালক্রমে ইহার প্রত্যেক ধারাই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

যাঁহারা ইতিহাস গড়েন, তাঁহারা সাধারণতঃ ইতিহাস লেখেন না। যাঁহারা ইতিহাস লেখেন তাঁহারা হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস গড়েনও। রামমোহন-পন্থী অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্র-পন্থী রাজনারায়ণ বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগের ইতিহাস গড়া ও লেখাতে প্রায় সমানভাবে শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই দুই মনীষীর মতানৈক্য ও বিরোধ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে অতি সাবধানে বিশেষরূপে আলোচ্য। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" ও "সেকাল ও একাল", ধর্ম বিষয়ে আমাদের স্বাজাত্যাভিমান এবং একালের সংস্কারযুগের দোষোদ্ঘাটনে আমাদের জাতীয়ভাবের প্রেরণা, স্রোতাবর্তে ঘূর্ণিত হইতে হইতে কি পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দে আসিয়া আঘাত করিয়াছে ও আহত হইয়াছে, তাহার পরিমাপ করা কঠিন।

ইউরোপ হইতে নির্বিচারে গৃহীত, অক্ষয়কুমারের রামমোহন অনুকারী, অথচ নিষ্ফল, ষড়-দর্শন ও পুরাণ তন্ত্রের ব্যাখ্যায় ও বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রচারে যে সংস্কারের ধারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের স্বধর্মনিষ্ঠায় ও স্বজাত্যাভিমানে তাহা কিরূপ আঘাত করিয়াছে এবং তদ্ধেতু স্বামিজীর মধ্যে তাহার কিরূপ প্রতিবাদ জাগিয়াছিল এবং আদৌ জাগিয়াছিল কিনা, তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁহার উদার ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ, তাঁহার "নববিধান", তাঁহার রামমোহন ও বিশেষতঃ অক্ষয়কুমার হইতে পৃথক, পৌরাণিক-যুগের হিন্দু দেব-দেবীর দার্শনিক ব্যাখ্যা এক সময়ে কেশবাকৃষ্ট নরেন্দ্রনাথে কিরূপ কার্য করিয়া, পরবর্তী জীবনের স্বামী বিবেকানন্দে বিঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও আলোচ্য। কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের অত্যধিক খৃষ্ট-প্রীতি ও প্রচার এবং তৎসঙ্গে দেশীয় ও জাতীয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসাধনার অনভিজ্ঞতা প্রতিক্রিয়ার মুখে স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্মজগতে বেদান্তের প্রচারকরূপে আনিয়া উপস্থিত করিতে কতটা সাহায্য করিয়াছিল—তাহাও বিবেচনার বিষয়।

রামমোহনপন্থী নয়, অথচ স্বতন্ত্র এক অতি দুর্দম দামোদরের প্রবল বন্যা বাঙ্গলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কি আশ্চর্য রকমে একদিন গর্জিয়া উঠিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীকে ভীত ও চমকিত করিয়াছিল—সেই শক্তি ও পৌরুষের জীবন্ত সিংহমূর্তি, সেই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গীরণ, তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-সংঘাত আলোচনার বিষয়। কেননা বিধবার দুঃখে বিবেকানন্দ বিচলিত হন নাই, এমন নহে। সেই পরম দয়ার সাগরের উদ্বেলিত তরঙ্গোচ্ছ্বাস স্বামী বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণ সেবায়" অভিষেকবারি লইয়া আসিয়াছিল কিনা, কে জানে?

(৪) তারপর বিস্তীর্ণ বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল নীতির পৃষ্ঠ-পোষক স্যার রাধাকান্তের ভাবধারা অচিরেই লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা ভাবেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রশংসনীয় নহে। ইতিহাসের কোন ভাবধারাই অতি সহজে

বিনষ্ট হয় না। তাহাদের গতি স্তিমিত হয় বটে, উপযুক্ত আধারের প্রতীক্ষায় তাহারা কিয়ৎকাল অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু সহসা একদিন দেখা যায় আবার তাহারা কোথা হইতে আসিয়া আবির্ভূত হইতেছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের যে নব্য হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা, নবীনচন্দ্র যাহার কবি, সেই সাহিত্যান্দোলনের ভাবধারার সহিতও স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়ের স্বরূপ আমাদের জানিবার বিষয়। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রচারিত নব্য-হিন্দুর উত্থাপন ধারায়, স্যার রাধাকান্তের সংরক্ষণ নীতির ধারাই আধারভেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া প্রকট হইয়াছিল।

এই ধারার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্ক খুব বিশেষ সন্তর্পণে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন না কেবল রামমোহন-পন্থীরাই রামমোহন সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়াছেন এমন নহে। বিবেকানন্দ-পন্থীদেরও যে সে আশঙ্কা একেবারে নাই এমন কথা কে শপথ করিয়া বলিবে? প্রদীপের নিম্নেই সর্বাপেক্ষা বেশী অন্ধকার—একথা যিনি বলিয়াছেন তিনি একেবারেই মিথ্যা বলেন নাই। এই ধারার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বাহ্য সাদৃশ্যের অন্তরালে কতটা মর্মান্তিক বিরোধ বিদ্যমান, তাহা সত্যকাম যাঁহারা, তাঁহারা অনুসন্ধানে, ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অবশ্যই অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। স্বামিজী বলিয়াছেন, "তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্যন্ত কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে?" তর্কে স্বামিজীও চূড়ামণি ছিলেন। কিন্তু শশধর-পন্থী ছিলেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগ (১৮৭৫—১৯০০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথম ভাগেই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়। ইহা এক অতি পরম আশ্চর্য ঘটনা।

বাঙ্গালীর গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে একদিন মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সূচিত হইয়াছিল।

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
বনমালা গলে দিলা ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥
* * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

চণ্ডীদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সেই প্রদীপ্ত

কাঞ্চনবর্ণ, নয়নমনাভিরাম শচীর দুলাল নবদ্বীপে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বাঙগালীর অবতার বাঙগলাদেশকে প্রেমভক্তির অপূর্ব বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া গেলেন।

বাঙগালী আবার, সাধক রামপ্রসাদের গানে একদিন মাতিয়া উঠিল। রামপ্রসাদ 'মন মাতালে' মাতিয়া বাঙগালীর মন মাতাইলেন।

"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তা জান না?
* * *
দ্বিজ রামপ্রসাদ রটে।
মা বিরাজেন সর্বঘটে॥"

এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই রামপ্রসাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপান্তর। গানের অছিলায় ইহা কোন মোহমুদ্গর জাতীয় বেদান্তের প্রচার নহে। ইহা গীত, যাহা একদিন, এইত সেদিন, বাঙগালী গাহিয়াছিল। আর ইহা অনুভূতি। রামপ্রসাদের গীতে তাহার সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাব্যে ও গীতে যাহা প্রস্ফুট হইয়াছিল, গঙগাতীরে পঞ্চবটীতলে একদিন তাহাই মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দিল।*

চন্ডীদাস যেরূপ মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বাভাস, রামপ্রসাদেও সেইরূপ রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সূচনা। ইহারাই পর পর গানে ও মূর্তিতে, সুরে ও রূপে বাঙগলার স্বাভাবিক বিকাশ। এক কথায় ইহারাই বাঙগলার প্রাণ। ইহারাই বাঙগালী সভ্যতার পীঠস্থান। কত জন্ম জন্ম ধরিয়া, যুগে যুগে ইঁহারাই আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন। বাঙগালী তাঁহাকে অমনি চিনিতে পারিল।

এই যে পাশ্চাত্যের কৃত্রিম আঘাতে, রামমোহন হইতেই জাতির উপরিভাগের কিয়দংশে একটা চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল, এই যে স্বধর্ম ও পরধর্মের দুই বিপরীত শক্তির উল্টা টানে জাতি দিগ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল—এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই বাহিরের সংঘাত ও আক্রমণ, এই জঘন্য পরানুকরণ মোহে মতিচ্ছন্নতার মধ্যেই বাঙগালী জাতি তাহার স্বভাবধর্মের এক আশ্চর্য বিকাশ দেখাইল। ইহা যে এ যুগে সম্ভব হইল, এজন্য সত্যি—বাঙগলার মাটি বাঙগলার পথ ধন্য, ধন্য।

---

* "যেমন চন্ডীদাসের গান হইতেছে সুর আর মহাপ্রভুর জীবন হইতেছে তাহার রূপ; তেমনি রামপ্রসাদের গান হইতেছে সুর আর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতেছে তাহার রূপ। আর বাঙগলার প্রাণ হইতেই এই সুর ও রূপ যুগে যুগে ফুটিয়া উঠিতেছে ও উঠিবে।" এই অপূর্ব তত্ত্বকথাটি বাঙগলার গীতি-কবিতার একজন মৌলিক সমালোচক, বাঙগলার প্রাণের একজন একনিষ্ঠ সাধক, সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা একটি অমূল্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এই কথাটি নিজস্বভাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ সেই পরম দয়াল ব্যক্তির চরণে আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কবি বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি প্রত্যূষেই গাহিয়াছিলেন—

"আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥"

শতাব্দীর শেষভাগে সিদ্ধ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণে তাঁহারই প্রকাশ দেখিলাম। তিনি যে কারু ঘরে যান নাই, তাহা নহে। তবে নিজ অন্তঃপুরে তিনি অত্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

ইহা শুধু ব্যক্তিগত একটা অভ্যুদয় নয়। ইহা বিশেষরূপে একটা যুগধর্মের সমন্বয় ও বিকাশ। আরো বলা যায় ইহা বাঙালীর স্বভাবধর্মের এক আশ্চর্য প্রকাশ। কি করিয়া যে এই নিরক্ষর দরিদ্র পূজারী-ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ গভীর অধ্যাত্মবোধ, জগতের যাবতীয় বিরোধী ধর্মমত ও সাধনার, অনুভূতির সমন্বয় সাধিত হইল, তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। ইহার কারণ যতটা দৃশ্য, তাহা অপেক্ষা অনেকখানি অদৃশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, যেদিন হইতে রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই দিন হইতেই বর্তমান ভারতের সূত্রপাত হইয়াছে।

বাঙালীর এই স্বভাবধর্মের বিকাশে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে কি পরিবর্তন দেখা দিল? ইহা শুধু পরমহংসদেবকে আবির্ভূত করিল না (১) ইহা কেশবচন্দ্রকে বিশেষভাবে পরিবর্তিত করিল। বলা বাহুল্য দেশে-বিদেশে কেশব-চন্দ্রই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগের অবিসম্বাদিত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী নেতা ছিলেন। এক যুগের শিক্ষিত বাঙালীকে তিনিই পরিচালিত করিয়াছেন। কিন্তু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার যে পরিবর্তন হইল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

(২) খৃষ্টভক্ত, সাহেবীভাবাপন্ন, ইংরেজী ভাষায় সুবক্তা ও সুলেখক শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরমহংসদেবের সাক্ষাতে আসিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।*

(৩) সাধু বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্মমত ও উপাসনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কোন্ শক্তির প্রভাবে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সঙ্গলাভের জন্য যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং কোন্ শক্তির প্রভাবেই বা রুদ্রাক্ষ, জটা, কমণ্ডলুধারী এ যুগের বহুনিন্দিত বৈষ্ণব-সাধনার সিংহপ্রতিম মূর্তিখানি বাঙালীর দ্বারে দ্বারে লইয়া ফিরিলেন?

*"My mind is still floating in the luminous atmosphere which that wonderful man diffuses around him whenever and wherever he goes. My mind is not yet disenchanted of the mysterious and indefinable pathos which he pours into it whenever he meets me.

(৪) কোন্ শক্তির প্রভাবেই বা নাস্তিক, তার্কিক যুবা কেশবচন্দ্রের দল ছাড়িয়া দিয়া, একদিন পরমহংসদেবের চরণপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন? কে এবং কিসে তাঁহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবনের বিরাট অভ্যুদয়কে সম্ভব করিল?

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশে পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তনের ছায়া আসিয়া পড়িল। সংস্কার যুগের অন্তে ইহা যেন আর এক সমন্বয়-যুগের সূচনা করিয়া দিল এবং এই সমন্বয়ের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা দিল। ইতিহাসের গতিপথে হয়ত ইহাই নিয়ম।

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ও প্রচারের বীজ, এই সমন্বয় যুগাবতার রামকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের বহু বিচিত্র ভাবস্রোতগুলি তাঁহাতে মিলিত হইলেও, শতাব্দীর চতুর্থ ভাগের এই সমন্বয় যুগাদর্শ ও পরমহংস-দেবের অদ্ভুত জীবনের ধারা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে চালিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বে নিজস্ব বলিয়া কিছু আছে কি না তাহা অন্য আর একটি প্রশ্ন।

What is there in common between him and me? I, a Europeanised, civilised, self-centered, semisceptical, so-called educated reasoner, and he, a poor, illiterate unpolished, half-idolatrous, friendless Hindu devotee? Why should I sit long hours to attend to him, I, who have listened to Disraeli and Fawcett, Stanley and Max Muller, and a whole host of European scholars and divines? I, who am an ardent disciple and follower of Christ, a friend and admirer of liberal-minded Christian missionaries and preachers, a devoted adherent and worker of the rationalistic Brahma-Samaj—why should I be spell-bound to hear him? And it is not I only, but dozens like me who do the same. He has been interviewed and examined by many, crowds pour in to visit and talk with him. Some of our clever intellectual fools have found nothing in him, some of the contemptuous Christian missionaries would call him an imposter, or a self-deluded enthusiast. I have weighed their objections well and what I write deliberately. * * "

"Our own ideal of religious life is different but so long as he is spared to us, gladly shall we sit at his feet to learn from him the sublime precepts of purity, unworldliness, spirituality and inebriation in the love of God." * * * But how is it possible that he has such a fervent regard for all the Hindu deities together? What is the secret of his singular eclecticism? To him each of these deities is a *force, and incarnated principle tending* to reveal the Supreme relation of the Soul to that Eternal and formless Being who is unchangeable in his blessedness and the Light of Wisdom."—Pratap Chandra Mazumder.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংস্কারযুগের অবসান—সমন্বয়যুগের অভ্যুদয়

প্রথম পরিচ্ছেদে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের সংস্কারের বিচিত্র ধারাগুলির উল্লেখমাত্র করিয়া, তাহার সহিত স্বামিজীর বিরোধ ও মিল কোথায়, তাহা সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছি। তাহাতে মনে হইতে পারে যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিকত্বকে, বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার না করিলেও, হয়তো অনেকাংশে খর্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস নয় যে আমি এরূপ করিয়াছি। আমার এই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আলোচনায় সংস্কারযুগের অন্যান্য মহাপুরুষ হইতে স্বামিজীর যে দেদীপ্যমান স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, তাহা যদি অতি অল্প পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হয়, তবে আমি কম দুঃখিত হইব না। অন্যপক্ষে, বাঙ্গালী জাতির গত একশত বৎসরের সংস্কার-প্রয়াস ও সংস্কার-আদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে, স্বামিজীর পূর্ববর্তীদের কোন কোন ভাব বা আদর্শ যদি কোনো কোনো দিক হইতে তাঁহার মধ্যে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সংক্রামিত হইয়া থাকে—ইতিহাসে এরূপ হয়, তবে তাহার উল্লেখ না করিয়া, বা তাহা গোপন করিয়া, স্বামিজীর স্বাতন্ত্র্য ফুটাইবার যে প্রয়াস, তাহা অতি হীন প্রয়াস। যাঁহারা এরূপ প্রয়াসের পক্ষপাতী স্বামিজীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা সম্যক্ পরিস্ফুট নহে। সত্যকে গোপন করিয়া অতি অল্প সংখ্যক মহাপুরুষই জগতে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। সত্যের প্রকাশ সত্ত্বেও যে সমস্ত মহাপুরুষ বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহারা কখন সে বৈশিষ্ট্য হারান নাই। স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য তাঁহার জন্মগত—তাঁহার জন্ম-স্বত্ব। কোনো সত্যের প্রকাশে তাহা লুপ্ত হইবে না। কোন সত্যের গোপন তজ্জন্য আবশ্যক হইবে না।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগের প্রথমেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয় হয়। যদিও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন তথাপি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বিশেষরূপে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই পরমহংসদেবের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। কেশবচন্দ্রই পরমহংসদেব দ্বারা সর্বপ্রথম আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হন। ইহার মধ্যে কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম ধর্ম-পিপাসা ও উদারতার পরিচয়ই আমরা পাই। স্বামী বিবেকানন্দ তখনও অজ্ঞাত ও অখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দেরও পূর্বে যে কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের অভ্যুদয়কে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে কেশবচন্দ্রের চিরপূজ্য মহিমার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায়, কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ইহাতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াই দেখা দেয়। পরমহংসদেবের অভ্যুদয়ের পূর্বে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই বাঙ্গলায়, ভারতে ও এমন কি সুদূর ইংলণ্ডে, বাঙ্গালীর সংস্কারযুগের বার্তাকে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে বহুল পরিমাণে পশ্চাতে রাখিয়া, কেশবচন্দ্রই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারান্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতারূপে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সংস্কার আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও প্রধান নেতা এইরূপে যেদিন, নেতৃত্বের অভিমান দূর করিয়া, পরমহংসদেবের নিকট ধর্ম-শিক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন, সেদিন বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগের ইতিহাসে সত্যই এক পরিবর্তন আসিল। ভক্তিভাজন পণ্ডিত মোক্ষমুলার লিখিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া, "কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবন পরিবর্তন হইয়া গেল এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে কেশববাবু নিজের ধর্মমত "নববিধান" নামে প্রচার করিলেন; যে সত্য রামকৃষ্ণদেব বহুকাল হইতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, নববিধানের মত তাহারই আংশিক প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।" ইহা রামকৃষ্ণ-শিষ্য বা কেশব-শিষ্যদের উক্তি নয়। পরন্তু ইহা রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদেশী একজন মহা পণ্ডিতের উক্তি, যিনি উক্ত দুই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত ও বিখ্যাত বাঙ্গালী অপেক্ষা বহু তথ্য অধিক জ্ঞাত ছিলেন।

পরমহংসদেবের সহিত সংস্পর্শে কেশবচন্দ্রের পরিবর্তনই সংস্কারযুগের পরিবর্তন। কেন না কেশবচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না। তিনি সংস্কারযুগের সর্বশেষ সুস্পষ্ট নেতা। কেশবচন্দ্র সংস্কারযুগের সর্বশেষ প্রতিনিধি। সংস্কারযুগের প্রায় সমস্ত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাই সংহত হইয়া তাঁহার মধ্যে এক সময়ে প্রতিবিম্বিত ও দেশ-বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পরিবর্তন শুধু ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তন নহে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ-দেব সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্রের মত পরিবর্তন ও কিছুকাল পরে বিজয়কৃষ্ণের ধর্মমত ও সাধন পরিবর্তন হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর গত শতাব্দীর সংস্কারযুগ কোন্ দিকে কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সংস্কার-আদর্শ-সংপৃক্ত নরেন্দ্রনাথ যেদিন সংস্কারের দল পরিত্যাগ করিয়া, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রামকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিলেন, সেইদিন হইতেই সংস্কারযুগের অন্তে আর এক নূতন যুগের বিকাশ ও প্রচারের বীজ দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর মৃত্তিকায় রোপিত হইল। রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণে পরিবর্তন আসিল সত্য, কিন্তু রামকৃষ্ণ-যুগের প্রচারের ভার ইঁহারা কেহই লইলেন না। সে প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন একা রামকৃষ্ণ-শিষ্য, রামকৃষ্ণগত-প্রাণ, রামকৃষ্ণ 'প্রকৃতির' একক 'পুরুষ' স্বামী বিবেকানন্দ। সাধু বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পরবর্তীকালে যে ধর্ম বাঙ্গালীকে বিলাইলেন,

তাহা নিশ্চিতই রামকৃষ্ণ-যুগের এক অচ্ছেদ্য বিরাট অঙ্গ, অথচ বিজয়কৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে গৌরবান্বিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারযুগের শেষ প্রতিনিধি কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াও রামকৃষ্ণ-যুগের প্রথম চিহ্নিত প্রচারকরূপে দণ্ডায়মান হওয়াতে, আমরা স্বামিজীর মধ্যে বাঙ্গালীর সংস্কারযুগ ও তৎপরবর্তী রামকৃষ্ণযুগের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শগুলিতে এক অপূর্ব জৈবিক মিশ্রণ দেখিতে পাই। অল্পাধিক বিভিন্ন ও বিচিত্র দুই যুগের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কিরূপ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও বিশিষ্ট মূর্তি এবং প্রাণ লাভ করিয়াছে আমাদের তাহাই আলোচ্য।

রামকৃষ্ণযুগ, সমন্বয়যুগ কিনা?

পণ্ডিত মোক্ষমুলারের মতে, কেশবচন্দ্রের 'নববিধানে' যে ধর্ম-সমন্বয়ের বার্তা ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা রামকৃষ্ণদেবেরই উপদেশের ফল, রামকৃষ্ণদেবেরই সমন্বয়-আদর্শের আংশিক প্রতিবিম্ব। ইহা একেবারে মিথ্যা নয়। তবে কেশব-চন্দ্রের 'নববিধানের' সমন্বয়ে আর রামকৃষ্ণদেবের ধর্মানুভূতির সমন্বয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত যেরূপ দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রতিবাদে, জগতের সমস্ত জাতির শাস্ত্র হইতেই সার সত্য সংগ্রহ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং কেবল এক হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কেশব-চন্দ্রের 'নববিধানে'র সমন্বয় বহু পরিমাণে সেই অক্ষয়কুমারের পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অংশ ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়া ও তাহা-দিগকে পরস্পর একসঙ্গে জোড়া দিয়া যে সমন্বয়ের ধর্ম সৃষ্ট হয়, তাহা একদিকে যেমন উচ্চ ধর্মও নহে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চ সমন্বয়ও নহে। এই প্রকার সমন্বয়ের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিবে, আর উঠাও স্বাভাবিক। কেননা, প্রথমতঃ ইহা একটা বুদ্ধি-বিচারের কৌশল মাত্র। শিক্ষা ও রুচি ভেদে ব্যক্তিগত খেয়ালের সমাবেশও ইহাতে কম থাকে না। কিন্তু ধর্মের সমন্বয় বুদ্ধি বিচারপূর্বক তত হয় না, যত হয় আত্মার অনুভূতিতে ও উপলব্ধিতে। বুদ্ধির সমন্বয় অপেক্ষা বোধির সমন্বয় ধর্মজগতে অধিক মূল্যবান। বুদ্ধি-বিচারের স্থান যে ধর্মজগতে নাই, তাহা নহে। বুদ্ধিই ধর্মজগতের শেষ কথা নয়। কেশবচন্দ্রের এই বুদ্ধি বিচারের সমন্বয়, আবার বুদ্ধি বিচার দ্বারাই খণ্ডিত হয়। কেন না জগতের প্রত্যেক ধর্মেরই একটা বিশেষ ভাব আছে এবং সেই ভাব অনুগামী নাম রূপও আছে। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রাণ আছে এবং এই প্রাণশক্তির বলেই সেই ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা দেয়। সকল ধর্মের কিছু সমান বিকাশ হয় না। বিকাশের পথে কোনো ধর্ম বা দ্রুত অগ্রসর কোনো ধর্ম বা ধীর মন্থর গতি। কোনো ধর্মের বা কৈশোর, কোনো ধর্মের বা যৌবন, কোনো ধর্মের বা বার্ধক্য।

এখন এই বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন নামরূপের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন স্তরের ও বিকাশের, ধর্মগুলির বিভিন্ন অংশ ছিন্ন করিয়া আনিয়া এক পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইলে যে সমন্বয় হয়, কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' সেইরূপ এক অদ্ভুত সমন্বয়। ইহা বিজ্ঞান অসম্মত, বুদ্ধিপ্রসূত অথচ বুদ্ধি-বিচার দ্বারাই খণ্ডিত, ইহা অদ্ভুত এবং অসম্ভব, ইহা দেখিতে ও ভাবিতে খুব চমৎকার কিন্তু ইহা প্রাণহীন। ইহা জাতীয় জীবনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে অক্ষম। অথচ ইহার মূলে, ইহার প্রেরণায় এক উদার সার্বভৌমিক ভাব বিদ্যমান। এই উদার সার্বভৌমিক ভাব বস্তুতন্ত্রহীন এক শুভ ইচ্ছা বা কল্পনা মাত্র। কেশবচন্দ্রের 'নববিধানে'র সমন্বয় এইরূপ একটি উদার সার্বভৌমিক অথচ বস্তুতন্ত্রহীন সমন্বয়।

পরমহংসদেবের সমন্বয় মূলে ও প্রকৃতিতে, কেশবচন্দ্রের সমন্বয় হইতে অত্যন্ত পৃথক। পরমহংসদেবের সমন্বয় স্বাভাবিক সমন্বয়, বোধির ও উপলব্ধির সমন্বয়। ইহা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একত্রে জুড়িয়া এক নূতন সমন্বয় নহে। ইহা প্রত্যেক ধর্মসাধনার মধ্য দিয়াই যে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী একই গন্তব্য স্থানে পরিণামে পেঁাছিতে পারেন, একই ব্রহ্মে মিলিত হইতে পারেন, তাহারি সাক্ষাৎ উপলব্ধি।

রামকৃষ্ণদেব কোনো নূতন ধর্ম-মতের প্রচার করেন নাই, কোনো নূতন সাধন-প্রণালীরও আদেশ করেন নাই এবং বিভিন্ন ধর্ম-সাধন-প্রণালীর প্রথম হইতে শেষ সোপানটি পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। কেননা তিনি সোপানকে শেষ বলিয়া সোপানের উপরেই বসিয়া পড়েন নাই। সমস্ত সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সর্বশেষে গিয়া পেঁাছিয়াছিলেন, যাহার পরে আর কোন সোপানই নাই। তিনি যদি কোন নূতনত্ব প্রচার করিয়া থাকেন তবে তাহা এই যে, ব্রহ্মানুভূতিই মানুষের চরম লক্ষ্য। শিক্ষা, কর্ম ও রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথে মনুষ্য সকল এই একই চরম লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে। পথ বহু হইলেও গন্তব্য স্থান এক। আর পথ গন্তব্য স্থান নয় বলিয়াই, পথের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না। আর সকল পথই একই লক্ষ্যে গিয়া পেঁাছিয়াছে। সুতরাং ধর্ম-সাধন-প্রণালীর যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেই মানুষ গন্তব্যস্থানে পেঁাছিতে পারে। মানুষ প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে, আর মনুষ্য প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই, ধর্মের এত বিভিন্ন পথ ও মত দেখা যায়। সুতরাং এক পথের পথিক অন্য পথের পথিককে পথ-ভ্রান্ত বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন না। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অদ্ভুত জীবনে, হিন্দু সাধনার বিচিত্র প্রণালী ও বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধ্য পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই সচ্চিদানন্দে, সেই এক অদ্বৈতে-অখণ্ডে গিয়া বারংবার উপনীত হইয়াছেন। এমন কি মুসলমান ও খৃষ্টান সাধন-পদ্ধতিও তিনি অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতিও, সেই একই ব্রহ্মানুভূতির বিভিন্ন সোপান মাত্র। সুতরাং তিনি

কোন ধর্মকেই নিন্দা করিতে পারেন নাই। এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দেন নাই এবং প্রত্যেক ধর্মসাধনার নিম্নতম সোপান হইতে অখণ্ডের পূর্ণ উপলব্ধিতে মগ্ন হইবার পূর্ব সোপান পর্যন্ত তিনি সাধন-মার্গের সমস্ত সোপানগুলিই অধিকারী ভেদে আবশ্যক মনে করিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের সংস্কারযুগের বস্তুহীন অসম্ভব সার্বভৌমিক সমন্বয় হইতে, রামকৃষ্ণদেবের বস্তুগত প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক সমন্বয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এখন প্রশ্ন উঠিবে যে, রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ের প্রকৃতি যাহাই হউক, কেশবচন্দ্র হইতে তাহা ভাল হউক বা না হউক, তাঁহার যুগ বা তাঁহার সমন্বয় পূর্ববর্তী সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার মত দেখা যায় কিনা? উত্তর এই যে, প্রত্যেক পরবর্তী যুগই তাহার পূর্ববর্তী যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার মত দেখায়। সে হিসাবে ব্রাহ্মযুগও তাহার পূর্ববর্তী যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া। ইতিহাসের এই ঘাত প্রতিঘাত জনিত চির ঘূর্ণায়মান পথ অনুসরণ করিয়া রামকৃষ্ণযুগ সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই রামকৃষ্ণযুগ যখন স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দযুগ নিশ্চিতই ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে এক তীব্র ও স্পষ্ট প্রতিবাদ। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগের প্রতিবাদ বলিয়া তাহা একদেশদর্শী নয়। অথবা তাহার সমন্বয়ের আদর্শ যে অসম্পূর্ণ তাহাও নয়। ইতিহাসের গতিপথে প্রত্যেক যুগের সমন্বয় তাহার পরবর্তী যুগে প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে জাতি এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত জাতীয়-আদর্শকে অতি দ্রুত আবার কেন্দ্রী-ভূত ও সংহত করিতে না পারে, সে জাতি পতনোন্মুখ; কালে সে জাতির অস্তিত্ব ইতিহাস মুছিয়া দেয়। আর যে জাতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতীয় আদর্শকে অচিরেই একত্র সমাবেশ করিয়া আবার তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে, বুঝিতে হইবে সে জাতির জীবনীশক্তি এখনও সতেজ ও অটুট। সংস্কার-যুগে যাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দযুগে তাহা আবার কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে ব্রাহ্ম-যুগও ইতিহাসের একটা স্তর—যাহাকে অচিরেই অতিক্রম করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। অন্যথা অদূর ভবিষ্যতে কি ছিল কে বলিতে পারে? রামকৃষ্ণ-যুগ যেমন ব্রাহ্ম সংস্কার-যুগের প্রতিবাদমূলক, তেমনি ইহা বহু পরিমাণে সমন্বয়মূলক। জাতীয় আদর্শের ধারক ও রক্ষকরূপে ইতিহাসে এই সমন্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ এই সমন্বয়মূলক রামকৃষ্ণ-যুগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয় আদর্শের যে বৈশিষ্ট্য তাহা স্বামী বিবেকানন্দে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এবং কেশবচন্দ্রের বস্তুহীন অসম্ভব সমন্বয়ের আদর্শ যে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। গত শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারের ইতিহাসে ইহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিবার বিষয়।

ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগ ও রামকৃষ্ণ-সমন্বয়-যুগ, বুদ্ধি-বিচারের যুগ ও অনুভূতির যুগ, অনুকরণের যুগ ও স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের যুগ। বাঙ্গালীর গত শতাব্দীর পরে পরে এই দুই বিভিন্ন যুগাদর্শের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত হইল। কোন্ যুগের আদর্শ তাঁহার মধ্যে সুকুমার বয়সে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, আর কোন্ যুগের আদর্শ দ্বারা সেই বাল্যের বা কৌমারের প্রতিবিম্বিত আদর্শ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাহাও আপনারা দেখিলেন। পুনরায় উত্তরকালে রামকৃষ্ণ-যুগ প্রচারব্যপদেশে, তাঁহার অপূর্ব জীবনে কি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট যুগাদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ক্রমে তাহাও আলোচিত হইবে।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে স্বামী বিবেকানন্দ এক মহা সমন্বয়াচার্যরূপেই বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন।

মনুষ্য সমাজে ধর্মের মতবাদে ও সাধন-প্রণালীতে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সকল মানুষের প্রকৃতি বা সকল জাতির প্রকৃতি এক নয়। মনুষ্য ও জাতি সকলের ক্রম বিকাশের ধারাতে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়, কখনো বিকাশ লাভ করে, কখনো বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সর্বদাই মনুষ্যচরিত্রে ও জাতীয়-চরিত্রে বিদ্যমান। কাজেই সকল মানুষ, সকল জাতি, তাহাদের স্বভাবের বৈষম্য ছাড়িয়া, তাহাদের জাতিগত বিকাশের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, একসঙ্গে এক ধর্মমত ও এক সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে না। অথচ ধর্মভাব অল্পাধিক মানুষ স্বভাবের মধ্যে নিহিত বলিয়া, কোন মানুষই একেবারে ধর্মহীন হইতে পারে না। স্বভাবকে কে অতিক্রম করিতে পারে? প্রত্যেক মনুষ্যই, প্রত্যেক জাতিই প্রকৃতি-ভেদে, শিক্ষাভেদে, বিকাশভেদে কোন একটা ধর্মভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেই। ধর্মজগতে মতের ও সাধনার পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগ এই অবশ্যম্ভাবী মত-পার্থক্য ও সাধন মার্গের বিভিন্নতাকে অস্বীকার করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া, এক ধর্মমতে, এক সাধন-প্রণালীর গণ্ডীতে সকল মনুষ্যকে সমগ্র জাতিকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা মিথ্যা চেষ্টা। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সংস্কারযুগের এই বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্য-হীন সমন্বয়, উত্তম বুদ্ধি-বিচার-প্রসূতও নয় আবার গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফলও নয়। ইহা বস্তুতন্ত্রহীন এক অসৎ বস্তু। ইহা অলীক।

ধর্মজগতে বিভিন্ন মতবাদ ও তদুপযোগী বিভিন্ন সাধনমার্গ আছে ও থাকিবে। এই বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন সাধন মার্গকে অস্বীকার করিয়া নয়, মুছিয়া ফেলিয়া নয়, বরং বিশেষরূপে স্বীকার করিয়া, গ্রহণ করিয়া সংস্কার-যুগের প্রতিবাদে রামকৃষ্ণদেব এক সমন্বয় যুগের আদর্শ নিজের জীবনে প্রকাশ করিয়া জাতিকে তাহা অনুসরণ করিবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

পরমহংসদেবের যে সমন্বয়ের আভাস দেওয়া হইল তাহা বিশেষভাবে বিভিন্ন

সাধন-পদ্ধতির সমন্বয়। রামকৃষ্ণদেব এক হিন্দুধর্মের বহু বিচিত্র সাধন-প্রণালীই যে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি মুসলমান ও খৃষ্টান সাধন-পদ্ধতিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর প্রত্যেক সাধন-প্রণালীরই প্রথম হইতে শেষ সোপান পর্যন্ত তিনি স্বীকার করিয়া বিভিন্ন সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়া সেই এক ব্রহ্মানুভূতির মধ্যেই আপনাকে বিলীন করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণদেবের এই বিভিন্ন সাধনমার্গের সমন্বয় সম্বন্ধে অনেকবার বলিয়াছেন। কিন্তু ধর্মের ও তত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় রামকৃষ্ণদেব কিরূপে করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তাহার উপর আমাদের দৃষ্টিকে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মের অন্যান্য পূর্ববর্তী সমন্বয়াচার্যদের সহিত রামকৃষ্ণদেবের তুলনা ও স্বামিজীর মতে রামকৃষ্ণদেবের স্বাতন্ত্র্য-গৌরব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামিজী কলিকাতায় স্টার থিয়েটারে যে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন—

"আমি ঈশ্বর কৃপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম—যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয় রূপ, এতদ্বিধ ব্যাখ্যা-স্বরূপ—যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদ মন্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। * * * সম্ভবতঃ সেই জগতের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে। আমি জানি না, জগতের সমক্ষে উহা প্রকাশ করিতে পারিব কিনা। কিন্তু বৈদান্তিক সম্প্রদায় সমুদয় যে পরস্পরবিরোধী নহে, উহারা যে পরস্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অপরটির চরম পরিণতিস্বরূপ, একটি যেন অপরটির সোপানস্বরূপ এবং সর্বশেষ চরম লক্ষ্য অদ্বৈত তত্ত্বমসিতে পর্যবসান, ইহা দেখানই আমার জীবনব্রত।"

স্বামিজী মান্দ্রাজের একটি বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন—

"বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপর দিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষার ফলেই আমি উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টতররূপে বুঝিতে শিখিয়াছি। আর আমি এ বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে—এই সকল শাস্ত্রবাক্য পরস্পর বিরোধী নহে। * * * শ্রুতিবাক্যগুলি পরস্পর বিরোধী নহে, উহাদের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান, একটি তত্ত্ব যেন অপরটির সোপানস্বরূপ। * * * প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অপূর্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্বাসে উহা সমাপ্ত হইয়াছে।"

আর একটি বক্তৃতায় স্বামিজী বলিয়াছেন—

"তোমরা দেখিবে, শঙ্করাচার্যের ন্যায় বড় বড় ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত নিজ নিজ মত পোষকতার জন্য স্থলে স্থলে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। রামানুজও সেরূপে শাস্ত্রের অর্থ করিয়াছেন, যাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের পণ্ডিতদের ভিতরেও এই ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটি মাত্র সত্য হইতে পারে, আর সকলগুলিই মিথ্যা। * * আমাদের সমাজের ও পণ্ডিতদের ত এই অবস্থা। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহদ্বন্দ্বের ভিতরে এমন একজনের অভ্যুদয় হইল, যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে সেই সামঞ্জস্য কার্যে পরিণত করিয়া নিজ জীবনে দেখাইয়াছিলেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছি।"

মান্দ্রাজের আর একটি বক্তৃতায় স্বামিজী মহাদার্শনিক শঙ্করের জ্ঞান ও বিশালহৃদয় রামানুজ এবং বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে। যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের বিশাল অনন্তহৃদয়ের অধিকারী হইবেন। * * * এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এইরূপ একজন ব্যক্তির জন্মিবার সময় হইয়াছিল, প্রয়োজন হইয়াছিল। * * তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না, এরূপ মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি নিজের নামটি পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। * * আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে একটা যুগের প্রবর্তক, যুগাচার্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং এই যুগাদর্শের প্রধান চিহ্ন তিনি ধর্মের ও তত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদের এক মহাসমন্বয় বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত মতের অনুকূলে শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের আর মাধ্ব দ্বৈতবাদের পরিপোষকতা কল্পে শ্রুতিকে বিভিন্ন ব্যাখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাও এক শ্রেণীর সমন্বয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় এ শ্রেণীর নহে। ইহা অত্যন্ত স্বতন্ত্র। শ্রুতিকে কোন বিশেষ মতবাদের সমর্থনের জন্য তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। ক্রমবিকাশের ধারায় দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের এই তিনটি সোপান বা স্তরকেই একত্রে মানিয়া লইয়া তিনি বিভিন্ন মত পরিপোষক

শ্রুতিবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা রামকৃষ্ণদেবের জীবনে, তাঁহার অনুভূতিতে এই বিভিন্ন মতবাদের ক্রম ও সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই রামকৃষ্ণ-যুগের সমন্বয় ব্যাখ্যা। হয়ত এই সমন্বয় এবং তাহার ব্যাখ্যা সমালোচনার অতীত নয়। জগতে মনুষ্য কোন্ বস্তুকেই বা সমালোচনার অতীত করিয়া রাখিয়াছে? কিন্তু পূর্ববর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগ অপেক্ষা ইহা যে এক অভিনব নূতন সমন্বয় আদর্শ, তাহা নিশ্চিত। সমস্ত ব্রাহ্ম-সংস্কার যুগ কোন একটা বিশেষ মতবাদকেই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল; অবশ্য ধর্ম-জগতের অন্যান্য মতবাদগুলি যাহা তাঁহাদের মনোমত হয় নাই, তাহাদিগকে ভ্রমাত্মক জ্ঞানে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া। ইহা অপেক্ষা রামকৃষ্ণ-যুগের সমন্বয় অধিকতর পূর্ণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। সংস্কার-যুগ বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া যে সমন্বয়-আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যে অসম্ভব ও ভ্রমপূর্ণ, সংস্কার-যুগের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতবাদই তাহার প্রমাণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যে দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে দেশ ক্রমশঃ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়।" সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়, নিষ্ফল হয়, ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। রাজা রামমোহন শঙ্করানুবর্তী হইয়া যে বেদান্তের মীমাংসা আমাদিগকে দিয়াছেন, আজ তাহা লইয়া মতদ্বৈধতার অন্ত নাই। তিনি হুবহু শঙ্করের প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকুন বা শঙ্করকে সংশোধন করিয়াই প্রচার করিয়া থাকুন সে তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। রামমোহনের ধর্ম ও বেদান্ত-মীমাংসার মতবাদকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের শঙ্করানুগামী বেদান্ত-ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। রামমোহনের মহানির্বাণতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতিকেও, দেবেন্দ্রনাথ পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। সেই উপাসনা পদ্ধতিকেও তিনি মূলতঃ পরিবর্তন করিয়াছেন। আবার দেবেন্দ্রনাথের রামমোহন-ব্যাখ্যা অক্ষয়কুমার অস্বীকার করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থের প্রতিবাদ অক্ষয়কুমার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য কেশবচন্দ্রের ধর্মমতে, বিশেষভাবে 'নববিধানে'র সহিত দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের অতি মর্মান্তিক প্রভেদ

আপনারা ইহা হইতে দেখিলেন যে, ধর্মের মতে ও সাধনে অবস্থাভেদে, অধিকারীভেদে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য অস্বীকার করিতে দণ্ডায়মান হইয়া, সংস্কার-যুগের প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্যক্তিই কিরূপ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন মতে ও সাধনে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্রাহ্মনেতার ব্যক্তিত্ব যদিও কোন কোন দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মযুগাদর্শের সাধারণ ভিত্তি ইহার দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমন্বয় করিবে কে?

উত্তর এই, রামকৃষ্ণযুগ—যাহার ভাষ্যকর ও ব্যাখ্যাকার, যাহার সন্তান ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ, সেই রামকৃষ্ণ-যুগের আদর্শে তাহার পূর্ববর্তী বিক্ষিপ্ত সংস্কারযুগ সংহত হইতে পারিবে, সমন্বয় খুঁজিয়া পাইবে। কিন্তু একটা সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা এই বহুধা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, সংস্কারদলের হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। সম্ভবতঃ তাহা হয় নাই। কেননা, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত খণ্ড ব্রাহ্ম-আদর্শগুলি আর সংহত হইতে না পারিয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সমন্বয়-আদর্শ পক্ষান্তরে জাতীয় জীবনকে সংহত ও দৃঢ়বন্ধ করিতেছে।

রামকৃষ্ণযুগের সমন্বয় আদর্শের আভাস দিলাম। মোক্ষমূলার সাধনের দিক হইতে এবং স্বামিজী মতবাদের দিক হইতে এই সমন্বয় আদর্শকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বর্ণিত হইল। ব্রাহ্ম-সংস্কার-যুগের সমন্বয় হইতে রামকৃষ্ণ-যুগের সমন্বয়ের পার্থক্যও কিছুটা বিশ্লেষণ করা হইল। এখন স্বামিজীর নিজের উক্তি উদ্ধার করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতেছি এই রামকৃষ্ণযুগের সমন্বয় তাঁহার মধ্যে কিরূপে সংক্রামিত হইয়াছিল। স্বামিজী "স্টার থিয়েটারের" বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "সম্ভবতঃ এই সমন্বয়ের ভাব আমার ভিতরেও কিছু আসিয়াছে" তাহা অনেকেই হয়তো জানেন।

ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি

সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, বাঙালীর এই যুগ সম্বন্ধে তাঁহার মনের মধ্যে কিরূপ আলোচনা জাগিয়াছিল। এই যুগ সম্বন্ধে তাঁহার বিচার কি, সিদ্ধান্ত কি—তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। কেননা একটা যুগের বিচার সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। একটা জাতির যুগকে যিনি ভাঙিতে পারেন, এবং ভাঙিয়া গড়িতে পারেন এমন একজন যুগ-প্রচারক মহাপুরুষের অশেষ গবেষণাপূর্ণ বহু যুক্তি ও উক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"প্রায় বিগত একশত বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশ সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের নানাবিধ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শতবর্ষব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের কোন স্থায়ী হিতসাধন হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে, হিন্দু-সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বাস্তবিক সমাজের কোন উপকার হয় নাই। ইহার কারণ কি? এই নিন্দাবাদ ও গালি বর্ষণই ইহার কারণ। প্রথমতঃ আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইবে। আমি স্বীকার করি অপর জাতিদের নিকট হইতে আমাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্য প্রণালীর বিচারশূন্য

অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহা দ্বারা কখনই কার্য হইবে না। এই কারণেই আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলন-সমূহ দ্বারা কোন ফল হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, নিন্দা বা গালাগালি বর্ষণ দ্বারা কোন কার্য হয় না।"

আর একটি স্থান উদ্ধার করিতেছি—

"প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া এই সংস্কার-আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু তদ্দ্বারা অতিশয় নিন্দা ও বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য বিশেষের সৃষ্টি ব্যতীত কি কল্যাণ হইয়াছে? ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা না হইলেই বড় ভাল ছিল। তাঁহারা প্রাচীন সমাজের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর যথাসাধ্য দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ফল এই হইয়াছে যে, সর্ব-প্রকার দেশীয় ভাষায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত জাতির লজ্জিত হওয়া উচিত।"

আপনারা দেখিলেন সংস্কারযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কি সিদ্ধান্ত। তাঁহার মতে বিগত শতাব্দীর সংস্কারযুগ এক বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টি ব্যতীত আর কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। সংস্কারযুগের নিষ্ফলতার কারণ এই যে ইহা অন্ধভাবে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিয়াছে, আর উদ্ধত বালকের মত প্রাচীন সমাজকে অযথা নিন্দা করিয়াছে ও অজস্র গালি দিয়াছে। স্বামিজী আরো বলেন—

"সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের কোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইতেছে, অধিকাংশ ব্যক্তি কিন্তু তাহা এখনও বুঝেন নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েক-জন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন? প্রথম সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর, বিধান আপনা আপনিই আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোক-শক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোক-শক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য—লোক-শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। গত শতাব্দীতে যে সকল সংস্কারের জন্য আন্দোলন হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পোষাকী ধরণের। এই সংস্কার চেষ্টাগুলি কেবল প্রথম দুই বর্ণকে স্পর্শ করে, অন্য বর্ণকে নহে সংস্কার করিতে হইলে উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, মূলদেশ পর্যন্ত যাইতে হইবে।"

আর একটি স্থানে বলিয়াছেন—

"আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজ সংস্কারের ধূম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম—সমাজ-সংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধির শোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না। এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভর ত দূরের কথা, আত্মপ্রত্যয় এখনও পর্যন্ত অনুমাত্র হয় নাই।"

সমাজ সংস্কারের নিষ্ফলতার একটি অতি গুরুতর কারণ স্বামিজী স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কারণটির যেরূপ বিশদ আলোচনা হওয়া আবশ্যক তাহা এতাবৎ হয় নাই। এবং তজ্জন্য চিন্তারাজ্যে আমরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে জাতিভেদ একটি ধর্ম বিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

"আমি বলি, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য হিন্দু-ধর্ম নাশের কোন প্রয়োজন নাই। এবং হিন্দুধর্ম প্রাচীন রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া সমাজের ঐ অবস্থা তাহা নহে। কিন্তু ধর্মভাবসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।"

স্বামিজী এখানে সনাতন ধর্ম হইতে সামাজিক সাময়িক আচার পদ্ধতিগুলিকে পৃথক করিয়াছেন। এবং সংস্কারকেরা যে সমাজের কু-রীতিগুলিকে পরিবর্তন করিবার জন্য ধর্মকে শুদ্ধ বিসর্জন দিতে বসিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন। স্বামিজী বলেন—

"সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজ-সংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন—তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।"

"সংস্কারগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা—আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

গত শতাব্দীর ধ্বংস-মূলক সংস্কার প্রণালী হইতে তিনি নিজের গঠনমূলক প্রণালীকে এইভাবে পৃথক করিলেন। টুকরা টুকরা ভাবে, যেমন বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ, এক বিবাহ ব্যাপারেই এই ত্রিবিধ সংস্কার, সংস্কারকেরা যে যাহার খুশীমত পৃথক পৃথক ভাবে আরম্ভ করিয়া নিরাশ

হইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ টুকরা টুকরা ভাবে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন গোটা জাতির পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যে। জাতি যদি সুস্থ হয়, সবল হয়, সক্রিয় হয় তবে সেখানে যে সংস্কার আবশ্যক আপনিই তাহা সম্পন্ন হইবে। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

আর একটা স্থান উদ্ধার করিতেছি—

"সংস্কারকেরা বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, আর তাহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি।"

স্বামিজীর মতে, সংস্কারকগণ না আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলিকে বুদ্ধি-বিচার-পূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, না আমাদের গুরুপরম্পরা নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের নিষ্ফলতার কারণ ঠিক করা খুব কঠিন নয়। স্বামিজী আর একটি স্থানে সংস্কারদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"তোমরা যখন একটা স্থায়ী সমাজ গঠন করিতে পারিবে, তখন তোমাদের কথা শুনিব। তোমরা দু'দিন একটা ভাব ধরিয়া থাকিতে পার না, বিবাদ করিয়া উহা ছাড়িয়া দাও, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন। বুদ্বুদের ন্যায় তোমাদের উৎপত্তি, বুদ্বুদের ন্যায় লয়। অগ্রে আমাদের ন্যায় স্থায়ী সমাজ গঠন কর। প্রথমে এমন কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ও প্রথার প্রবর্তন কর, যাহাদের শক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। তখন তোমাদের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিবার সময় হইবে, কিন্তু যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমরা চঞ্চল বালক মাত্র।"

স্বামিজী সংস্কারকদের লক্ষ্য করিয়া আরো বলিতেছেন—

"সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে, সেই জোরে সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন। সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, কতকগুলি ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। * * * সে যে সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ ঐ সকল আচার সাহেবদের মত-বিরুদ্ধ। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ, সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও।"

স্বামিজী সংস্কারকদের লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না। সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা! মনে কর, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে ইহাতে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্তে ত তোমাদের মৃত্যু হইবে তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না।"

যাহারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিশ্রণের কথা বলেন, তাহাদের উত্তরে স্বামিজী বলেন এই ভাব বিনিময় "কেবল দুই দল সমান সমান ব্যক্তির ভিতর আশা করা যাইতে পারে।" দাস কি প্রভুর সহিত ভাব বিনিময় করিবে! আমার মনে হয় আমাদের অসমান অবস্থার জন্যই ভাব বিনিময়ের কথার আবরণে আমরা সমস্ত সংস্কার-যুগ ভরিয়া কেবল এক ভয়াবহ পরধর্মের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছি মাত্র। এই পরানুকরণের মোহ হইতে স্বামিজী আমাদের দৃষ্টিতে ফিরাইতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘণ্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? * * * মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেদের আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সংস্কার-যুগ প্রসঙ্গে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার তৃতীয় আলোচনা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আমি আপনাদের নিকট বলিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে রাজা রামমোহন হইতেই এ যুগে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংস্কারের জন্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ইহা সত্য। রামমোহনের অসাধারণ মনীষা, তাঁহার শরীর ও মনের অপরিমিত বল ও দৃঢ়তা, গত শতাব্দীর সংস্কার যুগের উদ্বোধন কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। ইতিহাসে কোনো একজন মানুষ তাঁহার জাতির জন্য এত বিভিন্ন রকম কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রায় প্রত্যেকটিতেই এরূপ কৃতকার্য হইতে দেখা যায় নাই। ঐতিহাসিক স্মরণীয় চরিত্রের মধ্যেও রাজা রামমোহনের চরিত্র অনুপম ও অসাধারণ।

এই সংস্কার-যুগ, বোধন হইতেই শাস্ত্র-সমস্যা বা বেদসমস্যা দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। বেদের আলোচনা এবং বেদ ও পুরাণাদি অপরাপর শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মর্যাদা লইয়া, শতাব্দীর প্রথমেই এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হয়। এই শাস্ত্রীয় বিচার ও বাদানুবাদের কোলাহল উপলক্ষ্যেই রাজা রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও বিচার-

বুদ্ধির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম পতিত হয়। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা হইতেই শাস্ত্রালোচনার উদ্ভব।

বেদাদি শাস্ত্র নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই রামমোহন প্রথমতঃ সংস্কার কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার বালককালে, অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম-প্রণালী' নাম দিয়া যে গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে তিনি কেবল নিজের যুক্তি-তর্কের প্রমাণ প্রয়োগই করিয়াছিলেন। গভীর শাস্ত্র-বিচার ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে দশ বৎসর বাকী। ইহার কয়েক বৎসর পর তিনি 'মানজারা' নামক এক গ্রন্থ লেখেন। দুই তিন ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে এই গ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বৎসরে 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থে তিনি যে ধর্মের বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোরাণ ও হাফেজ্ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইলেও ঐ বিচার ও মীমাংসা বস্তুতঃ শাস্ত্র নিরপেক্ষ। ঐ গ্রন্থে তিনি প্রধানতঃ যুক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু রাজা রামমোহন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন রংপুর হইতে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন ও বিশিষ্ট রকমে সর্বপ্রকার সংস্কার-কার্যে মনোযোগী হন, তখন তিনি সংস্কারকল্পে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া, একেবারে শাস্ত্র নিরপেক্ষ হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। যুক্তির সহিত শাস্ত্রকেও তিনি তখন গ্রহণ করিলেন। শাস্ত্রকেও যুক্তিসঙ্গত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহা শাস্ত্রের সংস্কার।* রামমোহনের মানসিক বিকাশের ইতিহাসে শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তি এবং শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়, একের পর আর দেখা দিয়াছে।

---

*"I have often lamented that in our general researches into theological truth, we are subject to the conflict of so many obstacles. When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other. And when discouraged by this circumstance we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is alone to conduct us to the object of our pursuit. We often find that instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate an universal doubt incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. *The best method perhaps is neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other, but by a proper use of the lights furnished by both endeavour to improve our intellectual and mental faculties.*"—Raja Ram Mohon Roy.

রামমোহন তাঁহার মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে, এক হস্তে শাস্ত্র এবং অপর হস্তে যুক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ত্র মীমাংসার যে পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল রামমোহন প্রথম বয়সে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই হউক বা পাশ্চাত্যের অথবা আরো বিশেষভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীর স্বাধীন চিন্তাবাদীদের প্রভাবেই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহা উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এই ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং বুঝিতে পারিয়া যুক্তির সহিত শাস্ত্রকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তিকে, নিজের বিচার-বুদ্ধিকে, এককালে বিসর্জন দিয়া কেবল শাস্ত্রানুগত হইয়া গড্ডলিকা প্রবাহে গতানুগতিক ভাবে চলিয়া, আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সম্ভবতঃ তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কাজেই ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া রামমোহন প্রথম জীবনে শাস্ত্রকে এককালে উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। প্রতিক্রিয়ার মুখে এরূপ হয়, হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আবার শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ব্যক্তিগত বিদ্যা-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলে লোক-ব্যবহার ও সমাজ উচ্ছৃংখল হইবার সম্ভাবনা থাকে, রামমোহন তাহাও ক্রমে বুঝিতে পারিয়া, শাস্ত্র ও যুক্তি এই দুইয়েরই সংমিশ্রণে সংস্কার-কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও যুক্তিকেই শাস্ত্রের আবরণে ঢাকিয়া উপস্থিত করিলেন। এবং তাঁহার সংস্কার ও প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য এরূপ পন্থা অবলম্বন করিবার কারণও ছিল।

বহুকাল যাবৎ বাঙ্গলাদেশ হইতে বেদের আলোচনা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। এ যুগে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম সেই নষ্ট, মৃত বেদালোচনাকে পুনরায় জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। ইহা রামমোহনকে এক বিশেষ গৌরবের ভাগী করিয়াছে। রামমোহন বস্তুতঃ যুক্তিকেই মানিয়া, বেদাদি শাস্ত্রকে শুধু তাঁহার আরব্ধ সংস্কার-কার্যের সুবিধার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা বলা শক্ত। বেদের প্রতি রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও হিন্দু সাধারণের যে বদ্ধমূল ধারণা, রামমোহনে তাহা এই বিপর্যয়ের প্রাক্কালে অব্যাহত ছিল কি না তাহাও নিঃসংশয়রূপে স্থির করা কঠিন। রামমোহনের বেদাদি শাস্ত্রালোচনা এবং তৎকালীন সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বেদাদি শাস্ত্রালোচনার পন্থা এক ছিল না। ভিত্তিও এক ছিল না। অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যও এক ছিল না। তাঁহার বিভিন্নমুখী, বহু ভাষানুগামী জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধির পরিমাণ করিবার কেহ তখন ছিল না।

রাজা রামমোহন এযুগে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নষ্ট বেদালোচনার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, এ গৌরব তাঁহাকে আমরা সসম্মানে দিতে বাধ্য। কিন্তু তাঁহার বেদালোচনার পদ্ধতি ও প্রকৃতির সম্যক আলোচনা ব্যতীত কেবল তাঁহার গৌরব লইয়া কোলাহল করিয়া, কাল কর্তন করা আমাদের কর্তব্য নহে। আমরা দেখিতে পাই রামমোহন বেদের আদি লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, বেদের অন্ত

লইয়াই তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন। ইহার দোষগুণ বিচার এস্থলে আমি করিব না। যাহা ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহারই আবৃত্তি করিতেছি মাত্র। বেদ বলিতে রামমোহন বেদান্ত বুঝিতেন। কেননা শ্রুতি বা শঙ্কর-ভাষ্য বেদের আদি নহে, বেদের অন্ত। এবং বেদান্ত আলোচনাই পূর্ণ রকমের বেদ আলোচনা কিনা, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করিবেন।

এই বেদান্ত বা শ্রুতি সমূহের আলোচনায়, রামমোহন বিশেষভাবে শঙ্কর-ভাষ্যকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ গ্রন্থাদিতে ইহার প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে বিদ্যমান। অনেক পণ্ডিতের মতে রামমোহন হুবহু শঙ্করকে কেবল অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু অনেকস্থলেই শঙ্করকে সংশোধন করিয়াছেন। সত্য হইলে একমাত্র ইহারই বলে রামমোহন শাস্ত্র মীমাংসকদের মধ্যে এক অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া, বহু যুগ ধরিয়া অবস্থান করিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু যাঁহারা রামমোহনকে শঙ্কর রামানুজের এ যুগের উত্তরাধিকারী, অথবা শঙ্কর-ভাষ্য সংশোধনকারী শাস্ত্র মীমাংসক বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা কেবল ঘোষণাই করেন, কিন্তু প্রমাণ করেন না। বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা ইহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। রামমোহনের শাস্ত্রালোচনায় রামানুজ ভাষ্যের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। রামমোহন বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি সমধিক বীতশ্রদ্ধ থাকার দরুণ, জীব বলদেব প্রভৃতি গোস্বামী দার্শনিকদের ভাষ্যের প্রতি সম্ভবতঃ তাকাইয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। তথাপি যদি শঙ্কর-ভাষ্য এ যুগে রামমোহনের মনীষা দ্বারা যুগোপযোগী সংস্কারে সংস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া থাকে তবে ইহা অপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে! কিন্তু জীবের নিকট মুক্তিলাভের পরেও ব্রহ্ম সাধনীয় থাকিয়া যান। এইরূপ দু-চারিটি উক্তি হইতে যাহারা রামমোহন দ্বারা শঙ্কর-ভাষ্য সংশোধিত হইয়াছে প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর, আমরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃসাহসী ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? এ বিষয়ে আমরা আরো অধিক ও বিশদ প্রমাণ প্রত্যাশা করি।

রামমোহন বেদের প্রামাণ্য লইয়া যেখানেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, সেইখানেই বেদের সঙ্গে যুক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কিছু অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, যেমন এক নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা—তাহা হইলে 'শাস্ত্রত ও যুক্তিত ইহা প্রমাণ হয়' এইরূপ বলিয়াছেন। আবার যদি কিছু অস্বীকার করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, যেমন মূর্তিপূজা, তাহা হইলে তাহাও 'শাস্ত্রত ও যুক্তিত ইহা প্রমাণ হয়' এইরূপ কহিয়াছেন। কাজেই শাস্ত্র মীমাংসায় প্রমাণ প্রয়োগে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তিকে একই শাণিত কৃপাণের এপিঠ আর ওপিঠ এইরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রার্থ বোধক বা শাস্ত্র মীমাংসার এই পদ্ধতি রাজা রামমোহনের নূতন কিছু আবিষ্কার নয়, ইহা বৃহস্পতি-বাক্যের অনুসরণ মাত্র। "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন

বিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।" রামমোহন এই শ্লোকটিকে তাঁহার অবলম্বিত পন্ধতির সমর্থনের জন্য বহুস্থানে উদ্ধার করিয়াছেন।

বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে রামমোহন শাস্ত্র বাক্যকেই অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—"বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে, তাহার বাক্য বিজ্ঞলোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে?"

বেদের অর্থাৎ শ্রুতির পরেই, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদিকেও রামমোহন শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। তবে যে স্থলে বেদের সহিত ইহাদের বিরোধ দৃষ্ট হইবে সে স্থলে বেদই গ্রাহ্য, স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ গ্রাহ্য নহে। রামমোহন বলিতেছেন—"অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত টীকা না থাকে, তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না।" শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহে, "গোস্বামীর সহিত বিচারে"—রামমোহন ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এবং সেই প্রসঙ্গেই পুরাণাদির প্রামাণ্য বিষয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা তিনি বলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্তসূত্রের ভাষ্য কি না, স্থানান্তরে সে আলোচনা করা যাইবে।

রামমোহনের শাস্ত্র ব্যাখ্যা, ডিরোজীও-ধারার অভিপ্রায় অনুযায়ী শাস্ত্র নিরপেক্ষ নয়, শাস্ত্রকে উপেক্ষা নয়। স্যার রাধাকান্তের রক্ষণশীল ধারার ব্যাখ্যা-মতে, বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত আবর্জনা সমেত শাস্ত্রকে সমর্থন নয়। তাহাতে শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয় না। এবং গতিহীন এক স্থিতিশীল শাস্ত্রকে চিরকাল অবলম্বন করিয়া যে জাতি থাকিবে তাহারও ক্রমোন্নতি পথে কোন প্রস্থান বা গতি একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সে জাতি পঙ্গু। পৃথিবীর অন্যান্য চলন্ত জাতির সহিত এক সঙ্গে উন্নতির পথে চলিতে পারিবে না। শাস্ত্র ও সমাজ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সংবন্ধ। ক্রম-বিকাশের পথে একের গতি স্বীকার করিলে, অন্যের গতি স্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্র ও সমাজের পরস্পর এই অঙ্গাঙ্গীযোগ রামমোহনের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা এক অভিনব মৌলিক ব্যাখ্যা এবং বর্তমান যুগের বিশেষ উপযোগী। শ্রীরামপুরের পাদরীগণ হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যায়, শাস্ত্রের স্থূলমর্মকে বিদ্বেষবশতঃ বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রের গতিমুখে প্রক্ষিপ্ত বা বিকৃতকে বর্জন করিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বুঝাইতেও পারেন নাই। ইহার কারণ, তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের বা হিন্দু ধর্মের সংস্কার ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু ধর্মকে এককালে সর্বথা পরিত্যাগ করিয়া, খৃষ্টান ধর্ম বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প লইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সাধু ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও উপায় সমাজ ও ধর্ম-বিজ্ঞানের অনুমোদিত ছিল না বলিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। হিন্দুর মত একটা প্রাচীন জাতি, হিন্দু শাস্ত্রের মত এক অতি প্রাচীন শাস্ত্র পরম্পরা ও তদঙ্গীয় সভ্যতা এবং তাহার সমস্ত অতীতকে যে কোন

প্রকার ভয় বা প্রলোভন কোন যুগেই সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, করেও নাই। বহু অতীতের সংস্কার একটা প্রাচীন জাতির পক্ষে কালক্রমে বিস্মরণ হওয়া সম্ভবপর হইলেও, যখন সেই জাতি সজাগ হয়, তখন জ্ঞাতসারে বিনা বিচারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, নূতন আর এক জাতির ধর্ম বা শাস্ত্র অবিকল গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙগালী জাতি মৃতও নহে ঘুমন্তও নহে। নব জাগরণের অরুণ-দীপ্তি চক্ষে লইয়া বাঙগালী তখন জাগিতেছে—জাগিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সকলের গতি-মুক্তি বিস্মিত নেত্রে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। এ হেন সময়ে শ্রীরামপুরের পাদরীগণ হিন্দু শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রের ধারায় দার্শনিক চিন্তার পর পর সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য হিন্দুকে তাহার ধর্ম ও শাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। রামমোহন তাহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই শ্রীরামপুরী-ধারাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলেন। এবং এই বাধা প্রদানে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। তাহার কারণ রামমোহনী-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা অধিকতর উন্নত ও অধিকতর সমাজ ও ধর্ম-বিজ্ঞান সম্মত। রামমোহন তাহার শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রত্যেক জাতীয় শাস্ত্রকে জ্ঞানের ভিত্তির উপর আনিয়া ঐ শাস্ত্রকে উদার ও সার্বভৌমিক করিয়া তুলিয়াছেন। এক উদার ও সার্বভৌমিক ধর্ম ও সমাজের আদর্শকে প্রত্যেক জাতীয় শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এতদিক দিয়া এতমতে রামমোহনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐতিহাসিকের আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

রাজা রামমোহনের বেদ আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। রামমোহনের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত সকলে একমত হইতে না পারিলেও, তিনি যে সংস্কার যুগের উদ্বোধনকল্পে, আমাদের জাতীয় শাস্ত্রের উপরেই ঐকান্তিক নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ। এবং তাঁহার এই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা যে বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ রামমোহনের অনুবর্তীয়েরা রাজার এই শাস্ত্রীয় মীমাংসামূলক যে সংস্কার-পদ্ধতি তাহা সম্যক্ আলোচনা করিয়াছিলেন বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। এবং না বুঝিয়াই তাঁহারা রামমোহনের পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি এ কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করি না যে, রামমোহনের পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া নামমাত্র রামমোহন-পন্থীরা বহু পরিমাণে রামমোহন হইতে বিপথগামী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের, আদর্শবাদের উচ্ছৃঙখলতায় তাঁহারা রামমোহনের আরব্ধ সংস্কার-কার্যকে বহুদিকে পণ্ড করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থ সঙকলনের সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে

বেদের প্রামাণ্য লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইলেন তাহা রামমোহনের পন্থার বিপরীত। অবশ্য অক্ষয়কুমার দত্তের প্ররোচনাতেই "বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কিনা?" ব্রাহ্মগণ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরে বেদকে ব্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করেন। "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মে"র পরিবর্তে "ব্রাহ্মধর্ম" নাম হয়। ব্রাহ্মগণ বেদকে বর্জন করেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, রামমোহন, যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদের মধ্যে বেদকে রক্ষা করিয়া এক নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া যাহারা কালে বেদ মানিবে না, তাহাদের মধ্যে কিরূপে ধর্ম-সংস্কার করিতে হইবে তাহা রামমোহনের "তখন বিবেচনায় আইসে নাই!" রামমোহনের ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন, অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্র-মীমাংসার প্রতি এত বড় অমর্যাদার কথা এক দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কে বলিয়াছেন? জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার রামমোহন-পন্থী হইয়াও রামমোহনের শাস্ত্র-সংস্কারের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি জাতীয় শাস্ত্রের নবযুগোপযোগী ব্যাখ্যা না করিয়া, জাতীয় বিজাতীয় সকল শাস্ত্রের সত্য একত্রে মিশাইয়া, ব্রাহ্মধর্ম শাস্ত্রের এক খেচরান্ন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। ইহার মধ্যে যে সার্বভৌমিকতা, যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতন্ত্রহীন। এবং বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়াই কার্যকরী হইতে পারে নাই। সার্বভৌমিকতা কোন জড় পদার্থ নয় যে বিভিন্ন জাতির অংশ আনিয়া একত্রে নির্বিচারে জুড়িয়া দিলেই একটা বৃহত্তর ব্যাপকতা লাভ করা যাইবে। সার্বভৌমিকতা একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ। ইহা প্রত্যেক জাতির বিশিষ্টতার মধ্যেই বিকশিত হইতে পারে; এবং যুগে যুগে হইয়াছেও তাহাই। এইজন্য রাজা রামমোহন জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্যেই বর্তমান যুগের বিশাল আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে প্রস্ফুটিত করিবার মানসে, জাতীয় শাস্ত্রকেই সার্বভৌমিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। জাতীয় শাস্ত্রই সার্বভৌমিক হইতে পারে—ইহাই ছিল রামমোহনের বিশ্বাস। ইহাই ছিল রামমোহনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যার গুরুত্ব ও ইঙ্গিত। অক্ষয়কুমার তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমার ভাবিলেন জাতীয় শাস্ত্র কোন মতেই সার্বভৌমিক হইতে পারে না, আর যেহেতু শাস্ত্রকে এ যুগে সার্বভৌমিক হইতেই হইবে, কাজেই শুধু জাতীয় শাস্ত্রে চলিবে না, বিজাতীয় শাস্ত্র, এমন কি সত্য হইলে কোঁৎ লাপ্লাসের নাস্তিক্যবাদও জাতীয় শাস্ত্রের সহিত জুড়িয়া দিয়া জাতীয় শাস্ত্রকে এই বিজ্ঞানের দিনে সার্বভৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে। জাতীয় শাস্ত্রকে সার্বভৌমিক করিবার এই পন্থা, স্পষ্টতঃ রামমোহন-বিরোধী পন্থা। শুধু অক্ষয়কুমার নয় অক্ষয়কুমারের পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার নববিধানে পর্যন্ত এই রামমোহন-বিরোধী পন্থা অবলম্বন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন।

গত শতাব্দীতে ইউরোপের আদর্শ দ্বারা আমরা এমনি আক্রান্ত হইয়াছিলাম যে, এক রামমোহন ব্যতীত আর কেহই সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত না হইয়া যান নাই। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র ইঁহারা কেহই রামমোহনের বেদের

আলোচনা ও ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারে বেদের প্রামাণ্য উদ্ধৃত করিবার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই। জাতীয়তা কি করিয়া বিকাশের পথে সার্বভৌমিক হইতে পারে ইহা তাঁহারা রামমোহনের মত বিশদ ও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। রামমোহনের পরে বেদের আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংস্কার-যুগের সমস্ত নেতারাই রামমোহন হইতে স্খলিত ও অল্পাধিক বিপথগামী। ইঁহারা স্বজাতির ধর্ম ও স্বজাতির শাস্ত্রকে বহু পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া যেরূপ পর-ধর্ম ও পর-শাস্ত্রের প্রতি কি এক—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'সম্মোহনে' ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তাহার কারণ পর-ধর্মের ঐ সম্মোহন-শক্তি, আর আত্ম-শক্তি ও আত্ম-সংবিতের সম্যক্ অভাব। পর-শাস্ত্রাভিমুখী দীর্ঘ এক সংস্কারযুগের স্রোত ধাক্কা পাইয়াছিল, বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দে। রামমোহন হইতে উৎসারিত অথচ রামমোহনেরই অভিপ্রেত পথে স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের পর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে। ইহা আশ্চর্য। ইহা একটি বিশেষ গুরুতর ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেকে হয়ত সন্দেহ করিবেন, হাস্য করিবেন যে ইহা কিরূপে সম্ভব? তাঁহারা বলিবেন রামমোহন সমাজের নেতা, আর বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম-বিরোধী নব্যহিন্দু দলের নেতা। রামমোহনের স্রোত, কি না, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্রে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুক্তি পাইল, প্রবাহিত হইল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া! রামমোহন গৃহী, মূর্তিপূজার বিরোধী আর বিবেকানন্দ মূর্তিপূজক-গুরুর শিষ্য ও মূর্তিপূজক সন্ন্যাসী। ইহাদের আবার সাদৃশ্য কোথায়?

তাহার উত্তর এই যে, যদি রামমোহন ও বিবেকানন্দে, এই বেদ ও শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে একটা সাদৃশ্য আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করিত, তবে নিশ্চতই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতাম না। সংস্কার-যুগেই বেদাদি শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে রামমোহনের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের মর্মান্তিক পার্থক্য ও স্বামী বিবেকানন্দের মর্মগত সাদৃশ্য যদি আমার দৃষ্টিকে লুব্ধ না করিত তবে নিশ্চিতই আমি একথা আপনাদিগকে বলিতে সাহসী হইতাম না। আর প্রমাণ এত প্রত্যক্ষ যে, ইহা অতিশয় দুঃসাহসও নয়। যদি আমি বলি, যে বেদ আলোচনা-প্রসঙ্গে রামমোহন-অনুবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকেরা রামমোহন হইতে স্খলিত, আর অনেকাংশে ব্রাহ্ম-বিরোধী বিবেকানন্দ, রামমোহনী-পন্থার অনুগামী, তাহা হইলেও শাস্ত্রা-লোচনায় রামমোহন ও বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য আমি অস্বীকার করিব না। রাম-মোহনের যুগ ও বিবেকানন্দের যুগ এক নহে, ভিন্ন। শাস্ত্রালোচনা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়। সেই হিসাবে অনেকে ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের বেদ-উপেক্ষা তাঁহাদের যুগ-প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেননা ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের যুগ, রাজা রামমোহনের পূর্বে নহে, পরে। এবং রামমোহনের পরে, রামমোহনের মত

সমস্ত দিক দিয়া তাঁহারা কেহই একটা বড় যুগের স্রষ্টা বা যুগ-প্রবর্তক নহেন। বেদ-বেদান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের যুগ হইতে রামমোহনের যুগ অধিকতর জটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বেদ আলোচনা বিবেকানন্দের পক্ষে যত সুগম ছিল, রামমোহনের পক্ষে তাহা কিছুই ছিল না। এবং বিধিবদ্ধ প্রণালীতে রামমোহন যেরূপ বেদাদি শাস্ত্রালোচনা করিয়া গিয়াছেন, স্বামিজী তাহা করেন নাই। উভয়ের প্রচারকার্যের প্রকৃতি, স্থান ও কাল-পার্থক্যে রামমোহন ও বিবেকানন্দে বেদাদি শাস্ত্রালোচনায় অবশ্য পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই পার্থক্য পাছে আমি অস্বীকার করি এইরূপ কেহ ভাবেন, সেইজন্য ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের বেদ আলোচনার সাদৃশ্যের প্রতিই আপনাদের দৃষ্টিকে আমি আকর্ষণ করিতে চাই।

রামমোহন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন যে আমাদের জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে, জাতীয় শাস্ত্রের সংস্কার সর্বপ্রথমে আবশ্যক, জাতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সর্বপ্রথমে কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক তাহাই ভাবিয়াছিলেন। বেদান্তের মীমাংসায় রামমোহনও অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। রামমোহন যেরূপ শঙ্কর-শিষ্য বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দও তদ্রূপ শঙ্করানুগামী হইয়াই বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামমোহনও মায়াবাদী, স্বামী বিবেকানন্দও তাহাই; আমি অবশ্য শঙ্কর হইতে ইঁহাদের উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য এবং ইহাদের পরস্পর পার্থক্যের বিষয় বিস্মৃত হইতেছি না। রামমোহনে অদ্বৈতবাদ যে প্রয়োজনের জন্য দেখা দিয়াছিল, অল্পাধিক সেই প্রয়োজনেই বিবেকানন্দেও অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইয়াছিল। তবে দুই বিভিন্ন যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা ও নিরসনকল্পে একই বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয় নাই। এই প্রসঙ্গেরই বিস্তৃত আলোচনা ক্রমে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

হিন্দু জাতির ইতিহাসে ও শাস্ত্রের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগ বর্তমান। বিগত শতাব্দীতে সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া আমাদের জাতির ও শাস্ত্রের ইতিহাস হইতে রামমোহন বিশেষভাবে বেদান্তের যুগকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদের আদি যুগকে অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞের যুগকে গ্রহণ করেন নাই। এবং পৌরাণিক যুগের কোন অংশকেও পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। বরং নিরসনকল্পে উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

রামমোহন সমগ্র পৌরাণিক যুগকে যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন। রামমোহন মুখ্যতঃ এই পৌরাণিক যুগকেই নানারূপ ধর্ম ও সামাজিক গ্লানির জন্য দায়ী করিয়া এই যুগের শাস্ত্র, লোক-ব্যবহার ও ধর্মের সাধন-পদ্ধতিকে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এবং সমগ্র জাতিকে এই যুগ অতিক্রম করিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দও এক্ষেত্রে অনেকটা রামমোহন-অনুগামী, তিনিও বেদের

কর্মকাণ্ডের যুগকে নয়, বেদান্তের যুগকেই প্রচার করিয়াছেন। তবে পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে বিচারে রামমোহন ও বিবেকানন্দের সাদৃশ্যও যেমন আবার পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। রামমোহন অপেক্ষা বিবেকানন্দ পৌরাণিক যুগের উপর অধিকতর সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা।

স্বামিজী বলিয়াছেন—

"হে বন্ধুগণ, হে স্বদেশবাসিগণ, আমি যতই উপনিষদ পাঠ করি, ততই আমি তোমাদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকি। কারণ, উপনিষদুক্ত এই তেজস্বিতাই আমাদের বিশেষভাবে জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। শক্তি—শক্তি—ইহাই আমাদের চাই। আমাদের শক্তির বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কে আমাদিগকে শক্তি দিবে? আমাদিগকে দুর্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে। গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতে যত পুস্তকালয় আছে, তাহার ¾ অংশ পূর্ণ হইতে পারে। এ সকলই আমাদের আছে। যাহা কিছু আমাদের জাতিকে দুর্বল করিতে পারে, তাহা আমাদের বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আছে। বোধ হয় যেন বিগত সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই লক্ষ্য ছিল যে, কিরূপে আমাদিগকে দুর্বল হইতে দুর্বলতর করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আমরা প্রকৃতপক্ষে কীটতুল্য দাঁড়াইয়াছি। এখন যাহার ইচ্ছা সেই আমাদিগকে মাড়াইয়া যাইতেছে। * * হে বন্ধুগণ, আমি পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য বলিতেছি আমাদের আবশ্যক শক্তি—শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্-সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ। উপনিষৎ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ—তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। * * * প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হও। দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।"

স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছেন—

"এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ সেই বলপ্রদ আলোক-প্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর। * * * ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর। তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।"

শাস্ত্রলোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে ঠিক রাজা রামমোহনের মতই স্বামিজী বলিতেছেন—

"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। * * শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপর দিকে

বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুজ্ঞেয় কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন, সুতরাং কালে কালে সে গুলির পরিবর্তন হয়। এইটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল, যখন গো-মাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। * * * * * বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে। কিন্তু স্মৃতির প্রাধান্য যুগ-পরিবর্তনেই শেষ হইয়া যাইবে। সময়-স্রোত যতই চলিবে ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ হইবে। আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন। সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্যও সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।"

আমি বেদান্ত যুগের পুনরুদ্দীপন সম্বন্ধে, বেদান্তের আলোচনার প্রয়োজন বিষয়ে ও বেদের শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিগুলি কতক কতক উদ্ধৃত করিলাম, অধিক করিলাম না; কেন না, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। আর যদি কেহ না জানেন, এমন সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, তবে তিনি স্বামিজীর যে কোন গ্রন্থাদির একখানি খুলিয়া দেখিলেই, আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না।

সংস্কারযুগের বোধন-যজ্ঞের পুরোহিত রাজা রামমোহনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বেদ আলোচনা ও বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়াও আমি তাঁহাদের উভয়ের মূলতঃ সাদৃশ্যের কথাই আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম।

পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা

পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে, সংস্কার-যুগ-পুরোহিত রামমোহন ও তদনুবর্তীদের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তের মিল ও বিরোধ কোথায় এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগ এই পৌরাণিক যুগকে লইয়া বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মূলতঃ এই সংস্কার যুগের প্রেরণা আসিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবাদীদের মত ও আদর্শ হইতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ বিশেষতঃ ফরাসী দেশ এক বিপ্লববাদ-মূলক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার অতীত যুগের নানারূপ অমানুষিক ও গর্হিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার জন্য জাতির সমস্ত শক্তিকে

সংহত করিয়া নিয়োগ করিয়াছিল এবং বহু পরিমাণে সক্ষমও হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জাতির আদর্শ ও বিপ্লবের অভ্যুদয়ের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীর রেনেসেন্স বা প্রাচীন শাস্ত্র চর্চার উদ্দীপনা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর জার্মেনীর রিফরমেশন অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্মসংস্কারকদিগের প্রেরণা একত্রিত হইয়া কার্য করিয়াছিল। ইউরোপের জ্ঞানী বিচক্ষণ সমালোচকেরা তাঁহাদের সভ্যতার ইতিহাসে ইটালীর রেনেসেন্স, জার্মেনির রিফরমেশন ও ফরাসীর বিদ্রোহ যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করিয়াছিলেন যে, ফরাসীর বিদ্রোহের পরে সমগ্র মানবজাতির জন্য এমন এক স্বাধীনতা ও সাম্যবাদমূলক সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হইল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বহু শতাব্দী পর্যন্ত অন্যান্য দেশ ও জাতির সভ্যতাকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে ইউরোপব্যাপী মহাযুদ্ধের সূত্রপাত দেখা দিল—তাহাতে কেহ মনে করিতে পারেন, যে ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়? অথচ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী আমরা, ঐ চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর অষ্টাদশ শতাব্দীর আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী আদর্শে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য ইউরোপের এই ভবিষ্যৎ অশান্তি ও যুদ্ধ কল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি পঁচিশ বৎসর পূর্বে ইউরোপকে সম্বোধন করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি না ইউরোপ তাহার জড়-বাদমূলক সভ্যতার আদর্শকে, হিন্দু সভ্যতার আধ্যাত্মিক আদর্শ দ্বারা সংশোধিত করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত ইউরোপের জাতিসকল নিশ্চিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর স্বামিজীর সেই ঘোষণার পর পঁচিশ বৎসর যাইতে না যাইতে ভীষণ যুদ্ধের সূত্রপাত দেখা দিয়াছিল।

যাহা হউক সংস্কারবাদী ইউরোপ যে চক্ষে তাহার মধ্য যুগকে দেখিয়াছিল, বাঙ্গালী সংস্কারকগণও গত শতাব্দীতে সেই ইউরোপের অনুকরণে তাহার পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র, লোক-ব্যবহার ও ধর্মসাধন-পদ্ধতি মূলতঃ সংস্কারযুগের আক্রমণের ও প্রতিবাদের বিষয় হইয়াছিল। রাজা রামমোহন এই পৌরাণিক যুগের স্কন্ধেই অল্পাধিক আমাদের জাতীয় দুর্গতির সমস্ত হেতুকে আরোপ করিয়া এই পৌরাণিক যুগকে ইউরোপের মধ্যযুগের ন্যায়, দূর করিয়া দিবার মানসে এক ভীষণ সংগ্রামে বদ্ধমুষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তথাপি রামমোহন এই পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র ও আচার পদ্ধতিকে যতটা সুবিচার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু রামমোহন-অনুবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারক-গণই পৌরাণিক যুগকে ইউরোপীয় সংস্কারকগণের ধারণা দ্বারা অন্ধভাবে পরি-

চালিত হইয়া নিতান্তই অবিচার করিয়াছেন। কোন বড় প্রতিভা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যে যতই পর্যুদস্ত হউক না কেন, একেবারে কোন গুরুতর মারাত্মক ভ্রম সাধারণতঃ করেন না। এই জন্যই রামমোহনের প্রতিভার মধ্যে আমরা সর্বদাই চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া, সমীচীন মীমাংসায় আসিবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা দেখিতে পাই নাই। কোন কোন স্থলে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী আবার কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক যুগের বিচারে রামমোহনের মত এত বড় মনীষারও অপক্ষপাত দৃষ্টির ও সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রমই দেখা যায়। কিন্তু রামমোহনের মধ্যে যাহা মাত্র ব্যতিক্রম, রামমোহন-অনুবর্তীদের মধ্যে তাহাই প্রচলিত নিয়ম বলিয়া যেন আমাদের ভ্রম হয়। কেননা রামমোহন অনুবর্তীদের কাহারও প্রতিভা কোনদিকেই রামমোহনের সমতুল্য ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই পৌরাণিক যুগের বিচারে. ব্রাহ্মসংস্কারকগণ তো অল্প কথা, রামমোহনের প্রতিভারও কোন কোন ভ্রমকে সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি ক্রমে ইহাদের পরস্পরের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যের প্রমাণ দিতেছি।

রাজা রামমোহন পৌরাণিক যুগের শাস্ত্রকে বেদের পরে যেরূপ প্রামাণ্য মর্যাদা দিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দেরও তাহাই মত। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের এই ধারা কি রামমোহন, কি বিবেকানন্দ, কাহারই স্বকপোল উদ্ভাবিত নহে। ইহা হিন্দুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ-পদ্ধতির বহু প্রাচীন ধারা। স্বামী বিবেকানন্দও রামমোহনের মতই স্বীকার করিয়াছেন যে, যেস্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতি, তন্ত্র বা পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেস্থলে বেদই প্রামাণ্য, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রামাণ্য নহে। বাহুল্য ভয়ে স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রসঙ্গে অধিক উক্তি আমি উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। যাহা উদ্ধার করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আশা করি।

শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা আমাদের পুরাণ শাস্ত্রকে ও পুরাণোক্ত দেবদেবিগণকে ও পুরাণের সৃষ্টি ও ধর্মতত্ত্বকে যেরূপ অশ্রদ্ধার সহিত আক্রমণ করিয়াছিল, সেই আক্রমণের উত্তরে রাজা রামমোহন রায় পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন বলেন—

"পুরাণাদি শাস্ত্র সর্বথা ঈশ্বরকে বেদান্তানুসারে অতীন্দ্রিয় আকারে রহিত কহেন। পুরাণে অধিক এই যে, মন্দবুদ্ধি লোক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া সম্যক্ প্রকারে পরমার্থ সাধন বিনা জন্মক্ষেপ করিবে কিংবা দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইবে, অতএব নিরবলম্বন হইতে ও দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মনুষ্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির সর্বদা গ্রহ হয়, তদ্বিশিষ্ট করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর উদ্দেশ

হয়, পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বারংবার ঐ পুরাণাদি সাবধানপূর্বক কহিয়াছেন যে, এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল কল্পনা করিয়া মন্দ বুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম; বস্তুতঃ পরমেশ্বর নামহীন ও ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগরহিত হয়েন।"

রামমোহন পুরাণ-কথিত ধর্মকে নিম্ন অধিকারীর যোগ্য বলিয়া তাহার একটা স্থান নির্দেশ করিতেছেন। এবং ক্রমে এই সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর ধর্মজ্ঞান অর্থাৎ নামরূপহীন এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস সম্ভব বলিয়াও বিবেচনা করিতেছেন। ইহা অধঃপতিত যুগে একটা নিম্নস্তরের ধর্ম। অথচ ইহাকে অবলম্বন করিয়া উন্নত স্তরের ধর্মে প্রবেশের পথ আছে।

রামমোহন-পরবর্তী ব্রাহ্মসংস্কারকেরা পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে এতাদৃশ উদার ভাব কখনই পোষণ করিতে সক্ষম হন নাই। পৌরাণিক যুগের ধর্মকে তাঁহারা অধর্মই মনে করিয়াছেন। ধর্মের বিবর্তন পথে ইহাকে একটা স্তর বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এইস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পুরাণের যুগকে রামমোহন এক অবনতির যুগ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিলেন। কেননা পুরাণধর্মের প্রকাশেই প্রমাণ যে, ইহা এক অতি নিম্নাধিকারীর ধর্ম—যাহারা বেদান্ত-নির্দিষ্ট এক নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ও ধারণায় অসমর্থ ইহা তাহাদের জন্য। রামমোহনের গবেষণা এইস্থলে খুব প্রশংসনীয় নয়। তাঁহার বিচারও খুব অপক্ষপাত নয়। কেননা বস্তুতই পুরাণের যুগ এক তমোগ্রস্ত যুগ নহে। কোনো কোনোদিকে, অন্ততঃ সমস্ত দিকে না হইলেও, এই পৌরাণিক যুগও একটা বিকাশের যুগ। এবং পৌরাণিক যুগের এই বিকাশকে, আমাদের জাতীয় শাস্ত্রের ধারাকে অনুসরণ করিয়া, রাম-মোহনের যুগে বুঝিতে পারা যে অতিশয় অসাধারণ মনীষার কার্য তাহা অস্বীকার করি না। কেননা যাহাকে মন্দ বলিয়া প্রতিবাদ করিতে হইবে তাহারি সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী আবদ্ধ ভালদিকগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া দেখান অত্যন্ত শক্ত। আমরা ত রামমোহনের প্রতিভাকে অসাধারণ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সুতরাং এই অসাধারণ প্রতিভাকে আমরা কঠোর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। তাহা করিলে রামমোহনের প্রতিভাকে অপমান করা হইবে।

রাজা রামমোহন শাস্ত্রের ধারায় গতি স্বীকার করিয়াছেন, অথচ পৌরাণিক যুগের বিকাশকে স্বীকার করেন নাই। রামমোহন মূর্তিপূজার উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ইসলামের নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদ দ্বারা বাল্যকালেই তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কাজেই মূর্তিপূজাবহুল, বহু দেবদেবীপূর্ণ পুরাণ-ধর্মকে মূর্তিপূজাবিরোধী একেশ্বরবাদী বিশেষতঃ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী রামমোহন নিতান্ত অপক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়। এবং ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কিছু নাই। এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক যুগের ধর্মে

ভক্তির একটা বিকাশই খুব সুস্পষ্ট। জ্ঞানপন্থী শঙ্কর-শিষ্য রামমোহন, নির্গুণ ও মায়াবাদী রামমোহন, সে কারণেও এই পৌরাণিক ভক্তিধর্মের উপর সুবিচার করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ইহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দ পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রামমোহন হইতে অধিকতর অপক্ষপাত ও উদার সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আপনারা প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন যে, যে সমস্ত সংস্কারের জন্য রামমোহনের প্রতিভা পৌরাণিক যুগকে সুবিচার করিতে পারেন নাই তাহার কতক কারণ স্বামী বিবেকানন্দেও বর্তমান ছিল। তিনিও মায়াবাদী ছিলেন। তথাপি রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ের ভাব তাঁহার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি রামমোহনের মত বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অবিচার করিতে পারেন নাই। এবং তাহা পারেন নাই ও করেন নাই বলিয়াই রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের পৌরাণিক-যুগের ব্যাখ্যা অধিকতর পক্ষপাতশূন্য। ইহা ছাড়া মূর্তিপূজা সম্বন্ধে রামমোহনের যে বিদ্বেষ ছিল, স্বামী বিবেকানন্দে তাহা আদৌ ছিল না। তিনি হিন্দুর মূর্তিপূজাকে রামমোহনের মত কেবল নিকৃষ্ট নিম্নাধিকারীর জন্য স্বীকার করিয়াও, অত্যুন্নত বেদান্ত জ্ঞানের সহিত ইহার এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁহার গুরুর জীবনে দেখিয়া এবং তদনুযায়ী নিজের জীবনে আচরণ করিয়া, নিশ্চিতই রামমোহন হইতে পৌরাণিক যুগকে কেবল মতবাদের দিক হইতে নয়, পরন্তু সাধনের দিক হইতে, প্রকৃষ্টতররূপে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদাতিরিক্ত ইহাও বলিতে হয় যে রামমোহনের যুগ অপেক্ষা বিবেকানন্দের যুগ, শাস্ত্রের ধারায় বিকাশের তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে বিশেষ-রূপেই অনুকূল ছিল।

আমি পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দের দৃষ্টির পার্থক্য আপনাদিগকে বুঝাইতেছি। আপনারা জানেন যে, বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। তন্ত্রকেও পৌরাণিক যুগের শাস্ত্র বলিয়াই আমি তুলনা করিতেছি। কোন পুরাণে বিষ্ণুকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কোন পুরাণে শিবকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কোন পুরাণ বা তন্ত্রে কালীকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? ইহার মধ্যে রামমোহন দেখিলেন কেবল এক ধর্ম-কলহ। কেবল এক দুর্গতির চিহ্ন। অবশ্য ধর্ম-কলহও ইহাতে আছে, আর দুর্গতির চিহ্নও যে একেবারে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাহাই সব নয়। এবং এমন কি রামমোহনও স্থানে স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে ধর্ম-কলহই পুরাণাদির সার কথা নয়। যেমন—

"এই সকল অধিদৈবত (পুরাণ) শাস্ত্রে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য, আর অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন,

ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসা মাত্র তাৎপর্য হয়। এইরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া অন্যাপেক্ষা এক এক দেবতার প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিলে অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন না।"

অন্য দেবতা কদাপি হেয় হয়েন নাই, যদি বিভিন্ন দেবদেবীবাদীরা ইহা বিশ্বাস করিতেন, তবে তাহাদের মধ্যে ধর্ম-কলহের কথা ভাবিয়া রাজা রামমোহন এতদূর শঙ্কিত হইলেন কেন? রামমোহন নিজেই সম্ভবতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব বিদ্বেষের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এতদূর পণ্ডিত হইয়া তিনি নিজেও পৌরাণিক ধর্ম-কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের মতে—

"শৈব একথা বলে না যে বৈষ্ণব মাত্রেই অধঃপাতে যাইবে, অথবা বৈষ্ণবও শৈবকে একথা বলে না। শৈব বলে আমি আমার পথে চলিতেছি, তুমি তোমার পথে চল। পরিণামে আমরা সকলেই একস্থানে পৌঁছিব। * * * ঈশ্বরোপাসনায় বিভিন্ন প্রণালী আছে। বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিন্ন সাধন প্রণালীর প্রয়োজন। তবে ভেদ আছে বলিয়া বিরোধের প্রয়োজন নাই।"

পুরাণোক্ত এই ধর্ম-কলহের উপর রামমোহনের পরে অক্ষয়কুমার দত্ত, তাঁহার 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় রামমোহনকে অনুকরণ করিয়া যথেষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সমস্তই একদেশদর্শী বরং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পৌরাণিক যুগের এক উন্নত রূপক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি ও বিচার অধিকতর গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফল এবং সম্ভবতঃ লোক-চরিত্রের বৈচিত্র্যের উপরেও তাঁহার দৃষ্টি খুব প্রখর। এবং জাতীয় ভাবও খুব প্রবল।

স্বামিজী পুরাণকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"এই পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্বাবধিই বর্তমান। সংহিতাতেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়, কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ উপনিষদে, কিন্তু উহার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে। সুতরাং ভক্তি কি বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া ইদানীং বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। উহা ছাড়িয়া দিয়া একটি জিনিষ আমরা নিশ্চিতরূপেই দেখিতে পাই, তাহা এই ভক্তিবাদ। * * * সৌন্দর্যের মহান আদর্শের, ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কার্য বলিয়া বোধ হয়। পুরাণ সাধারণ মানুষের ধারণার অধিকতর উপযোগী। পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন আপনাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যান-প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। * * পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক।"

আমি স্বামিজীর পুরাণ সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধার করিলাম। এবং আমার বিশ্বাস যে, আমি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি যে রামমোহন এবং ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ পৌরাণিক যুগের যে একদেশদর্শী ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর আত্মস্থ হইয়া অধিকতর উন্নত ব্যাখ্যা সংস্কারযুগের অন্তে রামকৃষ্ণ-সমন্বয়যুগের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন।

সংস্কারযুগের প্রাক্কালে রাজা রামমোহন কর্তৃক কিরূপে বেদের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, বেদের প্রামাণ্য কিরূপে গৃহীত এবং কিরূপে বা সংস্কার-যুগে অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের বিজয় দুন্দুভি নিনাদের সাদৃশ্য কোথায় এবং কিরূপ, তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, রামমোহনের আরব্ধ বেদালোচনা কিরূপে পরবর্তীকালের ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সংস্কারযুগের অন্তে, রামকৃষ্ণ-সমন্বয়যুগের প্রাক্কালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির সমালোচনাকে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত করিয়া, তাহা অপেক্ষা যে স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত অধিকতর অপক্ষপাত দৃষ্টিপূর্ণ এবং উন্নত তাহা স্বামিজীর ও রাজা রামমোহনের উক্তিগুলিই প্রমাণ করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক যুগে ভক্তিবাদ

রাজা রামমোহন রায় ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ, বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য অক্ষয়কুমার দত্ত, আমাদের পৌরাণিক যুগকে সংস্কারযুগের প্রারম্ভে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারযুগের অন্তে রামকৃষ্ণ-সমন্বয়যুগের অভ্যুদয়ে, পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে আমাদিগকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর অপক্ষপাত ও সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, ইহা রামমোহন ও বিবেকানন্দের কতক কতক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি।

রাজা রামমোহন চিহ্নিত ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ অপেক্ষা রামকৃষ্ণ-সমন্বয়যুগ অধিক-তর আত্মস্থ হইবার যুগ। স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের অপেক্ষা পৌরাণিক যুগের উপর অধিকতর সুবিচার করিতে পারিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহাও তাহার একটি কারণ। ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ ও রামকৃষ্ণ-সমন্বয় যুগে যে আদর্শের পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা পৌরাণিক যুগের প্রতি এই দুই অভিমত ও সিদ্ধান্ত দ্বারাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রত্যেক পরবর্তী যুগ তাহার পূর্ববর্তী যুগের ফল। এবং তদতিরিক্ত

আরো কিছু বেশী। পৌরাণিক যুগ হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে, এমন কি বাঙ্গালী সভ্যতার ইতিহাসেও একটা আকস্মিক দুঃস্বপ্ন বা দুর্ঘটনা নহে। আমরা উপনিষদ আর শঙ্কর-ভাষ্যের যুগ হইতে সহসা একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌরাণিক যুগের সহিত মুখামুখী হই নাই। অকস্মাৎ নিরাকার পরব্রহ্ম কতকগুলি ভণ্ড পুরোহিত-দের কথায় তীর্থে আর প্রতিমাদিতে চাক্ষুষ হয়েন নাই। উপনিষদের আর শঙ্কর-ভাষ্যের সেই অত্যুন্নত ব্রহ্মের কাষ্টে-লোষ্ট্রে অপঘাত মৃত্যুই যাহারা কল্পনা করেন তাহারা মাত্র কাল্পনিক। উপনিষদ আর পৌরাণিক যুগের মধ্যে, পরব্রহ্ম আর ভগবানের মধ্যে, একটা ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের অবসর আছে। বিবর্তনের একটা প্রবাহমান ধারা আছে। পৌরাণিক যুগের ঈশ্বরতত্ত্ব উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে কোন কোন দিকে একটা বিকাশ। পৌরাণিক যুগ কেবলি অধঃপতনের যুগ নহে। আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, এই পৌরাণিক যুগ তাহার পূর্ববর্তী যুগের সহিত কার্যকারণ সম্পর্কে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ। সকল যুগই তাই। ঐতিহাসিক পারম্পর্যের ইহাই সূত্র। সংস্কারযুগের বহুনিন্দিত, বহু ধিক্কৃত পৌরাণিকযুগ সংস্কারযুগ অপেক্ষা বড় যুগ। উন্নতির ধারায় আর একটা সোপান। ইতিহাসের আর একটা অধ্যায়। বৌদ্ধ-প্লাবনের পর নব্যহিন্দুর পুনরুত্থানকল্পে হিন্দুর ধর্মচিন্তার ইতিহাসে আর এক অভিনব বিকাশ।

কি এই বিকাশ! বিশেষভাবে এই যুগের বিকাশের ধারা কত যে বিচিত্র পথে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে আমি আলোচ্য বিষয় হইতে নিশ্চিতই দূরে গিয়া পড়িব। তবে সাধারণভাবে আমি বলিতে পারি যে পৌরাণিক যুগের এক অতি সুস্পষ্ট বিকাশ—ভক্তিবাদ। সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া এই ভক্তিবাদের সহিত লীলাবাদ জড়িত রহিয়াছে। ইহাতে বাহ্যতঃ মায়াবাদের প্রতিবাদ আছে। আবার পৌরাণিক যুগের আর এক অংশ তন্ত্রে, মায়াবাদের ও নির্গুণ ব্রহ্মের যথেষ্ট অবসর আছে।

বেদের আদি যুগে, বেদের অন্তযুগে, বৌদ্ধযুগে, প্রত্যেক যুগেই একটি বিশেষ বিশেষ ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আর এই পৌরাণিক যুগেও ঠিক সেই একই সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী আর একটি ভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহা রাজা রামমোহন বা তৎসংসগী বা তদনুগামীদের বহুধিক্কৃত, "কেবল পরিমিত এবং মুখ-নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্য" চেষ্টাও নহে আর "অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে" যে চেষ্টা তাহাও নহে। এবং তাহা "বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও এককালে ধর্মের লোপ" ও নহে। ইহা তাহাই যাহা রাজা রামমোহন পৌরাণিকযুগে ধর্মের একটা বিকাশ অস্বীকার করিয়া এবং মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইয়া এবং এক অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার পর-

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অবশ্য রাজা রামমোহনের এরূপ করিবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তথাপি পৌরাণিক যুগে ধর্মের বিকাশকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারা রামমোহনের অতুলনীয় প্রতিভার একটা অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটী। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

পৌরাণিকযুগে ভক্তিধর্মের ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদিতে বৈদেশিক যাগযজ্ঞের এক পুনরুত্থান—যাহা সত্যই এক নূতন গৌরবময় অধ্যায়কে যোজনা করিয়া দিয়াছে। ঋগ্বেদের বহিঃ প্রকৃতিতে ব্রহ্মের বিকাশ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের অপরোক্ষানুভূতি, বৌদ্ধদিগের ক্ষণ-ভঙ্গুরবাদ ও শূণ্যবাদ, শিবতুল্য শঙ্করের, আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তন, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত—এ সমস্তই মনুষ্য জাতির গৌরব; শুধু হিন্দুর কি কথা? কিন্তু বিশ্বের চরম তত্ত্ব নির্ণয়ে, বিচিত্র বুদ্ধি বোধিসম্পন্ন আচার্যেরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য অথবা শঙ্করের অদ্বৈত সিদ্ধান্তকেই শেষ সিদ্ধান্ত বা একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভব নহে। কেননা বিকাশের ধারা এক নহে। ইহা বিচিত্র এবং বহু। আর বিকাশ অর্থই সৃষ্টি।

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য কেবল যে শেষ কথা নয়, তাহাই নহে। ইহা আদি কথাও নয়, তাহাও প্রণিধান যোগ্য। ঋগাদি বেদের যে ব্রহ্ম তিনি যেমন বৃহদারণ্যকের পরমাত্মা নহেন, তেমনি বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যের পরমাত্মাও শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবান নহেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, ইহারা যদি ধর্মচিন্তার ধারায় একের পর আর এক একটি অভিনব ও পূর্ণতর বিকাশ, তবে নিশ্চিতই ঋগ্বেদ, বৃহদারণ্যক ও শ্রীমদ্ভাগবত ইহারাও একের পর আর এক একটি বিকাশ।

রাজা রামমোহন পৌরাণিক যুগের সিদ্ধান্তে এই ভগবানের বিকাশ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এবং তৎশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতকে অসচ্ছাস্ত্র বলিয়া কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন। উপনিষদ হইতে পুরাণ তন্ত্রগুলি কোন কোন দিকে ধর্মের ইতিহাসে একটা উন্নতির ও বিকাশের স্তর, তাহা বুঝিতে না পারা এবং সম্যক বুঝিতে না পারিয়া তাহা আবার যুগপ্রবর্তকরূপে বুঝাইতে যাওয়া রাজা রামমোহনের পক্ষেই কি অপরিহার্য কারণে প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের পরে পৌরাণিক যুগে ধর্মের সাধনাঙ্গে এত সমস্ত আবর্জনা আসিয়া কালক্রমে জমিয়াছিল যে তাহা সমূলে দূর করিবার জন্যই পুরাণ-ধর্মের বিকাশকে পর্যন্ত ধরিতে পারেন নাই। তবে এই বিকাশ বা উন্নতি বুঝিতে পারিয়াও তিনি অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন ইহা আমার মনে হয় না। তৎপরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য নহে। কেননা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাঁহারা রামমোহনের ধারা শাস্ত্রের আলোচনায় অব্যাহত রাখেন নাই।

তবে একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহনের পরে পুরাণ

ও তন্ত্র সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন বিজ্ঞানানুরাগী জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্ত রামমোহনী সিদ্ধান্তের অনেকটা অনুরূপ। উপনিষদ এবং দর্শনাদিতেই হিন্দুর জ্ঞানজ্যোতির সম্যক্ বিকাশ হইয়াছিল। পরে কালক্রমে পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে ঐ প্রখর জ্ঞানজ্যোতিঃ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল ইহাই অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্ত। পুরাণ ও তন্ত্রের সাধনাঙ্গ ক্রিয়াদিতে নানারূপ বীভৎস অশ্লীলতার কথা অক্ষয়কুমার অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এবং তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন।

তবে রামমোহন যেরূপ তথাকথিত বৈষ্ণবীয় অশ্লীলতার প্রতিবাদ করিয়া তৎসঙ্গে তান্ত্রিক অশ্লীলতা যথা শৈব বিবাহ, সংস্কৃত মদ্যপান প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন অক্ষয়কুমার তাহা করেন নাই। তিনি যাহা অশ্লীল মনে করিয়াছেন, তাহা শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্বিশেষে মনে করিয়াছেন। রামমোহনের কথঞ্চিৎ বৈষ্ণব বিদ্বেষ ও তান্ত্রিক পক্ষপাতীত্ব অক্ষয়কুমারে ছিল না। পুরাণ ও তন্ত্রের যুগের বিচার, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে রামমোহন হইতে অক্ষয়কুমারের ইহাই বৈশিষ্ট্য। রামমোহনকে যদি দার্শনিক বলা যায়, তবে রামমোহন-পন্থী অক্ষয়কুমারকে বলিতে হয় বৈজ্ঞানিক। রামমোহনের ধর্মের ভিত্তি দর্শন আর অক্ষয়কুমারের ধর্মের ভিত্তি বিজ্ঞান।

রাজা রামমোহন জ্ঞানপন্থী হউন, শঙ্কর শিষ্য হউন, বা শঙ্কর সংশোধনকারী নূতন দার্শনিক হউন, মায়াবাদী হউন, বা যাহাই হউন, তিনি গৌড়ীয় ভক্তি-ধর্ম সম্যক্ বুঝাইতে পারেন নাই। হিন্দুর ধর্মচিন্তার ইতিহাসে বিকাশের পর বিকাশ, ক্রম-বিকাশের ইঙ্গিত তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে আমরা পাই। কিন্তু সেই ক্রম-বিকাশের ধারায় ভক্তিধর্ম স্থান পায় নাই। এক উপনিষদের যুগে আর শঙ্কর-ভাষ্যে হিন্দুর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—কেননা হিন্দু-সাধারণের মধ্যে ধর্ম জগতেও বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সমগ্র ধর্মোন্নতি শেষ হইয়া বন্ধ হইয়া আছে—ইহা রামমোহনের হইলেও এ-যুগের কথা নয়।

রামমোহন সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, তাঁহারা সম্প্রতি পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে রামমোহনের সিদ্ধান্তকে এমন উৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন যে, এস্থলে আমি স্পষ্টভাবে রামমোহনের পৌরাণিক-যুগের সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ করিবার একটা দায়ীত্ব অনুভব করিতেছি।

রাজা রামমোহনের পরে সংস্কারযুগের পরবর্তী মহাত্মাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার রামমোহনের তুল্য ছিল না। তাঁহারা রামমোহনের মত শাস্ত্রালোচনার অধিকারী ছিলেন না। কাজেই এবিষয়ে তাঁহাদের গবেষণাও অল্প এবং তাহার মূল্যও তদনুরূপ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাখিয়া শাস্ত্রাদির আলোচনা ও অনুবাদ করাইতেন, আবার কেহ কেহ বা সংস্কৃত ভাষাই উত্তমরূপে জানিতেন না। কিন্তু সকলেই কিছু শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন এবং শাস্ত্রের নূতন ভাষ্য লিখিবেন এমন কথা নয়। সংস্কারযুগের প্রায় অবসানকালে ব্রাহ্মধর্মেও পৌরাণিক

ভক্তিবাদের প্রতি একটা আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে এই পৌরাণিক ভক্তিবাদের একটা পুনর্বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু হিন্দুর পুরাণ অপেক্ষা, খৃষ্টীয় পুরাণ বাইবেল হইতেই কেশবচন্দ্রের এই ভক্তিবাদের প্রেরণা আসিয়াছিল। তথাপি তাঁহার জীবনের শেষ অংশে কেশবচন্দ্র হিন্দুর পুরাণকেও অবলম্বন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক দেব-দেবীর ব্যাখ্যায় যত্ন করিয়াছিলেন, ভক্তিধর্ম জীবনে বিকশিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের শুধু 'বেদান্তে ফিরিয়া আসা' ইহারই উল্লেখ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কেশবচন্দ্রের 'পুরাণে ফিরিয়া আসা' বিস্মৃত হ'ন। অথবা বিস্মৃত না হইলেও তাহার উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, কেশবচন্দ্রের পুরাণে ফিরিয়া আসার মধ্যে একটা অধোগতির চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা যাহা মনে করেন, আমরা তাহা মনে করি না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পরে কেশবচন্দ্রের অনেকাংশে অধঃপতন হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত বেকন-কথিত গণ্ডীর দোষমূলক। পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাতের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যে ধর্মজীবনের পরিবর্তন তাহা তাঁহার কলঙ্ক নহে, গৌরব। তাহা তাঁহার অদ্ভুত অথচ বিচিত্র পরিবর্তনশীল ধর্ম-জীবনের এক অভিনব বিকাশ।

রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথে পৌরাণিক শাস্ত্র ও ভক্তিবাদ অস্বীকৃত ও ধিক্কৃত হইলেও ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগের শেষাশেষি ব্রাহ্মধর্মে পৌরাণিক দেব-দেবীবাদ, অবতারবাদ, ভক্তিবাদ ও লীলাবাদ এমন কি আদেশবাদ পর্যন্ত প্রথমতঃ খৃষ্টীয় পুরাণ বাইবেল, দ্বিতীয়তঃ হিন্দুর পুরাণাদি, তৃতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশবাদি ব্রাহ্ম-প্রচারকগণের সাক্ষাৎ ও মিলনের ভিতর দিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ইহাই ইতিহাস।

রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া কেশবচন্দ্রে যে অভিনব পরিবর্তন ঘটিল, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র সাহসের সহিত পরিবর্তন ও তাহার কারণ প্রচার করিতে পারিলেন না। এ জন্য কেশবচন্দ্রের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের যে উক্তিটি তাহা অবশ্য আপনারা সকলেই জানেন। সুতরাং আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। কিন্তু কেশবচন্দ্র যাহা পারিলেন না, কেশবের আর এক সহধর্মী সহকর্মী এক অতি ভীষণ, দুর্দম, দুঃসাহসী, সত্যের একনিষ্ঠ আজীবন সাধক গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ পারিয়াছিলেন। সংস্কারযুগের অন্তে সাধু এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণে যে পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রচারে কুণ্ঠিত হন নাই। বাধা পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষান্ত হন নাই। ব্রাহ্মণ-সমাজের ভক্তিভাজন সদস্যগণ অবশেষে সভা করিয়া, কমিটি করিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম বিরোধী, পৌরাণিক ভক্তিধর্ম আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। সভার ধর্ম, কমিটির ধর্মকে তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, দৃকপাত করিলেন না, ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ব্যক্তিগত সাধনার ধর্মে, পৌরাণিক যুগের সেই নিন্দিত গৌড়ীয় ভক্তি-ধর্মের—সেই ছায়াঘন বৈকুণ্ঠের পথে তিনি এক-

দিন, ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণের, সভা কমিটি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, জটাজুটশোভিত, চন্দনতিলকভূষিত, রুদ্রাক্ষমাল্যজড়িত বৈষ্ণব হইয়াও প্রচণ্ড রুদ্রের অবতার সেই সিংহ-গ্রীব সিংহবীর্য তাঁহার সিংহপ্রতিম মূর্তিখানি লইয়া ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। কোথায়? রাজা রামমোহনের বহু ধিক্কৃত তীর্থে তীর্থে, রাজা রামমোহনের বহু নিন্দিত কাষ্ঠে লোষ্ট্রে প্রতিমাদিতে। কি এক প্রাণধর্ম তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল, কি তিনি বুঝিলেন, কি তিনি পাইলেন, আমি তাহা আপনাদিগকে বলিতে পারিব না। সেকথা বলার অধিকার আমার কোথায়? সাধু বিজয়কৃষ্ণের শেষ জীবনে যে ধর্মের পরিবর্তন, তাহাতে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের এযুগের উপযোগী এক উজ্জ্বল বিকাশ লক্ষ্য করি।

রামমোহন আরব্ধ সংস্কারযুগ, বিশেষতঃ রামমোহন স্বয়ং পৌরাণিক যুগের ভক্তিধর্মকে যেভাবে একদিন বাঙ্গালীর সম্মুখে প্রচার করিয়াছিলেন, বড় সৌভাগ্যের কথা যে তাহার প্রতিবাদের ভার সংস্কারযুগের অন্তে সমন্বয়যুগের প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিশেষভাবে বিজয়কৃষ্ণের উপর অর্পিত হইয়াছিল। পরমহংস রাম-কৃষ্ণে ও সাধু বিজয়কৃষ্ণে পৌরাণিক ধর্মের এক পুনরুত্থান স্পষ্টই লক্ষিত হয়। অথচ এই পুনরুত্থানে অতীত পৌরাণিক যুগের আবর্জনা নাই বলিলেই হয়। ইহা ব্যাপকতায় যেমন উদার, অনুভূতিতেও তেমনি গভীর এবং বহু অংশে নবযুগের উপযোগী। ইহা কেবল মধ্যযুগের নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের মত বৈষ্ণব-সাধনার পথ দিয়া অগ্রসর হ'ন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহনের মতই শঙ্করানুগামী, অদ্বৈত ও মায়াবাদী, বেদান্তের প্রচারক। ইহা ছাড়া তিনি আজীবন সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি রামমোহনের মত পুরাণ সম্বন্ধে একদেশদর্শী বা কেবল দোষদর্শী ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ পুরাণের ভক্তিবাদ বিশেষভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ভক্তির বীজকে সংহিতা ও উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু সংহিতা ও উপনিষদের মধ্যে যাহা বীজাকারে ছিল, যুগ প্রয়োজনে পুরাণে তাহা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। স্বামিজী বলেন, "এই পুরাণেই ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। * * সুতরাং ভক্তিকে বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণ-গুলি বুঝা আবশ্যক।"

এমন দুঃসাহসী আমাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি বলিবেন যে কর্ম আর জ্ঞানেই পর্যাপ্ত হইবে, ভক্তিতে আমাদের প্রয়োজন নাই? বাঙ্গলাদেশে মহাপ্রভুর জাতির মধ্যে এমন কথা কি সম্ভব?

রাজা রামমোহনের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা

আমি সাধারণভাবে আপনাদিগকে দেখাইয়াছি যে রাজা রামমোহন উপনিষদ ও

শঙ্কর-ভাষ্যের উপর জোর দিতে গিয়া আমাদের পৌরাণিক ভক্তিধর্মের উপর সুবিচার করিতে পারেন নাই। পুরাণগুলির কেবল দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদের সহিত পুরাণের ভক্তিধর্মের ধর্মগত সাদৃশ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে চেষ্টাও করেন নাই। বেদ ও উপনিষদের ধর্মই যে পুরাণে গতিমুখে যুগোপযোগী বিকাশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, পুরাণে হিন্দুধর্মের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনি বুঝাইতে পারেন নাই এবং সংস্কারযুগের প্রারম্ভে রামমোহন পুরাণ সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের বিবর্তন পথে, বিকাশের ধারায়, সমীচীন ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে না পারায়, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণ কিঞ্চিৎ বিপথে পরিচালিত হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পরমহংস রামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবাবতার বিজয়কৃষ্ণে পৌরাণিক যুগের একটা পুনরুত্থান সংস্কারযুগের সুস্পষ্ট প্রতিবাদস্বরূপ দেখা দিয়াছে।

সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার শেষ জীবনের ভক্তিধর্মের বিকাশ—রাজা রামমোহনের গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত, তাহার একটা প্রতিবাদ। নিজ নিজ শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া স্বামী বিবেকানন্দও বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে রাজা রামমোহনকে প্রতিবাদ করিয়াছেন। পর পর আমি তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

রাজা রামমোহন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শনকালে আমরা তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইব। রামমোহন পুরাণের প্রতি কোন কোন দিকে সুবিচার করিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা যেন রামমোহনের প্রতি অবিচার না করি। রামমোহনের প্রতিভার ত্রুটি প্রদর্শন করা অতীব দুঃসাহসের কার্য এবং দুঃসাহসের কার্যে অগ্রসর হইতে হইলে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রামমোহন প্রথম বয়সে হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করেন নাই। আরব্য ও পারস্য ভাষার সাহায্যে মুসলমানী শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-পৌত্তলিকতার উপর বিদ্বেষ, হিন্দু-শাস্ত্র আলোচনা করিবার পূর্বেই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই বদ্ধমূল ধারণা লইয়াই তিনি হিন্দুশাস্ত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায়, "গোস্বামীর সহিত বিচারে" প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই, তিনি পুরাণের বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে যাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন তাহা এইরূপ, "অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোকসকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত এবং মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গোরাঙ্গ পরায়ণে"রা চেষ্টা করেন।

রাজার সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা কাষ্ঠলোষ্ট্রকেই তাঁহাদের উপাস্য ভগবান

বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের কোন ধারণা নাই। অতএব এই বৈষ্ণবধর্ম—কাষ্ঠ-লোষ্ট্রে ভগবান সিদ্ধান্তের ধর্ম! বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীরা বিচার করুন যে তাঁহাদের উপাস্য ভগবান কাষ্ঠলোষ্ট্র কিনা? এবং অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণা আছে কিনা?

রাজার সিদ্ধান্তে আমাদের পূর্বতম সমস্ত বৈষ্ণবাচার্যগণ, বৈষ্ণবসাধক ও দার্শনিকগণ সকলেই কাষ্ঠেলোষ্ট্রে ভগবান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম তাহা বৈষ্ণবদিগের জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভূত ছিল। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ইঁহারা সকলেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা চালিত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। স্বয়ং মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু ইঁহারাও তদ্রূপ এবং এত যে—যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা নশ্বর, যাহা নিতান্ত পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ববিশিষ্ট, তাহাকেই হয় ইঁহারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী বলিয়া বুঝিয়াছেন, না হয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম তাঁহার সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না।

রাজা রামমোহন বিচার করিয়াছেন যে এই সমস্ত ধূর্ত বৈষ্ণবেরা উপনিষদ আর শঙ্কর-ভাষ্যের নিরাকার পরব্রহ্ম হইতে লোকসকলকে বিমুখ করিবার জন্যই নশ্বর বিগ্রহবাদী ধর্মের প্রচার করিয়াছেন এবং এই সমস্ত ধূর্ত বৈষ্ণবদের যে শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত তাহাকেও শুদ্ধ প্রতারণা করিয়া বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া লোক-সকলের মধ্যে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সুতরাং রাজা, শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্তের ভাষ্য নয় তাহাই অগ্রে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহুতর প্রমাণ প্রয়োগ ও অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ কিন্তু বেদান্তের ভাষ্য নহে। আর যাহা বেদান্তের ভাষ্য নহে, তাহা হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতে পারে না। আর যাহা হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র নহে, তৎপ্রতিপাদ্য ধর্মও সুতরাং হিন্দুদিগের ধর্ম হইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসরণ করিলে ফলে এই দাঁড়ায় যে বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মই নহে। শুনা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথও এইরূপ মত পোষণ করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্ত-ভাষ্য নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ন্যূনাধিক দশটি প্রমাণ রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রমাণগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শাস্ত্রীয় প্রমাণ, দ্বিতীয় যুক্তির প্রমাণ। রামমোহন গরুড় পুরাণের প্রমাণগুলিকে নূতন রচিত ও স্ববিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর বচনকেও 'অস্পৃষ্ট' মাত্র বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণগুলির বচনও অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেননা শাক্তধর্মাবলম্বীরা তাহা স্বীকার করেন না। আর "যুক্তির দ্বারাতেও সুব্যক্ত হইতেছে" যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে ননী চুরী

করিয়াছিলেন, বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন এবং রাসলীলা করিয়াছিলেন, "এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ" নিশ্চিতই বেদান্তের ভাষ্য হইতে পারে না। কাজেই "বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই।"

রাজা রামমোহন পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য মর্যাদা সর্বত্রই উপেক্ষা করেন নাই। যে যে স্থলে পুরাণ তাঁহার মতকে সমর্থন করিয়াছেন সেই সেই স্থলে পুরাণকেও তিনি প্রামাণ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এস্থলে ভক্তিবাদী পুরাণসকলকে তান্ত্রিকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া তিনিও অগ্রাহ্য করিলেন। ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক্ষেত্রে রামমোহন তান্ত্রিক দলভুক্ত। আর শ্রীধরস্বামীর বচনকে কেবল অস্পষ্ট বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া শাস্ত্রীয় বিচার হয় না। এবং ননী চুরির গল্প উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য নহে প্রমাণ করা নিশ্চিতই সদ্‌যুক্তিসঙ্গত হয় না। রামমোহনের কথাই বলি, শাস্ত্র মানিতে হইলে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া সর্বত্রই মানিতে হয়। কেবল নিজের মতের পরিপোষকতার জন্য যে শাস্ত্র মানা তাহা প্রচ্ছন্নভাবে শাস্ত্রকে না মানাই প্রতিপন্ন করে। অথচ রামমোহন শাস্ত্র ছাড়া একপদও কোন দিকে অগ্রসর হন নাই। তাঁহার প্রখর ব্যক্তিগত জ্ঞান বা যুক্তি সর্বত্রই শাস্ত্রের মুখোসে আবৃত হইয়া সংস্কারকার্যে প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইয়াছে।

তারপর ভাষ্য অর্থে আমরা কি বুঝি? আমাদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারেরা কি বলিতেন? ভাষ্য অর্থে নিশ্চয়ই কেহ স্কুলের বালকদের পুঁথির অর্থপুস্তক বিবেচনা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য কি, না—ইহার সমাধান করিতে হইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের সহিত ভাগবতের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়টির অপক্ষপাত আলোচনা করিতে হইবে। নিশ্চিতই কেবল ননী চুরীর গল্প উদ্ধৃত করা যথেষ্ট নহে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে বালকের জন্য ননী চুরী আর স্ত্রীলোকের জন্য বস্ত্রহরণ উত্তম দৃষ্টান্ত নহে। উত্তম ধর্মকথাও না হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল বালক আর স্ত্রীলোকই ছিলেন, দার্শনিক, বৈদান্তিক কেহ কিছু ছিলেন না, বা ছিল না এমন মনে করা সঙ্গত নয়।

বেদান্তে এই অখিল বিশ্বের চরমতত্ত্বাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা দৃষ্ট হয়। রামমোহন বেদান্ত বলিতে শঙ্কর অদ্বৈত ও মায়াবাদই বুঝিতেন। বলা আবশ্যক শঙ্কর-ভাষ্যই একমাত্র বেদান্ত সিদ্ধান্ত নহে। বৈষ্ণবের যে লীলাবাদ তাহাও বেদান্তমত ও বেদান্ত-ভাষ্য। এই লীলাবাদ ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে যে অভিনবভাবে বিরাজমান, তাহা নিশ্চিতই বেদান্তানুগামী ও বেদান্ত-ভাষ্য। শঙ্কর-ভাষ্যের সহিত যাহা কিছু মিলিবে না তাহাই বেদান্ত-ভাষ্য হইতে পারিবে না, রামমোহন যদি এই সিদ্ধান্তের অনুপাতে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্ত-ভাষ্য না বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ব্যাখ্যা সর্ববাদীসম্মত হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ভগবান কাষ্ঠলোষ্ট্র নহে। যে ননী চুরীর কথা

উল্লেখ করিয়া রামমোহন বিদ্রূপ করিয়াছেন সেই ননী চুরীর প্রসঙ্গেই যখন মা যশোদা কৃষ্ণকে আত্মজ জ্ঞানে উদূখলে বন্ধন করিতে যাইতেছেন তখন কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিটি এইরূপ—

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।

পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ১০।৯।১২-১৩

যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্বাপর অন্তর বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ।

ইহাই কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুখ নাসিকাদি বিশিষ্ট পরিমিত দেবতার ধ্যান?

রাজা রামমোহন নিজেই বহু স্থানে বলিয়াছেন যে পুরাণাদির প্রতিপাদ্যও সেই এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবতকে পরিমিত দেবতার উপাসনার গ্রন্থ বলিয়া, 'ইহা বেদান্ত-ভাষ্য নয়' প্রমাণ করিতে বসিয়া, তিনি নিজে যাহা জানিতেন তাহাও বলেন নাই। অথবা তাঁহার উক্তি স্ববিরোধী দোষদুষ্ট।

রামমোহন বৈষ্ণবের প্রাকৃত অপ্রাকৃতের অচিন্ত্যভেদাভেদের কথাও জানিতেন। তবে চৈতন্যচরিতামৃতের "প্রাকৃত অপ্রাকৃতের জন্ম একই ক্ষণে" এ সিদ্ধান্ত জানিতেন কিনা, বলা শক্ত। কৃষ্ণের দেহ যে "মায়িক নহে, আনন্দের হয়, আর সেই আকার কেবল ভক্তজনের চক্ষুগোচর হয়" ইহার উত্তরে রাজা বলেন যে, আনন্দের বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক, "অদ্যাপি কেহ আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।" ইহা জড়বাদী বা প্রত্যক্ষবাদীর কথা। ভক্ত, দার্শনিক বা কবির দৃষ্টি এক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না।

রাজা রামমোহন আনন্দাদি রচিত কণিকা দেখিতে পাইলেন না। হয়ত ইহা সত্য। কিন্তু তাহা ব্রহ্মাণ্ডে কেহ দেখিতে পাইবেন না, এ বড় আশ্চর্যের কথা। গোস্বামী ত রাজাকে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সে আকার কেবল ভক্তজনের চক্ষুগোচর হয়। রামমোহনের চক্ষের যদি তাহা গোচরীভূত না হইয়া থাকে, তবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে তাঁহার সে চক্ষু ছিল না। তিনি বৈষ্ণবসাধনার পথে ভক্ত ছিলেন না। কি করিয়া তিনি দেখিতে পাইবেন? সকলেই সমস্ত দেখিতে পায় না। তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া লাভ কি?

স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিধর্মের প্রতি কি সিদ্ধান্ত ছিল, তাহা মাত্র একটি স্থান উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বামী বিবেকানন্দের রামমোহন হইতে বিশেষত্ব এই যে তিনি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইয়াও ভক্তিধর্মের উপর বিশেষতঃ বৈষ্ণবের কান্তভাবের উপর রামমোহন হইতে অধিকতর উদার মত পোষণ করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নবীন সন্ন্যাসী মাধুর্যের রসে ভরপুর ছিলেন। অথচ একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যবহারিক জগতে বৈষ্ণবের যে মেয়েলী ভাব তিনি তাহার পোষকতা করিতেন না। বরং স্থানে স্থানে বৈষ্ণবদিগের এই দুর্বল মেয়েলী

ভাবগুলিকে তীব্র শ্লেষাত্মক বাণীতে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রভুর সেই চিরস্মরণীয় কবিতাটি উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" চৈঃ চঃ ৩।২০।৬

"হে জগদীশ, আমি ধন জন কবিতা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা করি না। হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।"

"ধর্মের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়—এই অহৈতুকী ভক্তি, এই নিষ্কাম কর্ম। আর মানুষের ইতিহাসে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার কৃষ্ণের মুখ হইতে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। ভয়ের ধর্ম, কামনার ধর্ম, চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল—আর মনুষ্য হৃদয়ের সাধারণ নরকভীতি ও স্বর্গসুখভোগেচ্ছা সত্ত্বেও এই অহৈতুকী ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মরূপ শ্রেষ্ঠতম আদর্শের অভ্যুদয় হইল।"

ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রামমোহন কিছুতেই অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, আর স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে ভারতক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং কেন স্বীকার করিতেছেন তাহার প্রকৃষ্ট কারণও স্বামিজী দিয়াছেন।

ভক্তিধর্মে গোপীপ্রেম

শ্রীমদ্ভাগবত বা তৎসংসর্গী প্রায় সকল বৈষ্ণব-সাহিত্যই, সকল বৈষ্ণব পদাবলীই যে অশ্লীল এই একটা ধারণা একদল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল। সংস্কারযুগের প্রারম্ভে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম শ্রীমদ্ভাগবতকে 'সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণের' প্রশ্রয়দাতা অসৎ-শাস্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। এবং সেই হইতেই এই ধারণা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছে। ভ্রান্ত ধারণা অপরিহার্য কারণে সময় সময় মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হইলে অত্যন্ত বিপদের কথা।

রামমোহন গোস্বামীর সহিত বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার পর্যায়ক্রমে ২২শ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক ও ৩৩শ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক উদ্ধার করিয়া গোপীদের সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ আচরণকে সর্বলোকবিরুদ্ধ বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন এবং সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি ভগবান বা অবতার বলিতে অনিচ্ছুক আর শ্রীমদ্ভাগবতকেও বেদান্ত-ভাষ্য বলিয়া যুক্তির দ্বারা অস্বীকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রামমোহনের যুক্তি এই যে, যাহাদের ইষ্ট দেবতারা এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্যে লিপ্ত, তাহাদের শিষ্যেরা ইষ্টদেবতার ঐরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্যগুলি নিয়ত

ধ্যান করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে এবং এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকে "চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়।"

রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চিতই সর্বাংশে মিথ্যা নহে। লৌকিক ধর্মের আবরণে যে দুর্নীতি এক সময়ে প্রশ্রয় পায় নাই এমন কথা কেহই বলিবে না। রামমোহনের সংস্কার যে পরিমাণে এই দুর্নীতি নিরসনকল্পে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করিবে বা করিয়াছে।

সংসারে ভাল মন্দ সকলপ্রকার লোকই আছে। জাতির ধারায় তরঙ্গের মত উত্থান পতনও লক্ষ্য করা যায়। জাতির অবসাদের সময়, মন্দবুদ্ধি লোকেরা যদি শাস্ত্রার্থের ব্যতিক্রম করিয়া ধর্মের আবরণে গর্হিত কার্যে লিপ্ত হয়, তবে কেবলই শাস্ত্র বা ধর্মের দোষ নহে। রামমোহন শাস্ত্রের দোষ উদ্ঘাটন করিয়া, তাহার সহিত ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রের উত্থান ও পতনের যে সম্পর্ক তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অনেক পরিমাণে সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংগলা দেশে তান্ত্রিক বামাচার ও বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি এক সময়ে প্রশ্রয় পাইয়াছিল কেবল তাহা দ্বারাই কি গৌড়ীয় শাক্ত ও বৈষ্ণবকে বিচার করিতে হইবে, না, তন্ত্র ও পুরাণের উপরে ঐ সমস্ত দুর্নীতির মূল কারণ আরোপ করিতে হইবে? লোকচরিত্র মন্দ হইয়া পড়িলে শাস্ত্রও দূষিত হইয়া পড়ে। ইহা সত্য। কেবল শাস্ত্রের আবর্জনার জন্যই লোকচরিত্র মন্দ হয়, ইহা বলা কঠিন। রামমোহন সংস্কারযুগের প্রারম্ভে যদিও তাহাই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সংস্কারযুগের অন্তে স্বামী বিবেকানন্দ তাহা করেন নাই। এক্ষেত্রেও রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্যের ও উদারতার পরিচয় আমরা পাই।

রামমোহন ভক্তি-ধর্মের গোপীপ্রেমের মধ্যে খৃষ্টান পাদ্রীর মত কেবল এক ইউরোপীয় মধ্যযুগের অশ্লীলতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। এক শ্রেণীর অশ্লীল দার্শনিকদিগের নিকট গোপীপ্রেম চিরকালই অশ্লীল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সকলেই গোপীপ্রেমের মধ্যে অশ্লীলতা দেখেন নাই এবং দেখেন না। অশ্লীলতা, গোপীপ্রেমের শেষ বা চরম কথা নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হইয়াও গোপীপ্রেমের মধ্যে কি ভাব দেখিলেন তাহা স্বামিজীর উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতেছি।
গোপীপ্রেম প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিতেছেন--

> "এই প্রেমের মহিমা আর কি বলিব? এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি যে গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যে এমন নির্বোধের অসদ্ভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের অদ্ভুত তাৎপর্য বুঝিতে অক্ষম। আমি আবার বলিতেছি, আমাদের সহিতই শোণিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ অশুদ্ধাত্মা নির্বোধ অনেক আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে যেন উহাকে

অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাই, আপনার মনকে আগে বিশুদ্ধ কর, আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, সেই আজন্ম শুদ্ধ ব্যাসতনয় শুক। গোপীদের প্রেম-জনিত বিরহের উন্মত্ততা লোকে কি করিয়া বুঝিবে?

"একবার, একবার মাত্র যদি সেই অধরের মধুর চুম্বন লাভ করা যায়, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, চিরকাল ধরিয়া তোমার জন্য তাহার পিপাসা বাড়িতে থাকে, তাহার সুখ দুঃখ চলিয়া যায়, তখন আমাদের অন্যান্য সকল বিষয়ে আসক্তি চলিয়া যায়, কেবল তুমিই তখন একমাত্র প্রীতির বস্তু হও।"

"প্রথমে এই কাঞ্চন, নামযশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি। তখনই, কেবল তোমরা গোপীপ্রেম কি তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিষ যে, সর্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, ততদিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাহাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চন যশোলিপ্সার বুদ্বুদ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়। কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা। এমন কি, দর্শন-শাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তি সাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান। এখানে গুরু শিষ্য, শাস্ত্র উপদেশ, ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার। ভয়ের ধর্মের চিহ্ন মাত্র নাই, সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্ব প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়। তাঁহার আশা তখন কৃষ্ণ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা! * * এই নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া নহে, ইহা প্রমাণ কর দেখি। * * * আমরা গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ হইতে আর কোনও উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখন তোমাদের মস্তিষ্কে এই উন্মত্ততা প্রবিষ্ট হইবে, যখন তোমরা মহাভাবা গোপীগণের ভাব বুঝিবে, তখনই তোমরা প্রেম কি বস্তু জানিতে পারিবে। * * * যখন সমস্ত জগৎ তোমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনও কামনা থাকিবে না, যখন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হইবে, আর কোনও লক্ষ্য থাকিবে না, তখনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হইবে, তখনই তোমরা গোপীদের অহৈতুকী প্রেমের শক্তি বুঝিবে। ইহাই লক্ষ্য। যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইবে।"

স্বামিজী বলিতেছেন—

"এইবার আমরা একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতা প্রচারক কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতে এখন অনেকের মধ্যে একটা চেষ্টা দেখা যায়, সেটা যেন ঘোড়াতে গাড়ী যোতার মত। আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, এটা যেন কি এক রকম! সাহেবেরাও ইহা বড় পছন্দ করেন না। অমুক পণ্ডিত এই গোপী প্রেমটাকে বড় সুবিধা মনে করেন না। তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও। সাহেবদের অনুমোদিত না হইলে কৃষ্ণ টেকেন কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারেন না। মহাভারতের দু' এক স্থল—সেগুলিও বড় উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—ছাড়া গোপীদের প্রসঙ্গই নাই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপাল বধে শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র। এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত। সাহেবেরা যাহা না চায়, সব উড়াইয়া দিতে হইবে। গোপীদের কথা এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত!"

স্বামিজী আবার বলিতেছেন—

"আমরা এখন সেই আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া, একটু নিম্নস্তরে নামিয়া গীতা প্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব।"

স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীপ্রেম অপেক্ষা গীতার দর্শন সমন্বয়বাদকে নিম্নস্থান দিতেছেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য যে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষতঃ গোপী-প্রেম এমন শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিল। ইহা রামকৃষ্ণ-দেবের সমন্বয়মূলক মহান্ জীবনের সংস্পর্শ হইতেই যে জন্মিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বামিজীর আরো একটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"তাঁহার (কৃষ্ণের) জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্র স্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা বুঝিবার চেষ্টা করাও উচিত নয়। সেই প্রেমের অতি অদ্ভুত বিকাশ—যাহা সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, প্রেমমদিরা পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে অক্ষম। কে সেই গোপীদের প্রেমজনিত বিরহ যন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সক্ষম? যে প্রেম—প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে প্রেম আর কিছু চাহে না, যে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে প্রেম ইহলোক ও পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না। আর হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ নির্গুণ ঈশ্বরবাদের একমাত্র সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে।"

স্বামিজী কত দিক হইতে এই গোপীপ্রেমের উৎকর্ষ, সংস্কারযুগের ও বিশেষ-ভাবে রাজা রামমোহনের সাধারণ জড়বাদীর ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোপীপ্রেমের মধ্যে যে আবর্জনা বা

অশ্লীলতার প্রতিবাদ রামমোহন করিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ করা সঙ্গত হইবে না। কিছু আবর্জনা বা অশ্লীলতা আছে। তাহা পরিহার করিতে হইবে। আবার স্বামী বিবেকানন্দ এই গোপীপ্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীর ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ যে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় সুস্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহাকেও কোনক্রমে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মনীষীর কথা, নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্জন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা সর্বদাই অবাধ ও মুক্ত রাখিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুরাণ ও তন্ত্রের যুগসম্বন্ধে সংস্কার ও সমন্বয় যুগ

বাঙ্গলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একের পর আর দুইটি যুগের কথা আলোচনা করিয়াছি। শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহনের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যে যুগের সূত্রপাত দেখা দেয়, তাহাকে আমি ব্রাহ্ম-সংস্কারযুগ, অথবা সাধারণ ভাবে সংস্কারযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। শাস্ত্রীয় আলোচনায় আরব্ধ এই সংস্কারযুগ, শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ধর্ম ও সমাজ সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। শতাব্দীর চতুর্থ ভাগের প্রথমেই রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয় হয়। সংস্কারযুগের অন্তে রামকৃষ্ণযুগকে আমি প্রতিক্রিয়া-মূলক সমন্বয় যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এই যুগ বিশ্লেষণ কালে আমি দেখাইয়াছি যে, ইহার মধ্যে যেমন একদিকে সংস্কারযুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতি-ক্রিয়ার ঝোঁক আছে তেমনি সংস্কারযুগের ধর্মকলহ অপেক্ষা ইহার মধ্যে এক উচ্চস্তরের সমন্বয়ের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এই যুগের অন্যতম সিদ্ধ মহাপুরুষ। স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগের চিহ্নিত প্রচারক।

সংস্কারযুগ ও সমন্বয়যুগ, গত শতাব্দীর এই দুইটি বিশেষ যুগের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে ক্রমে এমন সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে যাহা কোনক্রমেই মাত্র একটি শতাব্দীতে আবদ্ধ নহে। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন সম্বন্ধে আমার আলোচনা, আশানুরূপ সংক্ষিপ্ত হইতে পারিতেছে না। কেননা সংস্কারযুগ অর্থই রামমোহনের যুগ। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি বেদান্ত, স্বদেশ-হিতৈষণা এবং হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি এই তিন বিষয়ে রাজা রাম-মোহনকে পথপ্রদর্শকরূপে মান্য করিয়া রাজার প্রদর্শিত পথেই পর্যটন করিয়াছেন।

স্বামিজীর এই রামমোহনানুগত্যের প্রতি ইংগিত করিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম-সংবাদপত্র বলিয়াছেন যে, তবে বিবেকানন্দ-বিশ্লেষণে রামমোহনের কথা বিস্মৃত হও কেন? যিনি অগ্রগামী তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দাও না কেন?

আমার উত্তর এই যে, রাজা রামমোহনের প্রাপ্য সম্মান আমার জ্ঞান বিশ্বাসে আমি সর্বদাই তাঁহাকে দিয়া আসিতেছি। শত অক্ষমতা সত্ত্বেও, বাংগালীর একটা অতি জটিল সমস্যাপূর্ণ যুগের বিশ্লেষণ মানসে, 'লোভাৎ উদ্বাহুরিব' আমি, মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া নিশ্চয়ই কোন প্রতিধ্বনির পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি না। তথাপি দুইটি সংঘর্ষমান বিশেষ যুগের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একবার রাজা রাম-মোহনে, আবার রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দে, আপনাদিগকে লইয়া আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। আপনারা পথশ্রান্ত না হইলে সেই দুর্গম পথে আরো কয়েকবার আমি আপনাদের সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা রাখি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা শতকরা নব্বুই জন পৌরাণিক। আর বাকী শত-করা দশজন বৈদিক (বৈদান্তিক?)। তাহাও হয় কিনা সন্দেহ।"

বাংগলায় পুরাণ তন্ত্রের যুগ বলিয়া একটা যুগ ছিল। আমি ইহাকে শুধু ছিল বলিয়া নিঃশেষ করিব না। আমি বলিব ইহা এখনও আছে। ব্রাহ্মযুগ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ সমগ্র বংগদেশের কতটুকু জুড়িয়া আছে, অতি অল্প। তাহা অপেক্ষা অনেক, অনেক বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া পুরাণ ও তন্ত্র বাংগলায় আজিও সগর্বে আপন অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

আমি জানি, অনেকে বলিবেন ইহা বাংগালীর কলংক। কিন্তু আমি ইহাও জানি বাংগলার পুরাণ তন্ত্রের যুগ অদ্যাপি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের আলোচনার অপেক্ষা করিয়া আছে। সুবিখ্যাত উইলসন্ ও বিত্তর্নুফ প্রভৃতি বিদেশীয়েরা এই যুগ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দুঃসাহস হইলেও বলিতে হইতেছে যে, তাহাই পর্যাপ্ত নহে।

সংস্কারযুগের অব্যবহিত পূর্বেই পুরাণ তন্ত্রের যুগ। পুরাণ তন্ত্রের যুগের সম্যক বিচার বিশ্লেষণ যদি সংস্কারযুগে বা সমন্বয়যুগে না হইয়া থাকে, কিংবা যাহা হইয়াছে তাহা যদি প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে ঐ যুগের বিশ্লেষণ আশু কর্তব্য। অন্যথা জাতির গতিমুখে এই যুগকে অতিক্রম করিয়া নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিতে আমাদের সম্মুখে অনেক বিঘ্ন আসিবে। হয়ত সমগ্র জাতিটাই মুমূর্ষু ও মরণাহত হইয়া অন্যান্য জীবন্ত ও চলন্ত জাতি সকলের গতিপথের এক পার্শ্বে কায়ক্লেশে পড়িয়া থাকিবে। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এই পুরাণ তন্ত্রের যুগের প্রতি সংস্কারযুগের ধারণা রাজা রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা এই যুগকে নানাদিক হইতে বিশেষভাবে একটা অবনতির যুগ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্বামী

বিবেকানন্দও এই পুরাণ তন্ত্রের যুগে যে সমস্ত দুর্গতির চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, তাহার প্রতি বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তথাপি বেদ উপনিষদের যুগ হইতে পুরাণ তন্ত্রের যুগ যে সকল দিকেই একটা ঘোর অবনতি একথা রাজা রামমোহন ও অক্ষয়কুমার বলিয়া গেলেও স্বামী বিবেকানন্দ তাহার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং আমাদের বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দ ভুল করেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ পৌরাণিক যুগের উপর সংস্কার-যুগ অপেক্ষা অধিকতর সুবিচার করিতে গিয়া আরো বলিয়াছেন—

"আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন একব্যক্তিও নাই, যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যানের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।"

"পুরাণসমূহের প্রতি আমাদের এই কারণেও কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত যে, শেষ যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে যে ধর্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, উহারা আমাদিগকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর ও উন্নততর সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে।" * * "যতদিন না ব্যক্তিগত ও জড়প্রীতি বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন কেহ পুরাণের উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবেন না।" * * "পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক।" * * "আমরা কেবল স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিতে পারি। আর পুরাণ-কারগণের এইটুকু সহজ কাণ্ডজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহারা লোককে এই স্বল্পতম বাধার পথে কাজ করিবার প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। এইভাবে উপদেশ দেওয়াতে পুরাণগুলি লোকের কল্যাণ সাধনে যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব।"

সংস্কারযুগ হইতে পুরাণ তন্ত্রের যুগ সম্বন্ধে, সমন্বয়যুগ অধিকতর অপক্ষ-পাত বিচার করিতে পারিয়াছেন। আমি চতুর্থ পরিচ্ছেদে একথা বিস্তৃতভাবেই বলিয়াছি সুতরাং এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

রাজা রামমোহন, হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তিতে কর্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি; অথবা অন্যদিকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সময়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরাণ তন্ত্রের যুগকে প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল, যুগধর্মের ইহা একটি প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, সুতরাং রামমোহন পুরাণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন।

অক্ষয়কুমার এই পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে সত্যই একটা বড় রকমের ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি বিভিন্ন পুরাণতন্ত্র ও উপাসক সম্প্রদায়-গুলির আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে—

"ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে অতীব প্রবল হইয়া উঠে। পশ্চাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তরোত্তর অতি শীঘ্র হ্রাস পাইয়া দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে সময়ে ঐ ধর্ম এখানে সর্বাধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহারও উত্তরকালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই ধর্মকে দুর্বল করিয়া হিন্দুধর্মকে সর্বাধিক প্রবল করাই পুরাণকর্তাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। পুরাণে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উপাখ্যান বিশেষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শাস্ত্রে বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনরুদ্দীপন করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিতপ্রবর কুমারিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি প্রবল বিপক্ষ এবং শঙ্কর ও রামানুজ এই পুনরুদ্দীপ্ত হিন্দুধর্ম প্রণালীর প্রধান প্রবর্তক। কুমারিল ভট্ট খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া যান। শঙ্করাচার্য খৃষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট নিয়মক্রমে শৈবধর্ম প্রচার করেন এবং রামানুজাচার্য উহার দ্বাদশ শতাব্দীতে রীতি বিশেষ অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত করিয়া যান। অতএব তাদৃশ অভিনব ধর্মপ্রণালীর উদ্দীপনাকারী বর্তমান পুরাণগুলি ঐ ঐ সময়ের পরে রচিত ও সংকলিত হওয়াই সর্বতোভাবে সম্ভব। ইতিপূর্বে ঐ সমস্ত পুরাণ রচনার সময় যেরূপ বিবেচিত ও নির্ধারিত হইয়াছে, তাহার সহিত এই অভিপ্রায়ের সুন্দর সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।"

অমরসিংহ পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। যথা, সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণনা, প্রধান প্রধান বংশোদ্ভব ব্যক্তিদের চরিত্র বর্ণনা। কিন্তু পরবর্তীকালের পুরাণসমূহে এই পাঁচটি লক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া দশ লক্ষণাক্রান্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এক এক পুরাণ এক এক দেবদেবীর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে।

তন্ত্র সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বলিয়াছেন যে—

"তন্ত্রের বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অপেক্ষা বড় অধিক নয়। অনেক তন্ত্র যে বাঙ্গলাদেশেই প্রবর্তিত হয় উহার মধ্যেই সে বিষয়ের বহুতর নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। কামধেনু ও বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে বর্ণ সমুদয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গলা অক্ষরের বিষয়েই অধিক সঙ্গত হয়। কেবল বর্ণনা কেন? তন্ত্র বিশেষে বর্ণোচ্চারণের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা বাঙ্গলা দেশীয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালা—দেশীয়, অর্থাৎ বাঙ্গলার পূর্বখণ্ডবাসী পণ্ডিতেরা যেরূপ উচ্চারণ করেন, উহাতে সেইরূপই ব্যবস্থিত হইয়াছে।"

আশা করা যায়, বাঙ্গলার পূর্বখণ্ডবাসীরা ইহার জন্য অবশ্যই একটা গৌরব অনুভব করিবেন।

পুরাণ এবং তন্ত্রগুলিতে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাচ্ছলে,

১) প্রত্যেক সম্প্রদায় তাঁহাদের বিশেষ দেব কিংবা দেবীকে পরব্রহ্মের আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

২) সম্প্রদায় বিশেষ তাঁহাদের স্ব স্ব পুরাণ বা তন্ত্রকে বেদের আসন দিয়াছেন।

৩) এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের দেবদেবীকে ও শাস্ত্রকে অস্বীকার করিয়া যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

৪) পুরাণ বা তন্ত্রের সাধন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সাধক ও সাধিকাগণ অনেকস্থলে স্মৃতি—গার্হস্থ্যধর্মের পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং প্রশ্রয় পাইয়াছেন।

রামমোহন ও অক্ষয়কুমার পুরাণ ও তন্ত্রের এই সমস্ত ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এই যুগকে বিশেষরূপেই ধিক্কৃত করিয়াছেন। পুরাণ ও তন্ত্রের যুগকে ধিক্কৃত করা সংস্কারযুগের একটি লক্ষণ।

স্বামী বিবেকানন্দও এই সমস্ত ত্রুটিকে ক্ষমা বা উপেক্ষা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি পুরাণতন্ত্রের যুগের আরো অনেক ত্রুটি বাছিয়া বাহির করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে স্বামিজীর কতকগুলি উক্তি আমি পূর্ব পূর্ব আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে হিন্দু সমাজের বাহিরে অনেক অর্ধসভ্য জাতির মধ্যে কুসংস্কার এবং বীভৎস উপাসনা পদ্ধতি ছিল, তাহারা দলে দলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়া বৌদ্ধধর্মের অবনতি সাধন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে, হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থান যুগে অবনত বৌদ্ধযুগের কুসংস্কারপূর্ণ সাধন পদ্ধতিগুলিকে যথাসাধ্য পুরাণ ও তন্ত্রের ধর্মে সংস্কৃত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে।

রাজা রামমোহনে পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগের কোন উল্লেখ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ পুরাণতন্ত্রের যুগকে বৌদ্ধযুগের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। স্বামিজীর ঐতিহাসিক গবেষণা এ ক্ষেত্রে অধিকতর সুদূর সম্প্রসারিত, অধিকতর মৌলিকতায় পূর্ণ।

স্বামিজী বলিয়াছেন—

"বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে যে বীভৎস ব্যাপারসমূহের আবির্ভাব হইল তাহা বর্ণনা করিবার আমার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। অতি বীভৎস অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ, অতি ভয়ানক ও অশ্লীল গ্রন্থ—যাহা মানুষের হাত দিয়া আর কখনও বাহির হয় নাই বা মানব মস্তিষ্ক কখনও কল্পনা করে নাই, অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠানপদ্ধতি যাহা আর কখনও ধর্মের নামে চলে নাই, এ সবই অবনত বৌদ্ধ-ধর্মের সৃষ্টি।"

স্বামিজী এখানে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও পরবর্তী শাক্তমতাবলম্বীদের বামাচার সাধন-প্রক্রিয়ার উপরেই কশাঘাত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"যখন আমি দেখি আমাদের সমাজে বামাচার কি ভয়ানকরূপে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা আমার অতি ঘৃণিত নরকতুল্য স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই বামাচার সম্প্রদায়সমূহ আমাদের বাঙলাদেশের সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা রাত্রে অতি বীভৎস লাম্পট্যাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাই আবার দিনে আচার সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকে, আর অতি ভয়ানক ভয়ানক গ্রন্থসকল তাহাদের কার্যের সমর্থক। তাহাদের শাস্ত্রের আদেশে তাহারা এইরূপ বীভৎস কার্যসকল করিয়া থাকে। বাঙলাদেশের লোক তোমরা সকলেই ইহা জান। বামাচার তন্ত্র সকলই বাঙ্গালীর শাস্ত্র। এই তন্ত্র সকল রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে আর শ্রুতি শিক্ষার পরিবর্তে উহাদের আলোচনায় তোমাদের পুত্রকন্যাগণের চিত্ত কলুষিত হইতেছে। হে কলিকাতাবাসী ভদ্রমহোদয়গণ, তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, এই সানুবাদ বামাচার তন্ত্ররূপে ভয়ানক জিনিষ তোমাদের পুত্রকন্যাগণের হস্তে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত কলুষিত হইতেছে এবং বাল্যকাল হইতেই ঐগুলিকে হিন্দুর শাস্ত্র বলিয়া তাহাদিগকে শিখান হইতেছে। যদি হয়, তবে তাহাদের নিকট হইতে সেগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়িতে দাও।"

রাজা রামমোহন তান্ত্রিক বামাচার সাধনের উপর এরূপ তীব্র কশাঘাত ত করেনই নাই; পক্ষান্তরে তিনি উক্তরূপ সাধন প্রক্রিয়া শাস্ত্রীয় বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচারে" তিনি মদ্যপান সমর্থন এবং শিবের আজ্ঞাবলে যে কোন বয়সের এবং যে কোন জাতির স্ত্রীলোককে চক্রের সাধনায় শৈববিবাহে শক্তিরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল সভর্তৃকা ও সপিণ্ডা না হইলেই হইল। রামমোহনের গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তান্ত্রিক বামাচারী সাধক ছিলেন। তিনি রংপুরে রামমোহনের বাড়ীতেই থাকিতেন। পরে যখন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতা আসেন তখন উক্ত তীর্থস্বামীকে তিনি সঙ্গে করিয়া আনেন। যখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কাশী বাস করিতেছিলেন তখনও রাজা রামমোহন কৌশলে তাঁহাকে কলিকাতা আনয়ন করেন। রাজা বলিয়াছেন, বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় শৈববিবাহের স্ত্রীও অবশ্য গম্যা হয়। প্রবাদ এইরূপ রাজা রামমোহন কোন মুসলমানীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বহুদিন পর্যন্ত তন্ত্রের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

রামমোহন তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থক, অথচ বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধন ব্যাপারের উপর বিশেষরূপে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যকে তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছেন। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ

তান্ত্রিক বামাচারের ঘোর বিরোধী। বৈষ্ণবের গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীন যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে রামমোহন হইতে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। কিন্তু তিনি তান্ত্রিক বামাচারের কোনই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা মাত্রও করেন নাই। রামমোহন বৈষ্ণবীয় অশ্লীলতার উপর কশাঘাত করিয়াছেন; বিবেকানন্দ তান্ত্রিক বামাচারের উপর খড়্গ হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার এই উভয়কেই পরিহার করিবার জন্য সুপরামর্শ দিয়াছেন।

রামমোহন ও অক্ষয়কুমার পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে কেবল অবনতির চিহ্নই দেখিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অবনতি ও উন্নতি এই উভয় চিহ্নই দেখিয়াছেন। অবশ্য রামমোহন যুগ হইতে বিবেকানন্দ যুগে এইরূপ অপক্ষপাত দৃষ্টির জন্য অধিকতর সুযোগ বিদ্যমান ছিল, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

কি রামমোহন, কি দেবেন্দ্রনাথ ইহারা উভয়েই বাঙ্গালীকে সংস্কারযুগে, পুরাণতন্ত্রের যুগ হইতে টানিয়া উপনিষদের যুগে লইয়া যাইবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি বিস্মৃত হইতেছি না যে রামমোহন বর্তমান যুগের বিশালতর ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীকে জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগের মধ্য দিয়া অগ্রসর করাইয়া দিবার এক মহৎ প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। কোন দেশে কোন একজন মনুষ্য একাকী এত অধিক কার্য তাঁহার জাতির জন্য করিয়া গিয়াছেন কিনা বলা শক্ত। ইহা জানি। তথাপি পুরাণতন্ত্রযুগের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলি রামমোহন দ্বারা সাধন মার্গে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে অধিক সহায়তা পাইয়াছে, ইহা বলা শক্ত। স্বামী বিবেকানন্দের নিকটও এ বিষয়ে আমরা, আশানুরূপ ফল পাই নাই। স্বামী বিবেকানন্দও, রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালীকে উপনিষদের যুগের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছেন। তবে পৌরাণিকযুগের ভক্তিধর্ম সম্বন্ধে তিনি রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ হইতে অনেক উন্নততর ভাব পোষণ করিতেন। অধিকারীভেদে পৌরাণিক ভক্তিধর্মের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করিতেন।

পৌরাণিকযুগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা এমন কি ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র আরো অধিকতর উদার ও অগ্রগামী। কেশবচন্দ্রের চরিত্রে ভাবের ও আবেগের আতিশয্য ছিল। কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি ছিল। কেশবচন্দ্র স্বভাবভক্ত একজন কবি ছিলেন। যদি তিনি প্রথম জীবনে খৃষ্টীয় পুরাণ বাইবেলে আকৃষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মযুগের এই সর্বশেষ বিশ্ববিশ্রুত অসাধারণ বাগ্মী, অদ্ভুত ক্ষমতাশালী নেতা তাঁহার বিচিত্র ধর্মজীবনে, সংস্কার ও সমন্বয়যুগের তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া দোলায়মান না হইয়া সমন্বয়যুগের একজন ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রচারক হইতে পারিতেন। কেশবচন্দ্র সমন্বয়যুগের প্রথমেই পৌরাণিক দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। এইদিক দিয়া বিচার করিলে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এমন কি বিবেকানন্দ হইতেও কেশবচন্দ্রের মৌলিকত্ব ও অসাধারণত্ব সবিশেষ প্রশংসনীয়।

কেশবচন্দ্রের হিন্দু দেবদেবীর রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সংস্কার-যুগ বাঙগালীকে অল্পাধিক উপনিষদের যুগের দিকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। সমন্বয়যুগে স্বামী বিবেকানন্দও এ বিষয়ে বহু পরিমাণে সংস্কারযুগেরই অনুগমন করিয়াছেন। তবে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ হইতে বিবেকানন্দের আদর্শ কিঞ্চিৎ পৃথক, সংস্কারের প্রণালীতেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খুব বেশী।

কিন্তু বাঙগালীর পুরাণ ও তন্ত্রের বিশেষ দুইটি সাধন ধারার মধ্য দিয়া কিরূপে যে আমরা এই নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইব, তাহা অন্ধকারে জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত পরিস্ফুট হইয়াছে।

—প্রথম, রামকৃষ্ণের কালী সাধনায়।

—দ্বিতীয়, বিজয়কৃষ্ণের বৈষ্ণব সাধনায়।

বাঙগালী সমন্বয়যুগে তাহার বিশেষের মধ্য দিয়াই বিশ্বকে, বিশ্বাতীতকে লাভ করিয়াছে। বিশেষকে বর্জন করিয়া যে এক কল্পিত বস্তুতন্ত্রহীন সার্বভৌমিক আলেয়ার দিকে বাঙগালীকে আর ছুটিতে হইবে না, ইহা কেবল সম্ভব হইয়াছে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের অভ্যুদয়ে। ইঁহারা বাঙগালীর প্রাণধর্মের ঐতিহাসিক ধারায় অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া এই পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীরিত ভীষণ স্রোতাবর্তে উদ্বেলিত প্রচণ্ড তরঙ্গের মত গর্জিয়া উঠিয়াছেন। ইঁহাদের দেখিয়াই বাঙ্গালী চিনিতে পারিয়াছে। ইঁহাদের লাভ করিয়াই বাঙ্গালী বুঝিয়াছে যে উপনিষদের যুগে ফিরিয়া না গেলেও বা চলিবে। বুঝিয়াছে বাঙগলার শাক্ত ও বৈষ্ণব মরে নাই, মরিবে না। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেবদেবী মিথ্যা নয়। বাঙগালীর অবতারগণ নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই। বাঙগালীর মন্ত্রশক্তি কেবল একটা নিষ্ফল গুপ্তবিদ্যা নহে। বাঙগলায় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারায় গুরুপরম্পরায় এখনও ধর্মের স্রোত ফল্গু নদীর মত উপরের শুষ্ক বিস্তর বাদানুবাদের বালুস্তরের নিম্নদেশ দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। তাই শ্যামলা বঙ্গভূমি আজিকার এই দুর্ভিক্ষের মহাশ্মশানেও সোনার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে পারিয়াছে।

পুরাণ ও তন্ত্রের যুগকে, রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার-যুগ প্রতিষেধ করিয়াছে, পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের সমন্বয়যুগ তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সংস্কারযুগ হইতে এইখানেই সমন্বয়-যুগের বিশেষত্ব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমি না বলিয়া পারি না। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ পৌরাণিকযুগের দুইটি অবতার। তাঁহারা দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা কবি কিংবা বৈজ্ঞানিক নহেন। তাঁহারা বাঙগলার দুইটি সাধন-ধর্মের স্বরূপ হইতে রূপ পাইয়াছেন। আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া তন্ত্র ও পুরাণ ধর্মের এ যুগের জীবন্ত বিগ্রহ ধরিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের বিকাশের ধারায় প্রত্যেক স্তরের ধর্মানুভূতি তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। জগতের

অন্যান্য ধর্মের বিচিত্র ভাব অনুভাবগুলিও তাঁহাদের জীবনধারায় এক জৈবিক মিশ্রণে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রের রক্ষণশীলমূলক দুর্বলতার জন্য তাঁহাদের জীবনে যাহা কিছু বলপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ এবং নবযুগের উপযোগী উন্নততর বিকাশ, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কল্পিত অথচ পরিহারযোগ্য মধ্যযুগীয় আবর্জনারাশি আমরা এই দুই চরিত্রে অযথা আরোপ করিয়া, পুনরায় সমন্বয়যুগের পর, ধর্মচিন্তায় ও ধর্মসাধনায় স্বাধীনতাকে ও নবজীবনের গতিকে ক্ষুণ্ণ করিবার উপক্রম করিতেছি। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ-পন্থিগণ এই বিষয়টি প্রণিধান করিয়া দেখিবেন আশা করি।

পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেবী

এইবার আমরা পুরাণ ও তন্ত্রকথিত দেবদেবীদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেছি। সংস্কারযুগ এই সমস্ত দেবদেবীকে তর্ক ও বাদানুবাদের মধ্য দিয়া, বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইহাদিগকে, কখন বা অর্ধ অস্বীকার, আবার কখন বা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সমন্বয়যুগ, তর্ক ছাড়িয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত দেবদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছেন। সমন্বয়যুগে যে দেব-দেবী সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ হয় নাই এমন নহে। তবে এ যুগে সাধনাই মুখ্য পরন্তু বিচার গৌণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সমন্বয়যুগ অনেকাংশে পৌরাণিকযুগে প্রত্যাবর্তনের মত বাহির হইতে প্রতীয়মান হয়।

সংস্কারযুগে রাজা রামমোহন একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একেশ্বরবাদ সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সময়েই দেখা দিয়াছিল। ঋষি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বলিতে পারিয়াছিলেন, 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' তারপর কত সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ভারতের ধর্মক্ষেত্রে কত অভিনব পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলাদেশে আবার একদিন বহু দেবদেবীর মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছিল—

"ভাব সেই একে, জল স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।"

পুরাণ তন্ত্রের দেবদেবীবাদের জন্মস্থান কোথায়? অবশ্য তান্ত্রিক ও পৌরাণিক যুগের হিন্দুর ধর্মচিন্তায় ও ধর্মানুভূতির মধ্যে। কিন্তু কেবল মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর শেষ না করিয়া যদি আমরা এই সমস্ত দেবদেবীর ঐতিহাসিক উৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা যে স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া কোথায় গিয়া উপনীত হইব তাহা আজিও কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদের যুগ আর পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ এক নয়। ঋগ্বেদের দেবদেবীও পুরাণ তন্ত্রের দেবদেবী নহেন। বাহির হইতে অনেক দেবদেবী পরবর্তীকালে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন এবং দেশে এত যে দুর্ভিক্ষ, তবু কেহ যাইবার নামটি পর্যন্ত করেন না। সে যাহাই হউক, যদি আমি আর আমার প্রপিতামহ এক না হইলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন না হই,

তবে পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেবী ঋগ্বেদের দেবদেবী হইতে বহু অংশে ভিন্ন হইয়াও একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে যাইবে কেন? যে যুগের চিন্তায় অতীত ও বর্তমান এক-সূত্রে গ্রথিত, সে যুগের চিন্তা ঋগ্বেদের দেবদেবীকে পুরাণ তন্ত্রের দেবদেবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। অথচ সংযোগের সেই ক্ষীণ সূত্রটিও আমরা এই শতাব্দীব্যাপী এত বড় ধর্ম্ম-কলহের মধ্যেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। বাঙলায় আবেগের আতিশয্য যতটা আছে, যদি সেই পরিমাণে ধীরতা, একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতা থাকিত, তবে রাজা রামমোহনের পরেও আজ সকল বিষয়েই আমাদিগকে এমন পরমুখাপেক্ষী হইয়া কালক্ষয় করিতে হইত না।

যাহা হউক রাজা রামমোহন 'ভাব সেই একে' বলিয়া যে সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন সেই সংস্কার যুগের এবং রাজা রামমোহনের দুইটি প্রধান কীর্তি—

—পুরাণ ও তন্ত্রের বহু দেবদেবীবাদ নিরসন।

—এক অদ্বিতীয় বৈদান্তিক নিরাকার পরব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা।

আচার্য মোক্ষমূলার রাজা রামমোহনকে এ যুগে তুলনামূলক ধর্ম-বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজা রামমোহন বিভিন্ন দেশে ও কালে যে সমস্ত ধর্মমত বিকশিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মের বিষয় তিনি তাঁহার রচনার নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এই সম্পর্কে বহু দেবদেবীর উপাসনাকেও রাজা এক শ্রেণীর ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বেদের ও উপনিষদের বহু দেবদেবীকে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নানারূপ গুণের রূপক চিহ্নস্বরূপ বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলতঃ এই ব্যাখ্যাই তিনি পুরাণ ও তন্ত্রের দেবদেবিগণের উপরও প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন মনুষ্যাদি জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তেমনি দেবদেবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্য রাজাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান, সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান?" রামমোহন উত্তর দিয়াছিলেন, "দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি।" অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সহায়তায় রাজা দেব-দেবীকে এক উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া স্বীকার করিয়াও পারমার্থিক দিক হইতে তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। রামমোহন বহু দেবদেবীবাদ কেবল মায়া-বাদের সাহায্যেই নিরসন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যবহারিক জগতে মনুষ্যাদি জীবের সহিত দেবদেবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেমন মনুষ্যের জন্য তেমনি দেবতাদের জন্য তিনি নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম উপাসনার বিধি দিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনায় দেবতারাও মনুষ্যের সমকর্মী। ব্রহ্মদৃষ্টিতে মনুষ্য যেমন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া কহিতে পারে, সেইরূপ দেবতারাও কেবল ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কহিতে পারেন। বস্তুতঃ দেবতারা ব্রহ্ম নহেন। আর

ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। কাজেই দেবতারা মনুষ্যের উপাস্য হইবেন কি প্রকারে? তবে যে ব্যক্তির বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নাই, সেই কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবে। দেবোপাসনা নিরসনকল্পে ইহাই রাজার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত।

আমরা দেখিলাম রাজা দেবতাদিগকে একবার বলিতেছেন, ব্রহ্মের কাল্পনিক রূপ, আবার বলিতেছেন, মনুষ্যাদির মত একশ্রেণীর জীব।

তবে যেখানে ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে তিনি বলিতেছেন যে, "আমরা আপনাদের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি।" সেখানে অবশ্যই বুঝিতে হইবে রাজা পারমার্থিক-ভাবে মনুষ্যাদি জীবদেহকেও "কাল্পনিক রূপ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। দেবতা ও মনুষ্য-শরীর "মিথ্যারূপে তুল্য জানা"র অর্থ 'তুল্যরূপে মিথ্যা' বলিয়া জানা। সুতরাং যে যুক্তির বলে রামমোহন বহু দেববাদ নিরসন করিয়াছেন, সেই যুক্তির বলেই মনুষ্যাদি জীব পশুর বহুত্ব ও অস্তিত্ব যুগপৎ অস্বীকৃত হইয়াছে। এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর সমস্ত জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম—মনুষ্য ও দেবতা হন নাই। বস্তুতঃ ব্রহ্মই আছেন, দেবতারা এবং মনুষ্যেরা নাই। বহু দেবোপাসনা নিরসন-কল্পে ইহাই রামমোহনের সিদ্ধান্ত। সমন্বয়যুগের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। ইহা বিশেষরূপে বৈদান্তিক মায়াবাদ। সংস্কারযুগের প্রথমে রামমোহন এবং সমন্বয়যুগের শেষে বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক মায়াবাদের সাহায্যেই বাঙলার পুরাণ ও তন্ত্রের বহু দেবদেবীবাদকে নিরসন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তবে রামমোহন অপেক্ষা বিবেকানন্দ দেবদেবীর উপর অধিকতর শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন।

কিন্তু যতক্ষণ না পারমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎকে এবং আপন আপন শরীরকে এবং তাবৎ লোক ব্যবহারকে মিথ্যাজ্ঞান হইতেছে ততক্ষণ কি রামমোহন যুগে, কি বিবেকানন্দ যুগে, পুরাণ তন্ত্রের বহু দেবদেবীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে শিক্ষিত বাঙালীর বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। কেননা দেবদেবীকে মিথ্যা জানিবার আগে আপনাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেবদেবীতে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়কুমার ধর্মের শ্রেণীভেদে দেবদেবী উপাসনা এক শ্রেণীর নিম্নাধিকারীর ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ঐ ধর্মের মিথ্যাত্ব ও অনুপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হিন্দুর দেবদেবীর এক অভিনব রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং তাহা ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গীভূত বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ঐ সমস্ত রূপাদি কল্পনা মাত্র—এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সমন্বয়যুগে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ তন্ত্র ও পুরাণের মৃন্ময় ও চিন্ময় দেব-দেবী বিগ্রহের সাধনায় কি অপূর্ব বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার অধিকার

আমার নাই। যে বস্তু বিচারের সীমার মধ্যে আসে না, তর্ক-বিতণ্ডা যেখানে পেঁছিতে পারে না সেখানকার অনির্বচনীয় ব্রহ্মস্বরূপে বাচালতা দ্বারা আঘাত করার মত দুঃসাহস আমার নাই।

তবে সমন্বয়যুগে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম-সাধনায় বাঙ্গালী স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছে যে, বাঙ্গলার দেবদেবী মরে নাই এবং ধর্মকে সাধন করিতে বসিয়া সাধকের প্রকৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষাভেদে তাহারা একেবারে প্রয়োজনের বাহিরেও নহে এবং দেবদেবীর পূজাও পাপ নহে। ইহাও এক শ্রেণীর ধর্ম।

পুরাণ ও তন্ত্রের মন্ত্রবিদ্যা

পুরাণ ও তন্ত্রের যুগের বাঙ্গালী মন্ত্রবিদ্যা বলিয়া একটা বিদ্যায় বিশ্বাস করিত। ইহার পূর্ব পূর্ব যুগেও মন্ত্রবিদ্যার সমধিক প্রচলন ছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রাণই ছিল মন্ত্রবিদ্যা! মীমাংসা দর্শন এই মন্ত্রবিদ্যারই দর্শন। উপনিষদ-যুগ, বৌদ্ধযুগ এ সমস্ত প্রাক্ পৌরাণিক যুগেও মন্ত্রবিদ্যা লুপ্ত ত হয়ই নাই বরং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গত শতাব্দীর সংস্কার ও সমন্বয় যুগ এবং ইহার সহিত পুরাণ তন্ত্রের যুগের নিকটবর্তী সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং পুরাণ ও তন্ত্রের যুগের মন্ত্রবিদ্যার প্রতি রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন আমাদের তাহাও একবার সংক্ষেপে দেখিয়া লইতে হইবে।

রামমোহনের রচনাবলী পাঠে মনে হয় যে তিনি তাঁহার মানসিক বিকাশের কোন স্তরেই মন্ত্রবিদ্যায় বিশ্বাস করেন নাই। 'তহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনার পরে অনেক বিষয়ে তাঁহার মানসিক বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার অতিরিক্ত কোন মন্ত্রশক্তিতে তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। মন্ত্রবলে কোন অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা যায় না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার ক্ষমতা কোন মন্ত্রবিদ্যার সাধ্যায়ত্ত নহে।

একথা সত্য যে, অনেক স্বার্থান্ধ ধর্মযাজকগণের হস্তে পড়িয়া মন্ত্রবিদ্যা একটা বাজিকরের যাদুবিদ্যার মধ্যে পতিত হইয়াছিল এবং মন্ত্রবিদ্যার প্রতি একপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস জন্মাইয়া পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে অনেকেই অজ্ঞ লোকদিগকে নানা বিষয়ে প্রতারণা করিয়া বেড়াইত। ইহাতে বিশ্বাস করিয়া এবং এই বিদ্যার প্রকৃত ধর্ম না জানিতে পারিয়া প্রতারক ও প্রতারিত এই উভয়ে মিলিয়া অনেক জাতীয় দুর্গতি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রযুগের একজন প্রতিবাদী। সুতরাং তিনি উক্ত যুগের বহু অংশে দুর্গতির এক মূল কারণ বলিয়া যাহাকে স্থির করিয়াছিলেন, তাহাকে বিধিমত নিরসন করিবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যদি

তিনি তন্ত্রের সাধনও করিয়া গিয়া থাকেন, তথাপি মন্ত্রবিদ্যার উপর তাঁহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল, ইহা তাঁহার রচনা পাঠে জানা যায় না।

সমগ্র সংস্কারযুগে কোন নেতাই মন্ত্রবিদ্যার আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইহাতে বিশ্বাসও করিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দ মন্ত্রবিদ্যায় অবিশ্বাসী ছিলেন ইহার প্রমাণ নাই। তবে মন্ত্রবলে কোন অলৌকিক ক্রিয়াসাধন, মন্ত্রবিদ্যাকে একটা গুপ্তবিদ্যা বলিয়া প্রচার করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি বলিয়াছেন—

"গুপ্তভাব লইয়া নাড়াচাড়া ও কুসংস্কার সর্বদাই দুর্বলতার চিহ্নস্বরূপ, উহা সর্বদাই অবনতি ও মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ। * * সর্বপ্রকার গুপ্তভাবের দিকে ঝোঁক পরিত্যাগ কর। ধর্মে কোন গুপ্তভাব নাই।"

"আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্ সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। * * এই সকল রহস্যময় গুহ্যমতসমূহে কিছু সত্য থাকিলেও, সাধারণতঃ উহাতে মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিয়াছি।"

বরং তিনি নাস্তিক হইতে বলিয়াছেন, তথাপি এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা ও গুপ্ত--সমিতির পশ্চাতে ছুটিতে নিষেধ করিয়াছেন। হয়ত এই সাবধানতার মধ্যে আধুনিক তত্ত্ব-বিদ্যা সমিতিগুলির উপরেই একটা ইঙ্গিত আছে।

যে কারণে রামমোহন মন্ত্রবিদ্যার অলৌকিকত্ব অবিশ্বাস করিয়াছেন, সেই কারণেই বিবেকানন্দও অলৌকিকত্বের মোহ হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু যেমন সর্বত্র তেমনি এক্ষেত্রেও তিনি সংস্কারযুগের একদেশ-দর্শী অপেক্ষা প্রত্যেক বস্তুরই ভালমন্দ দুই দিক দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্য রাজযোগের ব্যাখ্যা যখন তিনি করিয়াছেন তখন—কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন ও ঊর্ধ্বগতি, ষট চক্রভেদ, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর স্থান ও ক্রিয়া, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধাই লাভ—এ সমস্তই তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তিনি যে কেবল ইহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি নিজের সাধন জীবনে এই বিশিষ্ট প্রকার সাধন, কোন না কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সাধন সম্পর্কে আস্থাবান এবং যাঁহারা এই সাধন সম্বন্ধে অতি অল্পমাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা যদি স্বামী বিবেকানন্দের এই সাধন-ব্যাখ্যা মনোযোগ সহ-কারে অনুধাবন করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি কেবলমাত্র আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তনরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে বিহার করিতেন না, কুণ্ডলিনী ও ষটচক্রের সাধনাও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধন গ্রহণ না করিলে

পুঁথি পড়িয়া, তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা দিতে পারিতেন না। অবশ্য বিশেষজ্ঞ ব্যতীত, ইহা সাধারণের বোধগম্য নাও হইতে পারে।

আমি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কুণ্ডলিনী যোগকে পার্থক্য করিতেছি। সমস্ত যোগেরই উদ্দেশ্য এক। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মনুষ্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তাহাই যোগের প্রণালী।

কিছুকাল পূর্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ হট-যোগী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হটযোগ ব্যতীত রাজযোগ সম্ভব নয়। হটযোগ রাজযোগের সোপান। তাঁহার কথায় বুঝিয়াছিলাম, সোপান পরম্পরার মত এক যোগ অন্য যোগের সমীপবর্তী করিয়া দেয়। আমি আরো উত্তরে হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া হিমালয়ে আর একজন যোগীর দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর যোগীকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক যোগেই যোগী চরম অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইতে পারেন। অবশ্য যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাই ইহার সমাধান করিতে পারেন। মন্ত্রবিদ্যার সহিত প্রত্যেক শ্রেণীর যোগের সম্পর্কই অতি ঘনিষ্ঠ।

সংস্কারযুগে রামমোহন আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তা করাকেই যোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তদঙ্গীয় শম, দমাদির কথাও তিনি বলিয়াছেন। আশ্রমী, অনাশ্রমী, গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই এই অদ্বৈত যোগ অবলম্বন করিতে পারেন। অন্য কোন যোগের কথা রামমোহন বলেন নাই। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনের ক্রিয়া ও ভক্তিযোগের কোন অভিনব সিদ্ধান্ত বা যুগোপযোগী সংস্কার আমরা তাঁহার নিকট পাই নাই। তবে রামমোহন তান্ত্রিক সাধনা করিতেন, তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, এখনও আছে, সুতরাং তাঁহার নিকট কুণ্ডলিনী যোগ ও তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে ষটচক্রভেদের একটা প্রকরণের কোন প্রকার ব্যাখ্যা আমরা আশা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় আমরা তাহা পাই নাই। এজন্য অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি সম্ভবতঃ তন্ত্রের সাধনায় শেষ পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই অথবা কে বলিবে তান্ত্রিক সাধনার মধ্য দিয়া তিনি কোন্ পথে কোথায় গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।

তন্ত্রের সাধনা ছাড়িয়া দিয়া রামমোহনকে আমরা জ্ঞানযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বিশুদ্ধ অদ্বৈতের সাধনায় বিবেক বৈরাগ্য সহযোগে তিনি যত্ন করিয়াছেন, তাঁহার রচনা ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইতে এমন নিদর্শন আমরা পাই।

রামমোহনের পরে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র "উপাস্য উপাসক সম্বন্ধে" সংযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা কেহই রামমোহনের মত অদ্বৈত ও মায়াবাদী ছিলেন না। ব্রহ্মযোগে ইঁহারাও বিহার করিয়াছেন। তবে রামমোহনে যেমন জ্ঞানের ভাব প্রবল দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে তেমনি আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরও যথেষ্ট অবসর ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বা কেশবচন্দ্র আমাদের দেশীয় কোন বিশিষ্ট যোগ-

প্রণালীকে অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা দেশী ও বিদেশী দার্শনিক কতকগুলি তত্ত্ব ও ভাব মিশ্রিত করিয়া একরূপ ধ্যান যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার সহিত মন্ত্রবিদ্যার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মায়াবাদী হইলেও পরিণত ধর্মজীবনে ব্যষ্টি-মুক্তির মোহ ত্যাগ করিয়া সমষ্টি মুক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। কুণ্ডলিনী-যোগকে তিনি রাজযোগের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নাড়ী-ত্রয়ের ভিতর দিয়া ষটচক্রভেদের যে উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা রেচক, কুম্ভকাদি প্রাণায়াম ব্যতিরেকে, মন্ত্রশক্তির কোন অপেক্ষাই রাখে না। বস্তুতঃ মূলাধার হইতে, ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধা ও আজ্ঞা এই ষটচক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থিত করিবার পথে তিনি কোন্ বিশেষ চক্রে কুণ্ডলিনীকে কি মন্ত্রে জাগ্রত ও ক্রমশঃ সঞ্চারিত করিতে হইবে তাহা বলেন নাই। অনাহত কেন দ্বাদশ দলের আর বিশুদ্ধাচক্র কেনই বা ষোড়শ দলের পদ্ম বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহারও কোন ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই। তিনি সিদ্ধাই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ চক্রে কুণ্ডলিনী উঠিলে কোন্ সিদ্ধাই সাধক লাভ করেন ইহারও বিবরণ তিনি দেন নাই। বর্ণমালার বিবিধ বর্ণের সাঙ্কেতিক উচ্চারণ ও অর্থের সহিত মন্ত্র-বিদ্যা অনুস্যুত। কোন্ চক্রে কোন্ কোন্ বর্ণ, কোন্ শব্দ অর্থে কোন্ মন্ত্রশক্তির স্ফুরণ, ইহা রামপ্রসাদের পরে শতাব্দী ঘুরিতে না ঘুরিতেই যে আমরা পরিষ্কার ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা কি সমন্বয়যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারকের অবিদিত ছিল? 'কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী মা' যে 'বর্ণরূপা'; কোন্ বর্ণে যে কোন্ চক্রে তিনি বিরাজ করিতেছেন তাহা না দেখাইলে, কোন্ মন্ত্র কখন কোথায় কি উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা সাধক জানিবেন কিরূপে?*

যাহা হউক আমার বলিবার কথা এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ধ্যানযোগে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত না করিয়াও ব্রহ্মে বিহার সম্ভব। তাহাতে মন্ত্রবিদ্যার সমধিক প্রয়োজন নাই। কিন্তু কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাইয়া সহস্রারে যে যোগ, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের অনুভূতির সদৃশ নয় বলিয়াই যোগীদের নিকট শুনিয়াছি। আর কেবল রেচক কুম্ভকে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া চক্রের পর চক্র অতিক্রম করিয়া

---

* রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ ঘুচাও মনের খেদ
হংসীরূপে মিল হংসবরে

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের তৃতীয় সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠায় হং ক্ষং বর্ণ সমন্বিত দ্বিদল আজ্ঞাচক্রের উল্লেখ দেখিতে না পাইয়া পরে শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের নিকট অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, উহা মুদ্রাঙ্কন দোষ। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রম নহে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে মুদ্রাঙ্কন দোষ অতিশয় মারাত্মক।

সহস্রারে সদাশিবের সহিত গিয়া সংযুক্তা হন না। চক্র হইতে চক্রান্তরে পরিভ্রমণ কালে এই ব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনী মন্ত্রশক্তির অপেক্ষা রাখেন।

পুরাণ ও তন্ত্রের গুরুবাদ

বাঙলার মন্ত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার গুরু ব্যতিরেকে আবার সম্ভব হইবে কিনা কে জানে? গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যে বিদ্যা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই তাহা কে জানে কোন বালুচরে আসিয়া শুকাইয়া গেল। আবার কি বাঙালী গুরুর নিকটে গিয়া বসিবে? কে এই গুরু? আর কি এই গুরুবাদ? পণ্ডিতেরা বলেন এই গুরুবাদে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

রামমোহন 'তুহ্‌ফাতুল মওয়াহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনাকালে গুরুবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি গুরুর সহায়তার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। তবে গুরু যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আর গুরু যে অভ্রান্ত ইহা তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন নাই। পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে গুরুর মধ্যে ঈশ্বরবাদ ও অভ্রান্তবাদ আসিয়া মিশ্রিত হওয়াতে এবং তজ্জন্য সাধারণ অজ্ঞ লোকদের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে ভয়, দুর্বলতা ও দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়াতে রামমোহন গুরুবাদকে অস্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি তন্ত্রের সাধনায় হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র আবার দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষিত হন। ইহাই সংস্কারযুগের গুরু পরম্পরার ইতিহাস। শতাব্দীর প্রথম ভাগ রামমোহন পরিচালিত করেন, দ্বিতীয় ভাগ দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত করেন, তৃতীয় ভাগ কেশবচন্দ্র পরিচালিত করেন। কেশবচন্দ্রের পরেই সংস্কারযুগের অবসান। এই তৃতীয় ভাগের প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ গুরু—কেশবচন্দ্র শিষ্য। গুরু-শিষ্যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা শুধু মাত্র এই বিচ্ছেদের কথাই জানেন, তাঁহারা গুরু-শিষ্যের হৃদ্‌গত সম্পর্কের অতি অল্পমাত্রই জানেন। এই বিচ্ছেদ যাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই, তাহাই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল তাহা ইতিহাসের দুইটি অধ্যায়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব? * * যদি আমার মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক—তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখ অবধি মস্তকের কেশ পর্যন্ত—এখনি যেন—এই পত্র লিখিতে লিখিতে জীবন্ত-

রূপে প্রতিভাত হইতেছে। যদি কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্রুর বিসর্জন হইয়া থাকে তবে সে তাঁহারই জন্য।"

ইহার পর বৎসর কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একখানি এত্রে লিখিতেছেন—"আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস।" কাহার চক্ষু এমন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে যে বিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্যের এই স্বাভাবিক হৃদ্‌গত যোগের করুণ দৃশ্য দেখিয়া তাহা বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিবে না?

বিবেকানন্দের গুরু পরমহংসদেব

অন্যদিকে সমন্বয়যুগে রামকৃষ্ণদেব গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য। গয়ায় আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এক অজ্ঞাত পরমহংসের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণদেবের সাধক জীবনেও তিনি গুরুকরণ করিয়াছিলেন, এমন কথা তাঁহার জীবনচরিতে দেখিতে পাই।

সুতরাং কি সংস্কারযুগে, কি সমন্বয়যুগে যাঁহারা ধর্মজগতে অতুল বিক্রমে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই ললাট দেশে গুরুকৃপা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম?"

"আমাকে দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিও না।"

"যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহাতে জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহার। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখন অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখন কাহার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে, তবে আমার তাঁহার নহে।"

এই নরেন্দ্রের জন্যই সংসারে বীতরাগ স্থিতধী পরমহংসদেবের বুকের মধ্যে বিনিদ্র নিশায় গাম্‌ছা মোড়া দিয়া উঠিত কেন, তা কে জানে?

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ধর্মজীবনে, ধর্মজগতে কেবল আবশ্যক নয়, অবশ্যম্ভাবী। ইহার মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই। যাহা আছে তাহা অতি স্বাভাবিক পবিত্র মানবীয় প্রেম।

স্বামী বিবেকানন্দও সংস্কারযুগের অনুগামী হইয়া কুলগুরু প্রথার দোষোদ্ঘাটনে ত্রুটি করেন নাই। যাহা কিছু জাতিকে দুর্বল ও মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে, স্বামিজী অতি নির্মমভাবেই তাহার উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। সংস্কারযুগ পৌরাণিক অবতারবাদ অস্বীকার করিতে বাধ্য এবং করিয়াছেও।

বৈদান্তিক অবতারবাদ আর পৌরাণিক অবতারবাদে পার্থক্য আছে। বেদান্ত বলে জীবের আত্মাংশে জীব ব্রহ্ম। সুতরাং উপাধি যতই বর্জিত হইয়া জীব আত্মময় হয় ততই তাঁহার ব্রহ্মভাব ফুটিয়া উঠে। এইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন জীব ব্রহ্মদৃষ্টিতে নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতেও পারেন কহিতেও পারেন। এইদিক দিয়া প্রত্যেক জীবই এক হিসাবে ব্রহ্মের অবতার। রাজা রামমোহন এইরূপ বৈদান্তিক অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা ছাড়াও আর এক প্রকার অবতারবাদ আছে। তাহাতে এইরূপ বলা হয় যে ব্রহ্ম জীবের উদ্ধারের জন্য নিজে অবতার রূপে মনুষ্যদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হন। পৌরাণিক সমস্ত অবতারই এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মের এক অপ্রাকৃত আনন্দময় চিরস্থায়ী বিগ্রহের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। রামমোহন এই পৌরাণিক অবতারবাদ, বিশেষভাবে গৌড়াঙ্গীয় বিগ্রহরূপী অবতারবাদ একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ অবতারবাদ বা কোনরূপ মধ্যবর্তীতাবাদ সম্বন্ধে একেবারে অসহিষ্ণু ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে কেশবচন্দ্রে আরোপিত অবতারবাদ-ঘেঁসা মধ্যবর্তীতাবাদের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং রাজনারায়ণবাবুকে দিয়া করান। ইহা লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজে এক কলহের সূত্রপাত হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে কেশবচন্দ্র উত্তর জীবনে বহু পরিমাণে পৌরাণিক অবতারবাদে বিশ্বাস করিতেন। যদিও কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ ঠিক অবতারবাদ নয় এবং বৈদান্তিকের দিক হইতেও তাঁহার মহাপুরুষবাদের ব্যাখ্যা চলিতে পারে, তথাপি কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে পৌরাণিক অবতারবাদের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল না এমন কথা বলা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ বৈদান্তিক। অবতারবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মত বৈদান্তিকেরই মত। তথাপি কখনও কখনও ভক্তির আতিশয্যে তিনি ঐতিহাসিক ধর্মপ্রবর্তক অবতারদিগের সম্পর্কে এমন ভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা পৌরাণিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমহংসদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস ও উক্তিই আমার কথার সাক্ষ্য দিবে।

আমি আপনাদের নিকট পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ সম্বন্ধে সংস্কার ও সমন্বয়-যুগের অভিমত সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এবং পুরাণ ও তন্ত্রযুগের দেবদেবী, মন্ত্রবিদ্যা, গুরুবাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার ও সমন্বয়-যুগের কি সিদ্ধান্ত এবং সেই সম্পর্কে রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় মত পার্থক্য তাহাই আলোচনা করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মূর্তিপূজা ও সংস্কারযুগ

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইতে যখন দশ বৎসর বাকী, রাজা রামমোহন সেই সময় মাত্র ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে, "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক প্রণালীর" বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা অকস্মাৎ নির্মেঘ আকাশে বজ্রপাতের মত প্রতিভাত হয়। ক্রমে ইহা হইতে মূর্তিপূজা সমস্যা লইয়া বাদানুবাদের এক প্রবল ঝটিকা পরবর্তী শতাব্দীর উপর দিয়া বহিতে থাকে। গত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সংস্কারযুগ, মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরাণ, তন্ত্র পর্যন্ত বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, মূর্তিপূজা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেবল প্রতীক অথবা রূপকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মূর্তিপূজা উপলক্ষে, ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ গুণের উপর সাধকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। আর ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বব্যাপীত্বও বুঝান হইয়াছে। কেবল পুরাণ তন্ত্র নহে, উপনিষদেও প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে। মনকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করিবে। আদিত্যকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করিবে। ইহা উপনিষদের কথা। ইহা জড়োপাসনা হইলে, উপনিষদেও অধিকারী ভেদে ইহার বিধি আছে। যখন শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ হিন্দুর ষড়দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে, মূর্তিপূজাকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন পাদ্রীদের সেই অযথা নিন্দাবাদ হইতে মূর্তিপূজাকে অনেকাংশে নিম্নাধিকারীর পক্ষে সমর্থন করিবার জন্যই রাজা রামমোহন পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের এই সমস্ত যুক্তি তাঁহার "দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন"-এর চারি সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। রাজা রামমোহন পাদ্রীদের উত্তরে অতি স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে পাদ্রীরা যেরূপ মনে করেন, সেরূপ ভাবে হিন্দুগণ কাষ্ঠলোষ্ট্রকেই ঈশ্বর মনে করিয়া কদাপি পূজা করেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মকেই হিন্দুগণ পূজা করিয়াছেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকায়, সেই ব্রহ্মকেই তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে আরোপ করিয়া পূজা করিবার একটা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। কাষ্ঠলোষ্ট্রকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা—আর ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে কাষ্ঠেলোষ্ট্রে আরোপ করিয়া পূজা করার মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, পাদ্রীগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা গত একশত বৎসর ধরিয়া কথঞ্চিৎ পাদ্রীভাবাপন্ন হইয়াছেন—তাঁহারাও যে আজ পর্যন্ত এই পার্থক্য পরিষ্কার বুঝিতে পারেন তাহাও মনে হয় না। মূর্তিপূজাকে অসত্য বা অশাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া মূর্তিপূজার বিশ্লেষণে মনস্তত্ব ও বুদ্ধিবিচার এককালে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেকে

বলেন, সমজাতীয় বস্তুতেই একে অন্যের আরোপ হইতে পারে। যেহেতু ব্রহ্ম আর জড় পদার্থ নিতান্তই ভিন্নজাতীয় বস্তু সুতরাং জড় পদার্থে বা তাহার মূর্তিতে ব্রহ্মের আরোপ হইতে পারে না। কাজেই আরোপ অর্থেও মূর্তিপূজা অযৌক্তিক ও অসিদ্ধ। ইহার উত্তর রাজা রামমোহনই দিয়া গিয়াছেন। "গোস্বামীর সহিত বিচারে" তিনি বেদান্ত-সূত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" (৪ অধ্যায়, ১ পাদ, ৬ সূত্র)। নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে—কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না। যেহেতু, ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন। আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে, কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার অমাত্যে রাজবুদ্ধি করা যায়, কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না। অতএব নাম-রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া—ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা অশাস্ত্র নহে। এইরূপ নামরূপ-বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করাতে কি জানি, ঐ সকলকে নিত্য-সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয়, এ নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে পুনরায়—জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে, উঁহাদের এক স্বতন্ত্র—পরব্রহ্ম কহেন।"

ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সকল জাতির মধ্যেই ধর্মের গ্লানি হইয়া মধ্যে মধ্যে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান কোন কালে ঘটে নাই, এমন কথা ইতিহাস পাঠজ্ঞ কোন ব্যক্তিই বলিবেন না। সুতরাং ধর্মের গ্লানির যুগে নাম রূপকেই অর্থাৎ তথাকথিত জড়পদার্থ বা তদ্দ্বারা নির্মিত মূর্তিবিশেষকেই কেহ কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম যে না কহিয়াছেন, এবং তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া যে পরিচালিত না হইয়াছেন এমন কথা বলা যায় না।

রামমোহন গ্রীক ও রোমক মূর্তিপূজার সহিত হিন্দুর মূর্তিপূজাকে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুর মূর্তিপূজা সমাজের ভিত্তিকে অধিকতর রূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী হিন্দু নরহত্যায় ও আত্মহত্যায় প্রশ্রয় পাইয়াছে। সর্বপ্রকার গর্হিত ও অশ্লীল আচরণে উৎসাহ পাইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানের অনুশীলন বন্ধ হইয়াছে। সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা রাজনৈতিক উন্নতির বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছে। অবশেষে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারের জন্য মূর্তিপূজা—বহুল প্রচলিত ধর্মের সংস্কার একান্ত আবশ্যক। *

---

*(1) "Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society"—*Introduction to the Vedanta.*

(2) Idolatry practised by the Greeks and Romans was certainly just as impure, absurd and puerile as that of the present Hindus;

শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন মূর্তিপূজার উচ্ছেদ বা সংস্কারের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি, রামমোহনের মতই পরিপূর্ণ রকমে প্রয়োজন বোধ করিয়াও, মূর্তিপূজার সংস্কারকে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে ততটা আবন্ধ বলিয়া মনে করিলেন না। এই সম্পর্কে স্বামিজীর উক্তি পুনরায় উদ্ধার করিতেছি—

"বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

"আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্ম নাশের কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুধর্ম প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া সমাজের যে এই অবস্থা তাহা নহে। কিন্তু ধর্মসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।"

---

yet the former was by no means, so destructive of the comforts of life, or injurious to the texture of Society, as the latter."—*A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas.*

(3) "The system (Idolatry) destroys to the utmost degree, the natural texture of Society, and prescribes crimes of the most heinous nature, which even the most savage nations would blush to commit."—*Preface to the Kath-Upanishad*,

(4) "Idol worship,—the Source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles, as countenancing criminal intercourse, suicide,—female murder and human sacrifice."—*Introduction to the Mundaka Upanishad.*

(5) "Idolatrous ceremonies under the pretext of honoring the All perfect Author of Nature, are of a tendency utterly subversive of every moral principle—*A Defence of Hindu Theism.*

(6) Fatal system of Idolatry induces the violation of every humane and Social feeling,—and moral debasement of a race who, I cannot help thinking, are capable of better things, whose susceptibility, patience and mildness of character render them worthy of a better destiny"—*Introduction to the Ishapanishad.*

(7) "Idolatry agreeable to the senses though destructive of moral principles and fruitful parents of prejudice and usperstition"—*Preface to the Ishapanishad.*

(8) "Idolatrous notions have checked or rather destroyed, every mark of reason, and darkened every beam of understanding"—*Introduction to the Kenopanishad.*

(9) "It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their Political advantage and social comfort."—*Extract from a letter to J. Digboy. England, Jan.* 18, 1828 *by Rammohan Roy.*

সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মের সংস্কার রামমোহন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ সেরূপ বুঝেন নাই। ধর্মকে, এমন কি মূর্তিপূজাকেও কতকাংশে অব্যাহত রাখিয়া, অদ্বৈত-বেদান্তের ভাবে ও প্রেরণায় সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার চাহিয়াছিলেন। রামমোহন তজ্জন্য সর্বপ্রথম ধর্মের সংস্কার চাহিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ধর্মকে না ভাঙিয়া ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি চাহিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য এবং এই উভয় প্রণালী ও মতবাদ আমাদিগের বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য। যাহা হউক, সমাজে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বাস। সুতরাং ইহা অসম্ভব নয় যে কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা ভ্রমবশতঃ, শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অবগত না হইয়া, স্ব স্ব বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা ও প্রবৃত্তি অনুসারে জড়পদার্থ অর্থাৎ নামরূপকেই স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম জ্ঞানে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য সমাজ বহু পরিমাণে অধোগতিও প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতি একসঙ্গে এই ভ্রান্তি দ্বারা চালিত হইয়াছে, ইহা মনে করা অন্যায়। কেননা রাজা রামমোহনই "ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে" বলিয়াছেন—

"একাল অপেক্ষা পূর্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। * * * বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় ঊনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ইহার কারণ রাজা রামমোহন এইরূপ দিয়াছেন—

"যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হয়, সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন—বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।"

মূর্তিপূজার প্রচলন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন যে কারণ ও যে সময় নির্দেশ করিলেন, সম্ভবতঃ তাহা পর্যাপ্ত নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান মূর্তিপূজার বিশ ভাগের ঊনিশ ভাগ প্রচলিত হইয়াছে, আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনের বৃদ্ধি এবং জ্ঞানের ত্রুটি হইয়াছে, অন্যান্য শতাব্দী অপেক্ষা ইহা বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে কতদূর সত্য ও প্রযোজ্য তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। কেননা রাজা রামমোহন যে সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থকে ভ্রান্ত মূর্তিপূজার পক্ষপাতী, এবং তদনুযায়ী ভ্রান্ত ক্রিয়াকলাপের এবং সর্বলোকবিরুদ্ধ গর্হিত আচরণের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ও সামাজিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কলাপ বাঙলাদেশে নিশ্চিতই কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভব হয় নাই তাহার পূর্বে হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয় এবং ঐ শতাব্দীতেই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বাঙালীর সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মের

অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গালীর তান্ত্রিক ধর্মমতেরও একটা পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী, এই ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মান্দোলনেই আলোকিত পুলকিত ও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিঞ্চিৎ অবসাদ আসে এবং ধর্মের আবর্জনা বৃদ্ধি পায় সত্য। তথাপি বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে লুপ্ত হয় নাই। আবর্জনাগ্রস্ত হইয়াও ইহারা ছিল এবং আছে। রাজা রামমোহন মহানির্বাণতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতি হইতেই বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের ধর্মান্দোলনের একটা সুমহৎ প্রেরণা লাভ করেন। ইহা সর্বজনবিদিত। রাজা যদি বাঙ্গলাদেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ-গুলিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার এই ঐতিহাসিক গবেষণা নির্বিচারে গৃহীত হইতে পারে না। মূর্তিপূজার উদ্ভব সম্বন্ধে রাজা রামমোহন-নির্দিষ্ট সময় ও কারণ আমাদের পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। কিন্তু সমাজের বিবর্তন ও আবর্তন পথে মূর্তিপূজার যে একটা সময় ও কারণ আছে বা থাকিতে পারে তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া সমাজ-বিজ্ঞানের পূর্বকার দিনে রাজার পক্ষে অতিশয় দূরদর্শিতা ও মনস্বীতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। যাহা হউক যদি রাজার কথাই এস্থলে আংশিক স্বীকার করিয়া আমরা চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাই যে ভ্রান্ত মূর্তিপূজার অর্থাৎ যাহা নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ না করিয়া, নামরূপকেই স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজার বিধি দেয় তাহা অতি অল্পকাল হইল আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। যাঁহারা মূতিপূজা করেন অথবা মূর্তিতে পূজা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মূর্তি-উপাসকগণ, অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে, এই ভ্রান্ত মূর্তিপূজার আদর্শ দ্বারা সেকাল কিংবা একাল কোনকালেই পরিচালিত হন নাই।

সুতরাং বাঙ্গালীর সংস্কার যুগে মূর্তিপূজার যে প্রতিবাদ তাহা শ্রীরামপুরের পাদ্রীরাই করুন, মহাত্মা ডফ্ সাহেবই করুন, বা রাজা রামমোহন ও তদনুবর্তী বাহ্ম সংস্কারগণই করুন, ইহা সকল শ্রেণীর মূর্তি-উপাসকগণের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কেবল যাহারা মূর্তিকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহাদের উপরেই প্রযোজ্য। রাজা রামমোহনের এই হিন্দুর মূর্তিপূজার বিশ্লেষণ, সমাজে তাহার উদ্ভবের কারণ, অধিকারী ভেদে তাহার প্রয়োজন, ইহা আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া দেখেন। আমি মনে করি, ভ্রান্ত মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করায় রাজা রামমোহনের যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দুর মূর্তি-পূজার সম্যক্ বিশ্লেষণে তাঁহার তদনুরূপ মনস্বীতা ও বিচারবুদ্ধির অতি উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই। রাজাকে কেবল মূর্তিপূজার বিরোধী বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা রাজার এ বিষয়ের কৃতিত্ব, বিশেষত্ব ও গৌরবকে যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব করেন এবং মূর্তিপূজার সম্বন্ধে রাজার সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এ বিষয়ে তাঁহার সর্বাঙ্গীন মহত্ত্বকেও লঘু করেন।

রাজার উক্তি হইতেই আমি আপনাদিগকে দেখাইয়াছি যে, "নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া বর্ণনা করা অশাস্ত্র নহে।" রাজার মতে "অজ্ঞানীর মনস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে।" এই সম্পর্কে তিনি বলেন, "কোন কোন ব্যক্তি মনস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্তাদির ধ্যান করেন। যেহেতু স্থূল ধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পর সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে" এবং "ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়।" আর রাজা ইহাও বলেন, এককালে নাস্তিক হওয়া বা নিরবলম্ব হইয়া উচ্ছন্ন যাওয়া অপেক্ষা মূর্তাদিতে চিত্ত স্থির করিয়া পরে পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, কি ব্যক্তির পক্ষে, কি সমাজের পক্ষে বিধেয়।

একশ্রেণীর সংস্কারক আছেন তাঁহারা বলেন যে, মূর্তিপূজকগণের কদাপি এবং কোনকালেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। কেন না মূর্তিপূজকেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিপরীত মার্গে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব-প্রথমেই মূর্তিপূজা পরিত্যাগ আবশ্যক।

ইহাদের প্রতিবাদ করিয়া রাজা বলিতেছেন যে, "স্থূলধ্যান দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পর, সূক্ষ্ম আত্মাতেই চিত্ত স্থির হইতে পারে" এবং ইহাতে তাঁহাদের "ঈশ্বর উদ্দেশ হয় এবং পরে পরে যত্ন করিলে যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকে।" সুতরাং রামমোহন, মূর্তিপূজাকে, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক প্রতিপাদন করিলেও, ইহাকে (১) অশাস্ত্রীয় বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, পরন্তু শাস্ত্রীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (২) এককালে নিরবলম্ব হওয়া অপেক্ষা মূর্তিপূজা বিধেয় বলিয়া অধিকারীভেদে ইহার প্রয়োজনীয়তা কি সমাজের পক্ষে, কি ব্যক্তির পক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। (৩) এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান পরম্পরায় মূর্তিপূজাকে নিম্নতম বলিলেও, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই একটি সোপান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী বা তাহার পরিপন্থী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন নাই। মানবের জ্ঞানরাজ্যে ধর্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে সহসা এক অতি অসঙ্গত ও অসমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজে সম্ভব নয়।

রামমোহন সম্পর্কে মূর্তিপূজার আলোচনা সম্ভবতঃ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। রামমোহনকে গত এক শতাব্দী ধরিয়া, নির্বিচারে যেরূপ ভাবে মূর্তিপূজার বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে, তাহাতে রামমোহনের উপর বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে মনে করিয়াই, এবং সংস্কারযুগের ইহা এক অতি গৃহবিচ্ছেদকারী মর্মান্তিক সমস্যা বলিয়াই, এবং এই সমস্যার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত বিশেষ-রূপে সংশিলষ্ট বলিয়াই, রাজা রামমোহনের মূর্তিপূজার ব্যাখ্যাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইল।

রাজা রামমোহনের পরে আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত আমরা পাই না। তবে নির্গুণ ও নিরাকারবাদী ব্রহ্মসভার আচার্যকে

মূর্তিপূজা-বিরোধী অমূর্তের উপাসক বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি। সংস্কার-যুগে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের অনুকরণ করিয়া মহাত্মা ডফ্ সাহেব হিন্দুর মূর্তি-পূজাকে আর একবার আক্রমণ করেন। তত্ত্বোধিনী সভা হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে রামমোহনের "দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন"-এর চারি সংখ্যাকে অনুকরণ করিয়া এবং তাহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধার করিয়া "দি বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্ ভিনডিকেটেড্" নাম দিয়া চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এই অনুকরণ কখনই মূলের সমতুল্য হইতে পারে নাই। তত্ত্ববোধিনী শুধু এইমাত্র বলিলেন যে, নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনার পক্ষপাতী যে রাজা রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যা, তাহা কোনমতেই একপেশে নয়, (পাদ্রীগণ রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যা একপেশে বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন) কেননা রাজা রামমোহন হিন্দুর মূর্তিপূজারও একটা ব্যাখ্যা "দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন"-এ দিয়াছেন। ঐ মূর্তিপূজা, মূর্তিতে ব্রহ্মের আরোপ থাকা বিধায়, প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মপূজাই হয়। আর মূর্তি-পূজা দ্বারা হিন্দুগণ সর্বব্যাপীতাই প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনীর সিদ্ধান্তে নূতন কিছুই বলা হয় নাই। বরং রাজার পুরাতন কথাই প্রকৃষ্টরূপে বলা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মূর্তিপূজা সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ তত্ত্ববোধিনীতে বিশেষ কিছু হয় নাই। তথাপি সংস্কারযুগে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তবে তিনি রাজা রামমোহনের যুক্তি ও সিদ্ধান্তকে বিশদ্‌রূপে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। কেননা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ, কেবল প্রতিবাদ মাত্র। কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, কি লোক-ব্যবহার, কি ইহার উদ্ভবের কারণ এ সম্বন্ধে রাজা রাম-মোহনের মত সমস্ত দিক দিয়া আলোচনা করিয়া তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। তবে মূর্তিপজুার নিরসনকল্পে উপনিষদের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথে বিশেষরূপে কার্য-করী হইয়াছে। আমার এইরূপ ধারণা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিতান্ত অনুগামী রাজনারায়ণবাবুও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোন নূতন যুক্তি দিতে পারেন নাই এবং এবং জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার দত্তও মূর্তিপূজাকে এই বৈজ্ঞানিক যুগের নিতান্তই অনুপযোগী বলিয়া অস্বীকার মাত্র করিয়াছেন। তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। প্রত্যক্ষ-বাদের দিক হইতে এই কথা বলা যায় যে, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" ইহা দেবোপম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ তাহা নিশ্চিতই এই রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আর মূর্তি, আকারবিশিষ্ট জড়পদার্থ। সুতরাং ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ আর মূর্তি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। কাজেই ঈশ্বর মূর্তি হইতে পারেন না বা ঈশ্বরেরও মূর্তি হইতে পারে না।

ইহাদের পরেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে অনেকগুলি স্তর আছে। প্রত্যেক জীবনই যাহা বিকাশের ধারাকে অনুসরণ

করিয়া অগ্রসর হয়, তাহার মধ্যে একের পর আর বিকাশের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের শেষ স্তর, যাহা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সময় হইতেই এক অভিনব বিকাশে আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইতেছিল, তাহার কথা আমি বলিয়াছি। এই স্তরে হিন্দু দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্রে অতিমাত্রায় দেখা দেয়। তাঁহার ব্রহ্মোপাসনায় রূপের ধ্যানের যথেষ্ট অবসর আছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মূর্তিপূজা-বিরোধী হইলেও তাঁহার ধর্মজীবনের এমন একটা আধ্যাত্মিক মত্ততা ছিল যে সমন্বয়যুগের রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণের সাধনার কতকাংশ বা তাহার অনুরূপ আমরা ব্রহ্মানন্দের জীবনে দেখিতে পাই। ব্রহ্মানন্দের "আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা", "মহাবিদ্যার পূজা", "লক্ষ্মীপূজা", "নিরাকার গণেশ-পূজা", "জয়শক্তিরূপী কার্তিকের পূজা"—এইগুলিতে ব্রহ্মানন্দের সাধক জীবনের বৈশিষ্ট্যের উপর সমন্বয়যুগের একটা ছাপ রহিয়াছে। কেশবচন্দ্রের দৈনিক প্রার্থনা হইতে অতি সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"মা, এই তবে বলি যদি পাগলী হয়ে আমার মাথা খেলি, তবে এই দলশুদ্ধ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়াশুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। আর বাকি রইল কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। মাতাল ক'টা বসে আছে আর মদ যোগাচ্ছ। প্রেম-সুরা যোগাচ্ছ।"

ইহা কি অনেকটা রামকৃষ্ণের উক্তির অনুরূপ নহে? একই শ্রেণীর প্রার্থনা নহে? "হাস্যময়ীর পূজা"তে ব্রহ্মানন্দের পরমহংসদেব হইতে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"পূর্ণ হাসিতে যে হেসেছে তারই জীবন সফল। যে হেসেছে সেই টেঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে আমার কাল ঠোঁট সিঁদুর হয়ে গেল। হাসিতে কেঁপে উঠলো, একি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশে যাব। তুমি হাস, তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে যাই।"

সমগ্র সংস্কারযুগে এই শ্রেণীর ধর্মানুভূতির তুলনা নাই। ইহা অনুপম। ইহা কাব্য, ইহা ধর্ম, ইহা অনুভূতি, ইহা হয়ত বা সাক্ষাৎ দর্শন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনেই খৃষ্টধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি হুবহু খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন নাই। ব্রহ্মানন্দের খৃষ্টধর্মের পক্ষপাতিতায়, খৃষ্টধর্ম ব্যাখ্যায় এবং ভারতবর্ষে খৃষ্টের প্রয়োজন নির্ধারণ বিষয়ে, তিনি কেবল পাদ্রীদের কথারই প্রতিধ্বনি করেন নাই, পরন্তু অনেক স্থলেই পাদ্রীদের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং নিজের বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন। এই খৃষ্টধর্মের মতবাদ দ্বারা চালিত হইয়াই ব্রহ্মানন্দ অনেকাংশে হিন্দুর মূর্তিপূজাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন যেমন ষোল বৎসর বয়সেই অনেকটা মুসলমান ধর্ম দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হিন্দুর মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও তেমনি অতি অল্প বয়সে খৃষ্টান-ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া হিন্দুর মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বেদান্তাদি হিন্দুশাস্ত্রকে বহু পরিমাণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তখন কেশবচন্দ্র হিন্দু-শাস্ত্রাদি পাঠ করেন নাই।

কিন্তু আবার রাজা রামমোহন যেমন বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি শাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া, মূর্তিপূজার বিরোধী তাঁহার স্থূল মতটিকে অব্যাহত রাখিয়াও, মূর্তিপূজার এক অতি নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়া অধিকারীভেদে শক্তির পক্ষে ও সমাজের পক্ষে তাহার সাময়িক প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও প্রথম-জীবনে "ব্রাহ্ম সমাজবাদে ফেয়ারওয়েল টু বেদান্ত" বলিয়াও পরবর্তী জীবনে আবার "আমাদের বেদান্তে ফিরিয়া আসা" প্রভৃতি বলিয়া —পরে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য এবং তাঁহার ভক্তিমূলক ভাব-প্রবণ উদার হৃদয়ের ক্রমবিকাশের জন্যও তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিডন উদ্যানে হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবীর যেরূপ রূপক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মসাধনায় যেরূপ সগুণ ব্রহ্মবাদ, অবতারবাদ, আদেশবাদ ও তদনুযায়ী ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে রাম-মোহন যেমন সিদ্ধান্তের দিক হইতে, কেশবচন্দ্র সেই প্রকার সাধনের দিক হইতে মূর্তিপূজাকে রূপকভাবে অনেকটা স্বীকারই করিয়াছেন। রামমোহন জ্ঞানী ছিলেন, কেশবচন্দ্র সাধক বা ভক্ত ছিলেন। সংস্কারযুগের সর্বপ্রথম জ্ঞান ও সর্বশেষ সাধনায় রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের পরিণত জীবনে, আমরা মূর্তিপূজা সম্বন্ধে যে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত ও সাধন লক্ষ্য করি, তাহা মূলতঃ মূর্তিপূজার বিরোধী হইলেও, সাধারণতঃ সংস্কারযুগ মূর্তিপূজাকে যে বালকোচিত চাঞ্চল্য, অসহিষ্ণুতা ও ধৃষ্টতা দ্বারা ধিক্কৃত করেন, তাহা হইতে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের মূর্তিপূজার সিদ্ধান্ত নিতান্তই পৃথক। ঐতিহাসিক ও পারি-পার্শ্বিক ঘটনাসমূহের আলোড়নে যে সমস্ত পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম মাত্র।

ইহার পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থভাগের প্রথমেই, সংস্কারযুগের প্রভাব প্রতিপত্তি শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর হইতে বহুল পরিমাণে স্খলিত হয় এবং এই সময়েই রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয় হওয়াতে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি ব্রাহ্ম-সংস্কারক-দিগকে অতিক্রম করিয়া, পরমহংসদেবের উপর পতিত হয়। সত্যই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সংস্কারযুগের অবসানে বাঙ্গলাদেশে রামকৃষ্ণযুগের সূচনা দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগের সর্বপ্রথম প্রচারক, এই জন্য এই যুগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলিতে আমি দ্বিধাবোধ করি না। এই রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ যুগেই, . প্রথম জীবনের উগ্র ব্রাহ্ম গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, মূর্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঢাকার গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গলে গিয়া সাধকদের পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে আসন করিয়া বসিয়াছিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী যেমন সংস্কারযুগের অন্তে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া থাকেন, তেমনি ঢাকার গেণ্ডেরিয়ার নির্জন আশ্রমে ও পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে জটিয়া বাবা অর্থাৎ গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের সমাধিমন্দিরে তীর্থযাত্রীর মতই গমন করেন। মূর্তিপূজক রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের ধর্মজীবনে পৌরাণিক যুগের অবতারবাদের পুনরভ্যুত্থান। ইহা সংস্কারযুগের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, সিদ্ধ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের মহিমাকে আমি যথাযথ গৌরব দিতেছি না। বস্তুতঃ এই যুগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ না বলিয়া, রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ যুগ বলাই অধিকতর সমীচীন। সংস্কারযুগ যেমন রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও কর্মকুশলতা দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল, সংস্কারযুগের অন্তে এই সমন্বয়যুগও তেমনি রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারাই প্রকট হইয়াছে।

কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাব লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ সভ্য-জগৎকে আলোড়ন করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালাদেশে ও ভারতবর্ষে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণের ভাব লইয়া সেরূপ কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। বিজয়কৃষ্ণের বিবেকানন্দ নাই। রামকৃষ্ণদেবের সহিত বিজয়কৃষ্ণের ঘনিষ্টতার বিষয় আপনারা সকলেই জানেন। তথাপি যদি বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে রামকৃষ্ণ অপেক্ষা সাধনায় ও মতে পার্থক্য নহে, বিশেষত্ব কিছু থাকে, তবে কোন বাঙ্গালী আজ পর্যন্ত তাহা দেখাইতে সক্ষম হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে রামকৃষ্ণের মহিমা ও প্রভাব যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের মত প্রচারকের অভাবে বিজয়কৃষ্ণের প্রভাব সেরূপ বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই জন্যই সংস্কারযুগের অন্তে সমন্বয়যুগকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রভাবের প্রতিপত্তি ও দাবীই অধিক। যাহা অস্পষ্ট, ফুটিতে পারে নাই, তাহা ইতিহাসে সর্বত্রই অল্পাধিক উপেক্ষিত।

সংস্কারযুগের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের মূর্তিপূজার সম্বন্ধে বা মূর্তিপূজা-বিরোধী মতবাদ রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পর্যন্ত। এক্ষণে সংস্কারযুগের অন্তে—রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসাধনা ও সিদ্ধান্তে মূর্তিপূজা কিরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহাই বিবেচ্য এবং সেই সম্পর্কে বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত ও সাধনার বিশেষত্বও আমাদিগের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম তবে আমি কোথায় থাকিতাম?" সুতরাং বাঙগালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগ মূর্তিপূজাকে যেরূপভাবে নিন্দা করিয়াছে ও ধিক্কার দিয়াছে, তাহার বিশিষ্টরূপ প্রতিবাদ এক মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণ দ্বারাই সংস্কারযুগের অন্তে সূচিত হইয়াছে।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিপূজক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে মোক্ষমূলর যে জীবনচরিত লিপিবন্ধ করিয়া, চিরদিনের জন্য আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপূজা সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্র বাঙগলায় অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—

"শাস্ত্রে এরূপ নির্দিষ্ট আছে যে দেবদেবী পূজার সময় নিজের মাথায় একটি পুষ্প ধারণ করিয়া যে দেবদেবী পূজা করা হয়, নিজেকে সেই দেবদেবীরূপে ভাবিবে। ঐ বিধানে রামকৃষ্ণদেব যখনি মস্তকে পুষ্পধারণ করিয়া নিজেকে মা কালীরূপে ভাবনা করিতেন তখনি তাঁহার সমাধি হইয়া যাইত, অনেক সময় পর্যন্ত তিনি সে অবস্থায় থাকিতেন। আবার কোন কোন সময়ে তিনি নিজেকে কালীরূপে ভাবিয়া, আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতেন এবং দেবীর জন্য যে সকল নৈবেদ্য ও আহার আনা হইত তাহা খাইয়া ফেলিতেন। কোন সময়ে দেবী-মূর্তির পূজা বিস্মৃত হইয়া নিজেকেই ফুল দিয়া পূজা করিতেন।"

পরমহংসদেব এই কালীমূর্তির সম্মুখে বারো বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে আচার্য মোক্ষমূলর প্রণীত জীবনচরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বারো বৎসর ব্যাপিয়া তিনি যে সকল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহে। জীবনের শেষদশায় ঐ সকল কঠোর তপস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, ঐ বারো বৎসর ব্যাপিয়া যেন কোন ধর্মের ঘোর তুফান তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া তাঁহাকে তোলপাড় করিয়াছিল এবং সকল যেন উল্টা-পাল্টা করিয়া দিয়াছিল। ঐ তপস্যা যে এত দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। ঐ বারো বৎসরের মধ্যে সুনিদ্রা হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার তন্দ্রাও হইত না। তাঁহার চক্ষু সর্বদাই খোলা ও স্থিরদৃষ্টিতে থাকিত। ইহা দেখিয়া তিনি মনে করিতেন বোধ হয় তাঁহার কোন ভয়ানক অসুখ হইয়াছে এবং নিজের সামনে আয়না লইয়া চক্ষের কোটরের মধ্যে অঙগুলি দিয়া চক্ষের পাতা বুজাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোনরূপেই আর চক্ষের পাতা পড়িত না। ইহা দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, ও মা, তোমাকে ডাকা ও তোমাকে বিশ্বাস করার ফল শেষে কি এই দাঁড়াইল।" ইহার

পরেই তিনি এক সুমধুর আকাশবাণী শুনিতে পাইতেন, সুমধুর হাস্যকারী মায়ের মুখ তিনি দেখিতে পাইতেন, তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "বাছা, যদি তোমার শরীরের ও ক্ষুদ্র আমিত্বের ভালবাসা না ছাড়িতে পার, তবে কিরূপে তুমি সেই সর্বোচ্চ সত্য সাক্ষাৎ করিতে আশা করিতে পার?" তিনি বলিতেন, সেই সময় যেন স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ শতধারায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিত এবং আরও অগ্রগামী হইতে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিত। তিনি মা কালীকে বলিতেন. "মাগো! আমি বিপথগামী লোকের নিকট কিছু শিখিতে চাই না, তোমার কাছে মা, তোমার নিজের কাছেই সকল শিখিব।" সুমধুর স্বরে মা বলিতেন, "বাছা, তাহাই হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এ যুগের মূর্তিপূজার একখানি জীবন্ত আলেখ্য। আর একটি জীবন্ত আলেখ্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। তিনি বহু বৎসর অতি দৃঢ়তার সহিত ব্রাহ্মধর্ম সাধন ও প্রচারের পর যখন বৈষ্ণবধর্মে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেবদেবীর মূর্তির সম্মুখে তাঁহার ব্রহ্মস্ফূর্তি ও ব্রহ্মানুভূতি এবং ব্রহ্ম সমাধি হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মগণ এজন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট এই প্রকার দূষণীয় আচরণের জন্য এক কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তর করিলেন, দেবদেবীর সম্মুখে যদি তাঁহার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, তবে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন কিরূপে? কিন্তু কিরূপে যে তিনি তাহা নিবারণ করিবেন তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বা প্রণালীর কথা ব্রাহ্ম-প্রচারকগণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া ক্রমে বিজয়কৃষ্ণের নাম তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের খাতা হইতে কাটিয়া দিলেন! ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ মরিলেন। কিন্তু সিংহ বিজয়কৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইল। সেই জটাকেশরে শোভমান, ধর্মকেশরী, গেণ্ডেরিয়ার গহন বনে, নির্জন গরিমায় সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

লক্ষ ফকীর-দরবেশের কবরের উপর, গেণ্ডেরিয়ার সেদিনের ভয়াবহ বিশাল অরণ্যানী বিজয়কৃষ্ণকে ঢাকিয়া ফেলিল। আর কতদিন কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। লক্ষ মৃতের উপর জীবিতের এ কি আশ্চর্য শব-সাধনা! রাত্রি গেল, দিন গেল, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত একের পর আর গেণ্ডেরিয়ার অরণ্যভূমিকে কম্পিত করিয়া গেল, কিন্তু স্থির অকম্পিত হৃদয়ে বাঙ্গালার এক সিংহ একাকী সেই জঙ্গলে বসিয়া রহিল।

তারপর একদিন প্রভাতে সিংহ জঙ্গল ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বাঙ্গালী দেখিল যে তাহার প্রাণধর্ম মূর্তি পাইয়া আবার নগরে নগরে হরিনাম বিলাইয়া চলিয়াছে। কে ইহা করিল? কিসে ইহা হইল?

নগরে নগরে, তীর্থে তীর্থে, সংকীর্তন গর্জিয়া চলিল, বাঙ্গালীর ষোড়শ শতাব্দীর সেই বিস্মৃত পরিত্যক্ত আরাব আবার আকাশ কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল। বাঙ্গালী দেখিল যে, সে মরে নাই, বাঙ্গালী জানিল যে, তাহার মৃত্যু নাই। সংস্কারযুগের মূর্ছা—শুধু মূর্ছা মাত্র। হয়ত বা কে জানে—জাতীয় জীবনে এই মূর্ছারও প্রয়োজন ছিল।

বৈষ্ণবধর্মের যুগাবতার বিজয়কৃষ্ণ তীর্থে চলিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মূর্তির সম্মুখে, তাঁহার ব্রহ্মস্ফূর্তি হইয়া সমাধি হইল। তিনি নদীয়ার ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর মূর্তির সহিত বিজয়কৃষ্ণ কথা বলিলেন। তারপর বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দেখিয়া আবার ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া তিনি জীবনের ভ্রমণ শেষ করিতে শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথে গিয়া উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম, দারুব্রহ্ম, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গ্রহণ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ মহাপ্রভুর তিরোভাবের পবিত্র ধূলিতে দেহরক্ষা করিলেন। এই বিজয়কৃষ্ণও মূর্তিপূজক।

সংস্কারযুগের মূর্তিপূজায় বিরোধীর সিদ্ধান্ত এই বিজয়কৃষ্ণের সাধনা প্রতিবাদ করিল। মূর্তিপূজায় শ্রেণীভেদের প্রয়োজন দেখা দিল।

স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কারযুগের সহিত সম্যক্ পরিচিত থাকিলেও, তিনি বিশেষভাবে এই রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের সাধন-যুগের সন্তান ও প্রচারক। কাজেই তিনি মূর্তিপূজাকে শাস্ত্রীয় বিচারে ঠিক রাজা রামমোহনের মতই নিম্নাধিকারীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "মূর্তিপূজা পাপ নহে," আর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম?"

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, শংকরানুগামী এ যুগের দ্বিতীয় শংকর এবং সন্ন্যাসী। তিনি আবার দেবদেবীর মূর্তিকে রূপক-ভাবে গ্রহণ করিবেন কি? সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই ত তাঁহার নিকট একটা রূপকের স্ফোটক মাত্র। কিন্তু ইহা জানিয়াও এবং শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে রাজা রামমোহনের অনুরূপ মূর্তিপূজাকে নিম্নাধিকারীর জন্য আবশ্যক বলিয়াও, তিনি নিজে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনায় উহার বিরোধী তো ছিলেনই না, পরন্তু বিশিষ্টরূপেই মূর্তি-পূজক ছিলেন। ইহার কারণ কি? আমার ধারণা যে এই শ্রেণীর মূর্তিপূজকদের নিকট মূর্তি, অমূর্তের ধ্যানে বা সমাধিতে বাধা দেয় না, দিতে পারে না।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গোৎসবও করিয়া গিয়াছেন। আর এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে বালক দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা রামমোহনকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন সিংহগ্রীব রামমোহন মুখ ফিরাইয়া সতেজে উত্তর করিয়াছিলেন, "কি, আমাকে নিমন্ত্রণ" বালক দেবেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহা স্মরণ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংস্কারযুগে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মূর্তিপূজার বিরোধী এবং ইঁহারা কেহই মূর্তিপূজা করেন নাই। সমন্বয়-যুগে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ইঁহারা কেহই উহার বিরোধী নহেন এবং সকলেই মূর্তিপূজা করিয়া এবং তাহার মধ্য দিয়াই, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ফেলিবার নয়, তেমনি রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দও ফেলিবার নয়। যদি তাহাই হয় তবে মূর্তিপূজা সমস্যার কি মীমাংসা হইল, ইহাই প্রশ্ন।

ইহা অপেক্ষাও বড় প্রশ্ন এই যে, মূর্তিপূজা যদি রামমোহনের মতে কেবল নিম্নাধিকারীর জন্যই বিধেয় হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যদি ইহার আর কোনই প্রয়োজন না থাকে তবে কি বুঝিতে হইবে যে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ধর্ম-জগতের নিতান্ত নিম্নাধিকারী নয়ত, তাঁহাদের শেষ পর্যন্ত কোন ব্রহ্মজ্ঞানই হয় নাই? আর যদি তাঁহাদের সামান্যও ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন নাই কেন? রাজা রামমোহন বলিয়াছেন যে সমাধি বা মুক্তির পরেও জীবের নিকট ব্রহ্ম সাধনীয় থাকিয়া যান। ইহা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ নহে। আচার্য শঙ্করের অভিপ্রেতও নহে। শঙ্করানুগামী রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্তের ইহা একটা বৈশিষ্ট্য। রামমোহনের রচনাবলীর মধ্যে রামানুজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কতকাংশে রামানুজের মতানুযায়ী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কিন্তু বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শঙ্করাচার্যকেই অনুসরণ করিয়াছেন। রামানুজকে নহে। অথচ শঙ্করকে অনুসরণ করিয়াও রামানুজী সিদ্ধান্ত রামমোহনে কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক জীব ব্রহ্ম অভেদ জানিয়াও জীব ব্রহ্মে ভেদমূলক সাধনের অবসর যদি রামমোহন কল্পনা করিলেন তবে মূর্তির সাহায্যে পরে পরে চেষ্টা করিয়া অমূর্তের ধ্যানে চিত্ত স্থির হইলেও, মূর্তির সাহায্য একেবারে তিরোহিত হইবে কেন? ইহা ধর্মজীবনের বিকাশের পথে মনস্তত্ত্বের এক নিগূঢ় রহস্য, অতীব বিচিত্র!

এক্ষণে আমার অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। আমার ধারণা এইরূপ যে,

(১) মূর্তির সহায়তা দ্বারা কখনই ঈশ্বর লাভ হইবে না ইহাই যাঁহাদের মত তাঁহারা জ্ঞানী হইতে পারেন, এমন কি সাধনাঙ্গেও উচ্চ অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা একদেশদর্শী।

(২) তাঁহারা নানারূপ তর্ক ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা উত্থাপন করিতে পারেন, এবং তাহা কেই বা না পারে; কিন্তু এ বিষয়ে শুধু তর্ক অপেক্ষা জগতে যাহা ঘটে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণের মূল্য তর্ক হইতে অনেক বেশী। মূর্তির সাহায্য দ্বারাও ঈশ্বর লাভ হয়।

বাঙালীর সংস্কারযুগের অন্তে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মূর্তি-পূজাকে লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ বলেন, তাঁহারা মূর্তিপূজক ছিলেন কাজেই তাঁহারা ভ্রান্ত সাধনায় বৃথা কালক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম লাভ কদাপি হয় নাই অথবা তাঁহারা ধর্মজগতের নিতান্তই নিম্নাধিকারী তবে তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক হইবে যে, 'তোমাদের জিহ্বাকে সংযত কর' এবং আরো অধিক জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর।

(৩) অন্যপক্ষে মূর্তিপূজা ভিন্ন ধর্মসাধনায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারাও দিগ্দর্শন মাত্র করিতেছেন। কেননা ইতিহাস যেমন মূর্তিপূজক সাধককে দেখায়, তেমনি এই ইতিহাসই অমূর্তের উপাসক যে সাধক তাঁহার সহিতও আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়। মহম্মদের কথা নাই তুলিলাম, কিন্তু নানক, কবীর ইঁহারা ভারতবর্ষের মাটিতেই জন্মিয়াছিলেন, ইঁহারা কলমের গাছ ন'ন, এই মাটি, এই দেশের বীজ ইঁহাদিগকে জন্ম দিয়াছিল। তাঁহারা যুগ প্রয়োজনেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারাও জাতির, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ এবং ইঁহারা রাজা রামমোহনের মত শুদ্ধ প্রণালীবদ্ধ যুক্তি-তর্ক বাগ্বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া শাস্ত্রবিচার দ্বারা অমূর্তের পূজা প্রতিপন্ন করিয়া যান নাই, তাহা অপেক্ষাও যাহা বড়, জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি দ্বারা এই সমস্ত স্মরণীয় সাধকগণ অমূর্তের পূজা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং ধর্মজীবনের প্রথম হইতেই মূর্তির সাহায্য না লইয়া অমূর্তের ধ্যানে ইঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন।

রুচি-ভেদে, প্রকৃতি-ভেদে, অধিকার-ভেদে বিভিন্ন সাধক কেহ বা মূর্তির সাহায্যে, কেহবা মূর্তি-নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম জগতে বিচরণ করেন। মূর্তির সাহায্য লওয়াতে কোনরূপ নিন্দা নাই অথবা মূর্তি-নিরপেক্ষ হওয়াতেও কোনরূপ হানী নাই। ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারিলেই হইল এবং পর পর যত্ন করিয়া মানসিক বিকাশের পথে উন্নতিমুখী ধর্মজীবনের নানা বিঘ্নসঙ্কুল গতিকে অব্যাহত রাখিতে পারিলেই হইল। ধর্মজীবন একটা গতি-মুক্তি। অনন্ত বিকাশ, ইহার শেষ নাই।

(৪) মূর্খ লোকেরা মূর্তির সাহায্য লয় আর বুদ্ধিমানেরা অমূর্তের সাহায্য গ্রহণ করে, ইহাও নিতান্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। অমূর্তের উপাসনা কেবল অনেক মূর্খ ব্যক্তি কেন, মূর্খ জাতি সকলকেও গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে, আবার অনেক অতি কুশাগ্র ধী-সম্পন্ন দার্শনিকগণ মূর্তির সাহায্য লইতে লজ্জা বোধ করেন নাই, এবং বাঙ্গালী হিন্দুর মত—তা সে বৈষ্ণবই হোক, আর তান্ত্রিকই হোক, নৈয়ায়িক বা স্মার্ত পণ্ডিতই হোক বা ঘোর বেদান্তীই হোক—অতি বুদ্ধিমান জাতিও মূর্তির সাহায্য লইতে সঙ্কোচবোধ করে নাই। সুতরাং মূর্ত এবং অমূর্ত পূজায় বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য জ্ঞান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রত্যেক ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির দৃঢ়তা বা তাহার অন্যথার উপরেই বুদ্ধি বিবেচনা বা জ্ঞানের তারতম্য তুলনা করা যাইতে পারে।

(৫) শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি নয়, নৈতিক বল সম্বন্ধেও মূর্ত বা অমূর্তের উপাসক-দিগের সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলিতে চাই। এক ব্যক্তি মূর্তিপূজক বা একটা জাতি মূর্তি উপাসক, শুনিবামাত্রই সেই ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক চরিত্র বা বল সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ বিশেষ ধারণার বশবর্তী হইতে পারি না। মূর্তি-

পূজক জাতিদের মধ্যেও এমন নৈতিক বল ও সততার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহা অমূর্ত-উপাসক জাতি মাত্রের মধ্যেও গোচরীভূত হয় না।

সংস্কারযুগের একটি প্রধান ত্রুটি এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীজাতির বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিকবলের যে সমস্ত ব্যতিক্রম অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পূর্ব হইতে, জাতির নানা কারণে একটা অবসাদের সময় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাহা সমস্তই আমাদের মূর্তিপূজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে সংস্কারকগণ দ্বিধাবোধ করেন নাই! কিন্তু তাঁহারা না করিলেও আমরা এখন তাহা করিতেছি। ভ্রান্ত মূর্তিপূজা কেবল অজ্ঞানের হেতু নহে, অজ্ঞানের ফল।

রাজা রামমোহন বলিয়াছেন, হিন্দুধর্ম অপেক্ষা খৃষ্টানধর্মে নীতিচর্চার অবসর বেশী, আমরা তাহাও, একদেশদর্শী অথবা কেবল দিক্‌দর্শী সিদ্ধান্ত বলিয়া, স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুধর্মের নীতিবাদ, হিন্দুর ধর্মচিন্তার সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত আছে। হয়ত অবসাদের আবর্জনা হইতে তাহার সম্যক্ উদ্ধার হয় নাই।

(৬) মূর্তিপূজা মাত্রই—জাতি, সভ্যতা, ও সামাজিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরকে উপেক্ষা করিয়া এক পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা, সমাজবিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। কেননা বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মূর্তিপূজা বাহ্যতঃ এক বলিয়া মনে হইলেও তাহাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য বিদ্যমান। মূর্তি-পূজায় স্তরভেদ আছে। প্রত্যেক বিভিন্ন স্তর মানসিক বিকাশের পর পর সোপানের সহিত অনুস্যূত।

আমাদের গৌড়ীয় মূর্তিপূজার আলোচনা প্রসঙ্গে এই মূর্তিপূজার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কি সংস্কারযুগ, কি সমন্বয়যুগ কোনযুগেই সভ্যতার স্তরভেদে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক বিশদ সমালোচনা হয় নাই। আর শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা ডফ্‌ ও তদনুবর্তী খৃষ্টান পাদ্রীরা এবং বলিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হয় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক রাজা রামমোহন ব্যতীত তদ্ভাবে ভাবিত ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণও এ বিষয়ে কোনরূপ দূরদৃষ্টি বা অপক্ষপাত আলোচনার পরিচয় দেন নাই। ইঁহারা সকলেই একসঙ্গে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে নিগ্রোদের কালপাথর পূজা (ফেটিসিজম) আর হিন্দুর শিব-লিঙ্গ বা নারায়ণ শালগ্রাম শিলাপূজা একই বস্তু। দুইই পাথর সুতরাং দুইই পাথর পূজা। ইহার উপাসকগণ একই শ্রেণীর পৌত্তলিক বা মূর্তির উপাসক।

কিন্তু রাজা রামমোহনের যুক্তিকেই অনুসরণ করিয়া যদি দেখি, তবে জাতি-ধর্ম ও সভ্যতার স্তর নির্বিশেষে সকল দেশীয় সকল জাতীয় মূর্তিপূজাকেই এক পংক্তিতে বসাইয়া বিচার করিলে বস্তুতঃই অবিচার করা হইবে। ধর্মের বিশ্লেষণে, এই অবিচার করা হইয়াছে। তথাকথিত পাথর পূজার মধ্যেও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া

স্তরভেদ বা শ্রেণীভেদ আছে। ইহা অতি সহজ কথা যে পাথর এক হইলেও এই পাথরের উপর মন যাহা আরোপ করে তাহা পাথর নহে। সেই আরোপিত ঈশ্বর-জ্ঞান বা ঈশ্বরধারণা কদাপি এক নহে। পূজায়, পাথর গৌণ, আরোপিত ব্রহ্মজ্ঞানই মুখ্য।

রাজা রামমোহন বলেন, মূর্তিতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া উপাসনা করিলে, "মুখ্যতঃ মূর্তির উপাসনা করা হইলেও গৌণভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়।" আমরা বিশ্বাস করি যে এরূপ উপাসনায় মুখ্যভাবেই ব্রহ্মোপাসনা হয় আর মূর্তি উপাসনা গৌণভাবেই হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মই মুখ্য উপাস্য, তাঁহাকেই মূর্তিতে আরোপ করা হয়, কাজেই মূর্তি উপাসনা গৌণ হয়।

তা যাহাই হোক, হিন্দু নারায়ণশিলায় ব্রহ্মকেই আরোপ করেন এবং নারায়ণ শিলায় ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন তা মুখ্যই হোক, আর গৌণই হোক। নিগ্রোজাতি তাহাদের পূজ্য কালপাথরে এইরূপ কোন ব্রহ্মের আরোপ করেন কিনা বিবেচ্য। যদি তাহা করেনও তথাপি জাতীয় পার্থক্য হিসাবে, সভ্যতার স্তরের পার্থক্য হিসাবে, নিগ্রোজাতির ব্রহ্মধারণা এবং হিন্দুজাতির ব্রহ্মধারণা কদাপি এক নহে। সুতরাং উভয় জাতির কালপাথর এক হইলেও হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মের ধারণা যাহা এই কালপাথরে আরোপিত হইয়া পূজিত হয়, তাহা পরস্পর পৃথক হওয়াতে, উভয় জাতির মূর্তিপূজার বাহ্য সাদৃশ্যের অন্তরালে, বিশেষরূপে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। সংস্কারযুগের মূর্তিপূজাবিরোধী সমালোচকগণ ইহা প্রকৃষ্টরূপে অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

(৭) বাঙ্গালীর মূর্তিপূজার একটা বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব, বাঙ্গালী শাক্ত। বাঙ্গালীর বৈষ্ণব-সাহিত্য ও তান্ত্রিক-সাহিত্য যিনি ভালরূপে আলোচনা করিবেন, তিনিই মূর্তিপূজার বৈচিত্র্যের মধ্যেও বাঙ্গালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইবেন।

রাজা রামমোহন যে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাহিত্য আলোচনা করেন নাই এমন নহে। তিনি বেদান্তের আত্মোপাসনারূপ ব্রহ্মোপাসনার সহিত পুরাণতন্ত্রের ধর্মের একটা নবযুগোপযোগী সমন্বয় সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এ চেষ্টা যে কতবড় চেষ্টা, তাহা বুঝিতে পারাও সকলের পক্ষে সমান সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু তাঁহার মীমাংসাও চূড়ান্ত মীমাংসা বা একমাত্র মীমাংসা বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। কেননা—

১) তাঁহার তন্ত্রালোচনায় পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়াছে। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন, শাক্ত-প্রিয় ছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের অদ্বৈতাবাদ ও শক্তিবাদ হয়ত তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। বোধ হয়, তন্ত্রের অদ্বৈতবাদ ও শক্তিবাদের সহিত তিনি বেদান্তের বিশেষভাবে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সামঞ্জস্য সহজেই করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভাবিয়াছেন।

২) তাঁহার বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনায় বিশেষভাবেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এবং লীলাবাদের সহিত তাঁহার বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে ও মায়াবাদকে মিলাইতে পারেন নাই। কোন সঙ্গত সামঞ্জস্যও করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং বৈচিত্র্যও স্বীকার করিতে সক্ষম হন নাই।

কাজেই শঙ্কর-পন্থী রামমোহন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকের মূর্ত্তিপূজার কোন বিশেষত্ব আমাদিগকে ফুটাইয়া দেখাইতে পারেন নাই। কেবল শাস্ত্রমত ও যুক্তিমত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি শাক্ত-বৈষ্ণবের মূর্ত্তি-পূজার মধ্যে কেবল এক ধর্মকলহ দেখিয়াছেন। এক শ্রেণীর নিম্নসাধকেরা হয়ত এইরূপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোন ধর্মের নিম্নাধিকারীরা যাহা করে তাহা দ্বারা সেই ধর্মের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

প্রকৃত শাক্ত কখন বৈষ্ণববিদ্বেষী হন না। প্রকৃত বৈষ্ণবকেও কখন শাক্তবিদ্বেষী হইতে দেখা যায় না। রামমোহনেও এ কথার আভাস আমরা পাই।

রামমোহনের পূর্বে বঙ্গসাহিত্যের দুই কবি ও সাধক ইহার দৃষ্টান্ত। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি। ইঁহারা দুইএ এক, একে দুই। ইঁহারা দিয়া গিয়াছেন। আর রামমোহনের অব্যবহিত পূর্বে কালীভক্ত রামপ্রসাদও বৈষ্ণব-সাহিত্যকে কোন কোন দিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন! শ্যাম ও শ্যামা দুইয়ে এক এবং একে দুই ইহা বাঙ্গালী চিরদিনই জানে।

মহাকাল কালী শ্যামা শ্যাম তনু একই সকল বুঝিতে নারি।
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলি শ্যামা এবে প্রিয়তর যমুনাবারি॥

চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি। ইঁহারা দুইএ এক, একে দুই। ইহারা বিচিত্র কিন্তু বিরোধী নন। ইঁহাদের ভেদ নাই, ইঁহারা অভেদাত্মক। ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালী, উভয়েই মূর্ত্তিপূজক!

রামমোহনের পরে রামকৃষ্ণ মাতৃভাবে কালীসাধন করিয়াছেন এবং বিজয়কৃষ্ণ কান্তভাবে যুগল উপাসনা করিয়াছেন। তথাপি ইঁহারা বিরোধীয় হন নাই শুধু বিচিত্র হইয়াছেন। "কালীকে ঘিরিয়া কৃষ্ণ আর কৃষ্ণকে ঘিরিয়া কালী" বাঙ্গালীর এই অচিন্ত্যভেদাভেদ ইঁহারা রামমোহনের পরেও জাতির সম্মুখ জীবনে সাধন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ অভেদ কেননা ইঁহারাও দুই জন বাঙ্গালী। বাঙ্গলার চিরন্তন বিচিত্র সাধন তাহাদের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া অথচ কিছুমাত্র বিরোধীয় না হইয়া ইঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! ইঁহারাও মূর্ত্তিপূজক।

রাজা রামমোহন মুসলমানীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাবাদীদের জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া এবং সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র সম্যক্ বিচার করিয়া যে যুক্তিমূলক বিশ্লেষণে বাঙ্গালীর মূর্তিপূজাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় একথা আমি পূর্বেই আলোচনা

করিয়াছি। কিন্তু রামমোহন বাঙ্গালীর মূর্তিপূজার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাই সম্ভবতঃ একমাত্র চিত্র নহে। তাহাতে বিশেষরূপে বাঙ্গালী প্রতিভার বিশেষত্বকে কি সাধন, কি তত্ত্ববিচারের দিক দিয়া উজ্জ্বল করিয়া দেখান হয় নাই। ভ্রান্ত মূর্ত্তিপূজার আবর্জনার উপর শাস্ত্রীয় বেত্রাঘাত হইয়াছে মাত্র। তবে ইহারও প্রয়োজন ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপর রাজা রামমোহন হইতে তুলনায় অধিকতর অপক্ষপাত ও সহানুভূতিমূলক বিচার করিয়াছেন। আর রাজা রামমোহনের মত, স্বামী বিবেকানন্দের এ বিষয়ে আলোচনা সুসংহত নহে। তিনি নানাস্থানে নানাভবে ভাবিত হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাই একত্র করিয়া মিলাইয়া তবে এ সম্বন্ধে স্বামিজীর মতকে আমাদের বিচার করিতে হয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সমন্বয়যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বলিয়া এবং স্বয়ং মূর্তি-পূজক বলিয়া বাঙ্গালীর মূর্তিপূজক তত্ত্বকে, তাহার অনুষ্ঠানকে, কি ধর্ম, কি জাতীয়তার দিক দিয়া, বিশেষরূপে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন এবং মূর্তিপূজার বৈশিষ্ট্য রূপকচ্ছলে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

মূর্তিপূজা এবং রামমোহন ও বিবেকানন্দ

মূর্তিপূজার প্রসঙ্গ দীর্ঘ আলোচনায় এই সমস্যা দীর্ঘ আলোচনা দাবী করিতে পারে। তথাপি এই প্রসঙ্গে রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ তুলনা না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন মূর্তিপূজা বিরোধী হইয়াও সমন্বয়যুগের রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের কোনো কোনোদিকে, অন্ততঃ ধর্মমত্ততার দিকে, অনুরূপ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তেমনি স্বামী বিবেকানন্দও মূর্তিপূজক হইয়া অনেকাংশে মূর্তিপূজার সিদ্ধান্তে, তদ্বিরোধী রাজা রামমোহনের অনুরূপ গবেষণা আমা-দিগকে দিয়া গিয়াছেন। আমি এক্ষণে ইঁহাদের দুইজনের উক্তি ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ধারাবাহিকরূপে সমগ্র শতাব্দীর মধ্য দিয়া এই সমস্যা লইয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন এ যুগে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে দণ্ডায়মান হইয়া-ছিলেন। তিনি সমস্ত শাস্ত্র হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যদিও কোন কোন শাস্ত্রে মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে তথাপি হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রই এক বাক্যে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মই মনুষ্যের উপাস্য। রামমোহন বলেন, এককালে নিরবলম্ব হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার না করিয়া যাহাতে লোকেরা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারে তাহার জন্যই মূর্তিপূজার ব্যবস্থা।

যাহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে সক্ষম, তাহাদের উহা বিধেয় নহে। তাঁহার মতে—

"অজ্ঞানীর মনস্থিরের নিমিত্ত বাহ্যপূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে।"

"কোন কোন ব্যক্তি মনস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্যাদির ধ্যান করেন। যেহেতু স্থূল ধ্যানদ্বারা চিত্তস্থির হইতে পারে।"

"কিন্তু যাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে, আর যাঁহারা জগতের নানাপ্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন—তাঁহাদিগের জন্য মূর্তিপূজার আবশ্যক নাই।"

শুধু মূর্তিপূজা নয়, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও রাজার মতে নিম্নাধিকারীর উপাসনা। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে চিত্তস্থির করিয়া নিষ্ঠা রাখাই হইতেছে প্রকৃত উপাসনা। এই প্রসঙ্গে রাজা বলিতেছেন যে—

"বেদব্যাস বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন"—"বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে—* * কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা. সংহর্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায়, সে কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত।"

সুতরাং কেবল মূর্তিপূজাই রাজার মতে নিকৃষ্ট উপাসনা নহে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও নিকৃষ্ট উপাসনা। যেহেতু তাহা 'কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্তে।' ব্রহ্ম সগুণ হইলেই হয়ত সাকার নাও হইতে পারেন। নিরাকার সগুণ যে ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনাও, রাজা রামমোহনের মতে, প্রকৃষ্ট উপাসনা নহে—তাহাও প্রথম অধিকারীর নিমিত্ত। কাজেই রামমোহন শুধু মূর্তিপূজা নয়, সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকেও "প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত" কহিয়াছেন। যাহা হউক মূর্তিপূজা, সগুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা এবং নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার এই তিনটি ক্রম আমি আপনাদের সম্মুখে রামমোহিনী সাহিত্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইলাম।

এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত কি তাহাও দেখুন।

"—য়ীহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তথাপি তাহাদের কোটি মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে আর্ক নামক একটি সিন্দুক রাখা হইত। আর ঐ সিন্দুকের ভিতর মূশার দশ ঈশ্বরাদেশ রক্ষিত হইত। * * এখন খৃষ্টানদের মধ্যেও ঐ সিন্দুকে ধর্মপুস্তকসমূহ রাখা হয়। রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খৃষ্টানদের মধ্যে প্রতিমা পূজা অনেক পরিমাণে প্রচলিত। উহারা যীশুর মূর্তি এবং তাঁহার পিতা-মাতার মূর্তি পূজা করিয়া থাকে। প্রোটেষ্টাণ্টদের মধ্যে প্রতিমা পূজা নাই, কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে উপাসনা করিয়া

থাকে। উহাও প্রতিমা পূজার রূপান্তর মাত্র। পারসিক ও ইরাণীদের মধ্যে অগ্নিপূজা খুব প্রচলিত। মুসলমানগণ প্রার্থনার সময় কাবার দিকে মুখ ফিরান।"

"—এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে ধর্মসাধনার প্রথম অবস্থায় লোকের কিছু বাহ্য-সহায়তায় প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইয়া আসে, তখন সূক্ষ্মতর বিষয়সমূহে ক্রমশঃ মন দেওয়া সম্ভব হইতে পারে।"

"—এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে যে বাহ্যপূজা অধমাধম হইলেও উহাতে কোন পাপ নাই।"

"—কোন পুরাণেই প্রতিমাপূজাকে উচ্চাঙ্গের উপাসনা বলা হয় নাই।"

"—আমাদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহাতে জড়ের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া উহা অতি নিম্নস্তরের উপাসনা, একথা অতি পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নাই।"

"—এই মূর্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তা বলিয়া উহা অন্যায় কার্য নহে। এই মূর্তিপূজার ভিতরে নানারূপ কুৎসিৎভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি উহা নিন্দা করি না।"

"যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম? যে সকল সংস্কারক মূর্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন—তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দেও কেন?"

সুতরাং আপনারা স্পষ্ট দেখিলেন যে শাস্ত্রীয় ও যুক্তির সিদ্ধান্তে স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তিপূজা, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে একেবারে রামমোহনের অনুরূপ। স্বামিজী যেমন সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে প্রতিমাপূজার রূপান্তর বলিয়াছেন, রামমোহনও তদ্রূপ ইহাকে প্রথম অধিকারী বোধের নিমিত্ত কহিয়াছেন।

তবে রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে অধিকতর সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন ও ব্রাহ্ম সংস্কারকদিগকে মূর্তিপূজকদিগের উপর গালাগালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা মূর্তিপূজা পাপ নহে।

রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিপূজার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সাদৃশ্য দেখাইয়াই আমি এই পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বামিজীর মতবাদ আলোচনার প্রণালী

রাজা রামমোহন হইতে যে শতাব্দীর আরম্ভ এবং স্বামী বিবেকানন্দে যে শতাব্দীর শেষ বাঙলায় সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর একখানি আংশিক চিত্র ঐতিহাসিক পারম্পর্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলা অত্যন্ত কঠিন কার্য। স্বভাবতঃই যাহা কঠিন, আমাদের দেশে অবস্থাধীনে তাহা আরো কঠিন। ব্রাহ্মযুগের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ব্রাহ্মযুগের অবসানে, সমন্বয়যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণেরও বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য আলোচনা করিতে যাইয়া যে সমস্ত ঐতিহাসিকগণ শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম-কলহের প্রতি অনেক সময়ে অযথা কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম কলহের ইতিহাস কল্পনা করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি পরস্পর বিরোধী যুগ বিদ্যমান। এই বিরোধীয় যুগের সকল মহাপুরুষেরাই দেহত্যাগ করিয়াছেন; আছেন তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ, আর আছে তাঁহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, 'আমরা 'স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও ঈর্ষাপরায়ণ এবং কলহপ্রিয়।' স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে যাহাই হউক এ ক্ষেত্রে আমাদের মত পুরুষদের সম্বন্ধে স্বামিজীর ধারণা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দুইটি বিরোধীয় যুগের অন্ততঃ দশটি, স্বামিজী কথিত স্ত্রীলোকের মত ঈর্ষাপরায়ণ ও কলহপ্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটা যুগ বিশ্লেষণ করিতে গেলে যে শর বর্ষণ সহ্য করিতে হয় তাহা অতি বড় ক্ষমতাশালী সমালোচকের ধৈর্যের পক্ষেও একটা পরীক্ষা।

গত শতাব্দীর স্মরণীয় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহনের গ্রন্থের প্রায় ⅔ অংশ নষ্ট হইয়াছে। রাজার প্রতিবাদকারীদের রচনাও কোন গ্রন্থাগারে রক্ষিত নাই। এজন্য রামমোহন সম্পর্কে আলোচনায় বিস্তর অসুবিধা ঘটিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে সমস্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পত্রাবলীতে। তাঁহার জীবিতকালেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ইহাই প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। তারপর স্বামিজীর দেশী ও বিদেশী শিষ্যদের রচনা আমরা স্বামিজীর নিজের উক্তির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার জন্য গ্রহণ করিতে পারি। যেখানে স্বামিজীর উক্তির সহিত উহার মিল আছে সেইখানেই কেবল আমরা উহাদিগকে প্রামাণ্য মর্যাদা দিতে পারি। যেখানে স্বামিজী নীরব অথচ স্বামিজী সম্বন্ধে শিষ্য ও শিষ্যাগণ কোন মত স্বামিজীর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেখানে প্রথমতঃ দেশী ও বিদেশী শিষ্য ও শিষ্যাদের মধ্যে তুলনা করিতে

হইবে এবং উহাতে বিশ্বাস করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে যে স্বামিজীর কোন সুস্পষ্ট মতবাদের উহা বিরোধী কিনা। তারপর শিষ্য ও শিষ্যাদের গ্রন্থে যদি এমন কথা কিছু থাকে যাহা স্বামিজীর কোন সুস্পষ্ট মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী তবে আমি আপনাদিগকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিব না। একদিকে 'দি মাষ্টার এ্যাজ আই স হিম্,' 'ইন্‌সপায়ার্ড টকস্' প্রভৃতি, অন্যদিকে 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে এইরূপ সতর্ক হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের নিজের যে প্রামাণ্য মর্যাদা তাহা প্রথম শ্রেণীর নহে। স্বামিজীর মত সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর প্রামাণ্য মর্যাদা কেবল এক স্বামিজীর নিজের রচনা ও বক্তৃতাগুলিই দাবী করিতে পারে। কোন সাধু ব্যক্তি আমাদিগকে এমন আভাষ দিয়াছেন যে স্বামিজীর অনেক বিশিষ্ট মত নাকি অদ্যাপি অব্যক্ত আছে এবং সেই সমস্ত অব্যক্ত মতের সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে স্বামিজী সম্বন্ধে আলোচনা একরূপ অসম্ভব। সাধারণের হিতের জন্য যদি কোন মহামূল্য কথা স্বামিজী কাহারো নিকটে গোপনে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়া থাকেন, তবে এতদিন তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন? এবং এখনই বা গোপনে রাখিতেছেন কেন? এবং আর কতকালই বা তাহা গোপন রাখিবেন?

আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, যে সমস্ত মতবাদে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সমস্ত মতবাদের জন্য শতাব্দীর ইতিহাসে তিনি নিজেকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি মতবাদই কি পাশ্চাত্য দেশে, কি ভারতে, তিনি অন্ততঃ দশবার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। স্থান ও পাত্র ভেদে বলিবার ভঙ্গীতে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে এই মাত্র। ইতিহাসের স্মরণীয় কোন মহাপুরুষই তাঁহার পশ্চাদনুবর্তীদের অব্যক্ত মতবাদের মধ্যে বাস করেন না। তাঁহারা দিবা দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল সূর্যালোকে নিজেরাই নিজেদের কীর্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়া যান। নতুবা কোন অব্যক্ত মতবাদের কি সাধ্য যে তাঁহাদিগকে প্রচার করে?

রাজা রামমোহন সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য দেশীয় মনস্বী ও মনস্বিনী অনেক কথা বলিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অব্যক্ত কথাও এখন ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু মিষ্টার এড্যাম্ বা মিস্ সোফিয়া কলেট রাজার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি যেমন তাহা অপেক্ষা রাজার নিজের রচনার উপরেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছি, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোন্ মিষ্টার এবং কোন্ মিস্ অথবা কোন্ সন্ন্যাসী বা কোন্ গৃহী কি বলিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা অপেক্ষা স্বামিজীর নিজের গ্রন্থাবলীকেই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। আমার মনে হয় জীবন ও ইতিহাস আলোচনার ইহাই সুপথ। কুপথ ও বিপথ যে না আছে তাহা নয়, কিন্তু তাহা আছে বলিয়াই কি সেই পথে যাইতে হইবে?

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় ধর্ম-সংস্কারের ইতিহাসে, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের অবতারণা। ইহা এক অতি গুরুতর বিষয়।

এই মতবাদকে যেমন দর্শনের দিক হইতে দেখিতে হইবে, তেমনি ইতিহাসের পথেও ইহার গতি আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন বাঙ্গালীর ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া এ যুগে সর্বপ্রথম শাঙ্কর-অদ্বৈত প্রচার করিয়াছেন। যে অদ্বৈতে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্ম এক, রামমোহন সেই অদ্বৈতই প্রচার করিয়াছেন কিনা—তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে। একদল বলেন, রামমোহন নিশ্চয়ই শাঙ্কর-অদ্বৈত প্রচার করিয়াছেন, অন্যদল বলেন, তাহা নয়, রামমোহন শঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিলেও তিনি কেবল শঙ্করের প্রতিধ্বনি নহেন, শঙ্কর হইতে রামমোহন অনেক বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর যতদূর অগ্রসর রামমোহন ততদূর নহেন। কেননা, রামমোহন বলিয়াছেন জীবমুক্ত হইলেও জীবের নিকট ব্রহ্ম সাধনীয় থাকিয়া যান। আর লর্ড আমহার্স্টের নিকট চিঠিতে মায়াবাদকে তিনি একটা মিথ্যা কাল্পনিক বিদ্যা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং বর্তমানকালের অনুপযোগী বলিয়াও ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যদিকে অন্যদল বলেন যে, শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় রামমোহন অতি সুস্পষ্টরূপে নির্গুণবাদ, মায়াবাদ, জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ গ্রহণ করিয়াছেন। পণ্ডিতদের সহিত বিচারেও তিনি নির্গুণবাদ ও মায়াবাদের আশ্রয় লইয়াই প্রতীকোপাসনা, ব্রহ্মের উদ্দেশে মূর্তিপূজা, দেব-দেবীপূজা প্রভৃতিকে নিম্নাধিকারীর জন্য স্বীকার করিয়াও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে রাজা বলিতেছেন—

"যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না।"

রাজা এখানে বিবর্তবাদ উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট মায়াবাদের কথাই বলিলেন। সংগীত রচনায় রাজা কোন ভাষ্যকে অবলম্বন করেন নাই, নিজের মনের ভাব সহজ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-সংগীতে এই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ খুব সুস্পষ্ট। লর্ড আমহার্স্টের কাছে রামমোহন লিখিয়াছেন।*

"বৈদান্তিক মত শিক্ষা দিলে দেশের যুবকেরা উন্নত সমাজে বাস করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে না। কেননা ঐ বৈদান্তিক মত শিক্ষা দেয় যে এই দৃশ্যমান বস্তু সকল কিছুই সত্য নয়। পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির বাস্তবিক কোন অস্তিত্বই নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতি কোনরূপ সত্যিকার স্নেহ মমতারও প্রয়োজন নাই।"

---

*"Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection."

আবার সেই রামমোহনই ব্রহ্মসংগীতে লিখিতেছেন,

"পঞ্চভূত জড়ময়, কভু আছে কভু নয়,
সকলি অনিত্য হয় দারাসুত ধন জন।"

রামমোহন দেখিতে গেলে এখানে স্ববিরোধী। অবশ্য অদ্বৈত ও মায়াবাদকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যদি তিনি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ক্ষেত্র বুঝিয়া চালনা করিয়া থাকেন তবে সে কথা স্বতন্ত্র।' রামমোহন সগুণ নিরাকার ব্রহ্মকেও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকেও কাল্পনিক ও প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত মাত্র বলিয়াছেন।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে রামমোহন ধর্মের সংস্কার কেন চাহিয়াছিলেন। মহাত্মা ডিগ্‌বির নিকট চিঠিতেই তিনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। *

রাজনৈতিক উচ্চাধিকার ও সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যও অন্ততঃ আমাদের ধর্মের একটা আশু সংস্কারের প্রয়োজন রামমোহন অনুভব করিয়াছিলেন। এখানে ধর্মকে সমাজের একটা অংগস্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রাজা এখানে বৈষ্ণব ও শাক্তের মূর্তিপূজা, দেবদেবীপূজা, অভ্রান্ত অবতার ও গুরুবাদ প্রভৃতিকে মায়াবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের সহায়তায় নিরসন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আবার পাছে মায়াবাদে কর্ম-সন্ন্যাস আসিয়া সমাজ ব্যবহার শিথিল হয়, পাশ্চাত্যের জড়বিজ্ঞানের প্রচার এদেশে বাধা প্রাপ্ত হয় সে ভয়ও তাঁহাকে না করিতে হইয়াছে এমন নয়। তবে অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন প্রকৃষ্ট নীতিবাদের ভিত্তি তিনি খুঁজিয়া পান নাই বলিয়াই সম্ভবতঃ মায়াবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যে একটা স্ববিরোধিতা অবশ্যম্ভাবীরূপে থাকিয়া গিয়াছে। এই ব্যবহারিক নীতিবাদের জন্য তিনি বাইবেলকে অবলম্বন করিয়াছেন। *The Precept of Jesus—guide to peace and happiness* ইহার প্রমাণ।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি রাজা রামমোহনের ধর্ম-সংস্কারে অদ্বৈতবাদের অবতারণায় একটা যুগ-প্রয়োজন, একটা সামাজিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। প্রত্যেক দার্শনিক মতবাদ কেবল যে দার্শনিকদের মস্তিষ্কপ্রসূত তাহা নহে। প্রত্যেক বড় বড় যুগের একটা অভিপ্রায়ও তৎকালীন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ রামমোহনের উদ্ভাবিত নহে। বৌদ্ধযুগের পরে ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী প্রচারক আচার্য শঙ্কর। আচার্য শঙ্করও বৌদ্ধ-যুগের অবনতির দিনে যে গুরুতর সামাজিক প্রয়োজনে অবনত বৌদ্ধধর্মের অসার ক্রিয়াকলাপ হইতে ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয় স্বরূপ লক্ষণের দিকে সমগ্র জাতির দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহনও বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম-

---

*It is, I think necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."

সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যুষেই বাঙ্গালীকে আবার একবার বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

"ভাব সেই একে,
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।"

শৈব মনে করিতেছিলেন, তাঁহার শিবই একমাত্র ব্রহ্ম, বৈষ্ণব মনে করিতেছিলেন, তাঁহার কৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান, শাক্তও তাঁহার আরাধ্যা শক্তিকে তাহাই মনে করিতেছিলেন। প্রত্যেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নাধিকারীরা যে সময় এইরূপ ধর্ম-কলহে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—ঠিক সেই সময়ে রামমোহন শঙ্করের ব্যবহৃত অস্ত্র নির্গুণবাদ ও মায়াবাদ হস্তে বাঙ্গালীর ধর্ম-সংস্কারক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শিব, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীদিগকে ও তাঁহাদের মূর্তিপূজাকে ব্রহ্মের উদ্দেশে পূজা বলিয়া ইঁহাদিগকেও গৌণভাবে ব্রহ্ম-পূজা স্বীকার করিয়া, কেবল অজ্ঞানীর মনস্থিরের জন্য ইহার ব্যবস্থা দিয়া, মায়াবাদ সহায়ে পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহাদের অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করিলেন। এক্ষেত্রে রামমোহনের কার্য বহুলপরিমাণে শঙ্করানুগামী। কিন্তু ব্যবহারিকক্ষেত্রে, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বিভাগে অনেকে বলেন, তিনি শঙ্কর হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য দেখাইতে পারিয়াছেন। এইখানেই মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। গৃহীর ব্রহ্মোপাসনার বিধি শাস্ত্রেও ছিল, আর রামমোহনও যুগ-প্রয়োজনে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও যাহাতে লোকব্যবহার অব্যাহত থাকে শাঙ্কর-বেদান্তিগণ অবশ্যই তাহা করিতে পারেন। রামমোহনের পূর্বে অনেক বড় বড় শাঙ্করবেদান্তী, স্মৃতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরূপে মান্য হইয়াছেন। হইতে পারে শঙ্করের ঝোঁক প্রধানতঃ সন্ন্যাসের দিকে, আর রামমোহনের ঝোঁক প্রধানতঃ গার্হস্থ্যের দিকে, তথাপি পরবর্তী রামমোহনপন্থীরা সন্ন্যাসকে যেরূপ ধিক্কৃত করিয়াছেন, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য রামমোহন তাহা করেন নাই। আমার মনে হয় মায়াবাদের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় রামমোহন একেবারেই শঙ্করানুগামী। তবে ব্যবহারিক জগতের উপর জোর দিতে গিয়া অনেক সময় তিনি মায়াবাদীর মত আচরণ করেন নাই। শঙ্কর হইতে তাঁহার এই যা পার্থক্য। রামমোহনের বেদান্ত-মীমাংসায় শঙ্কর-রামানুজের যে সমন্বয়ের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহা অনেকটা কল্পনা মাত্র।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রামমোহনের বিলাত গমনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদই ইতিহাস। রামমোহনের পর আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-সভাকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের ব্রহ্ম-সভার বেদী হইতে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তৎ ত্বমসি' ইত্যাদি অদ্বৈত-বেদান্তের

মহাবাক্যগুলির ব্যাখ্যা করিয়া, "আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা" উপদেশ দিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহা নিজে শুনিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ এই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ধর্মেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই পৌষ দীক্ষালাভ করিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তও দেবেন্দ্রনাথের সহিত এই অদ্বৈতবাদেই দীক্ষিত হইলেন।' তখন ব্রহ্ম-সভার ধর্মমত ছিল 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'।' আর 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের অর্থই ছিল—শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মাঘোৎসবে যে বক্তৃতা করেন তাহা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ মূলক।

এইবার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আমরা একটা প্রতিক্রিয়ার যুগে আসিতেছি। বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার সর্বপ্রথম এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। পরে দেবেন্দ্রনাথও শাঙ্কর-অদ্বৈতকে মীমাংসার দিক দিয়া এবং ব্রহ্মসভার উপাসনা পদ্ধতির দিক দিয়া পরিত্যাগ করেন। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা' নামক একখানি চটি গ্রন্থে শাঙ্কর-বেদান্তের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। ইহাতে কার্তেজিয়ান দর্শনের সাহায্য লইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় একান্ত ভেদ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপকে স্বীকার করায় এবং সেইসঙ্গে পরিণামবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার করায়, শঙ্করের মায়াবাদের যথেষ্ট অবসর 'আত্মতত্ত্ববিদ্যায়' রহিয়া গিয়াছে। দার্শনিক মীমাংসার দিক দিয়া এই গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নহে।

যাহাই হউক দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিলেন—

"আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায় তবে কে কাহার উপাসনা করিবে!"

তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনটি আপদ হইতে রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন। যথা—

(১) পৌত্তলিকতা. (২) খৃষ্টানধর্ম. (৩) বৈদান্তিক মত। বৈদান্তিক মত অর্থে তিনি অদ্বৈতবাদই বুঝিতেছেন এবং তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, "বৈদান্তিকেরা ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে।"

সুতরাং রামমোহনে যে অদ্বৈতবাদের আরম্ভ আমরা দেখিলাম, দেবেন্দ্রনাথে সেই অদ্বৈতবাদ বর্জন আমরা দেখিতেছি। রামমোহনের সময় শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ এই অদ্বৈতবাদকে তত্ত্বের দিক দিয়া, উপাসনার দিক দিয়া ও বিশেষভাবে নীতিবাদের দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। রামমোহন পাদ্রীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর চারি সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের সময়, রামমোহন হইতে পঁচিশ বৎসর পরে মহাত্মা ডফ্ আবার এই অদ্বৈতবাদকে আক্রমণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডফের আক্রমণের

বিরুদ্ধে 'দি বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্‌ ভিন্‌ডিকেটেড'-এর চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লেখক লিওনার্ড সাহেবের সহিত একমত হইয়া আমি বলি যে, ইহা চন্দ্রশেখর দেব লিখিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে বলেন ইহা রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়, কেননা রাজনারায়ণবাবু তখন ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া যোগ দেন নাই। ইহা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। যাহাই হউক—'দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' ও 'দি বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্‌ ভিন্‌ডিকেটেড'—ইহা গত শতাব্দীর পাদ্রী-আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বৈদান্তিক মত ও বিশেষভাবে অদ্বৈতমতের পক্ষে একটা আত্ম সমর্থন।

'দি বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিনস্‌ ভিন্‌ডিকেটেড্' প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে যে ভাবে অদ্বৈতমত সমর্থিত হইয়াছে তাহা বহু স্থানে 'দি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'-কে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরা সত্ত্বেও সকল অদ্বৈতবাদীর মনঃপূত না হইতেও পারে। যাহা হউক দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব ভাবিয়া এবং অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে মনে করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতে অদ্বৈতবাদকে পরিত্যাগ করিলেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথমে খৃষ্টীয় ভক্তিমার্গের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মধর্মকে পরিচালিত করিয়া পরে যখন 'আওয়ার রিটার্ণ টু দি বেদান্ত' ঘোষণা করিলেন তখন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে যে তিনি ফিরিয়া আসিলেন তাহা নহে. বৈদান্তিকবিশিষ্টাদ্বৈতে ফিরিয়া আসিলেন এইরূপই দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথও অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিতে যেমন পাশ্চাত্যদর্শন বিদ্যমান তেমনি কেশবচন্দ্রের সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় খৃষ্টধর্মের প্রেরণা বিদ্যমান। রাজা রামমোহনের সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথের ও কেশবচন্দ্রের সগুণ ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ উপাসনা নহে, উহা কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত।

কেশবচন্দ্রেব পরেই রামকৃষ্ণযুগের অভ্যুদয়। রামকৃষ্ণদেবে তত্ত্বাংশে ও সাধনাংশে সমস্ত মতের সমন্বয় দেখা গিয়াছে। মোক্ষমূলার সাধনের দিক হইতে বিবেকানন্দ তত্ত্বের দিক হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মহাসমন্বয়কে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই সমন্বয়কে "সিন্‌গুলার ইলেক্‌টিসিসম্‌" নাম দিয়া শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বিস্তর সুখ্যাতি করিয়াছেন। যদিও ইহা "ইলেকট্রিসিসম্‌" নহে।

তারপর রামকৃষ্ণযুগকে যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে এবং পরে ভারতে প্রচার আরম্ভ করেন তখন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই তিনি মুখ্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। গত শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে শাঙ্কর-অদ্বৈত প্রচারের ইহাই ইতিহাস। শতাব্দীর প্রথমে রামমোহনে অদ্বৈতবাদের আরম্ভ; শতাব্দীর শেষেও বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের বিজয়-নির্ঘোষ। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে এই অদ্বৈতবাদ পরিত্যক্ত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রামমোহন ও বিবেকানন্দে আশ্চর্য সাদৃশ্য।

যেমন বিবেকানন্দ হইতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র পৃথক তেমনি রামমোহন হইতেও তাঁহারা পৃথক। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের দিক দিয়া যে রামমোহন হইতে দেবেন্দ্র-নাথ ও কেশবচন্দ্র পৃথক ইহা সাধারণের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায় বলিয়াই বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য।

রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই শংকরের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। রামমোহন-পন্থীরা যেমন বলেন যে শংকর হইতে রামমোহনের মৌলিকত্ব আছে, বিবেকানন্দ-পন্থীরাও সেইরূপ বলেন যে শংকর হইতে বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব আছে। স্বামী বিবেকানন্দ দার্শনিক মতবাদগুলিকে যে ভাবে শ্রেণীবন্ধ করিয়া-ছেন, মায়ার যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অদ্বৈতবাদের সহিত নীতিবাদের যে অংগাংগী যোগ দেখাইয়াছেন, পাপবোধ সম্বন্ধে যেরূপ নির্ভীকভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে অনেক দিকে শাংকর অদ্বৈত হইতে তাঁহার মৌলিকত্ব দেখা দিয়াছে।

যে যুগ প্রয়োজনে রামমোহন অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই যুগ প্রয়োজনেই কি স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়া-ছিলেন? ইহা এক অতি কঠিন প্রশ্ন। এক হিসাবে অবশ্য বলিতে হইবে যে উভয়েই একই উদ্দেশ্যে একই প্রয়োজনে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। উভয়েই অদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া, সমগ্র জাতিকে বর্তমান হীনাবস্থা হইতে একটা উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

স্বামিজী বলিয়াছেন—

> "জগৎকে যদি আমাদিগের কিছু জীবনপ্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয়, তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। ভারতের মূক জনসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য এই অদ্বৈতবাদের প্রচার আবশ্যক। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃ-ভূমির পুনরুজ্জীবনের আর উপায় নাই।"

তথাপি রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে একটা ব্রাহ্মযুগ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই ব্রাহ্মযুগ অদ্বৈতবাদবিরোধী যুগ। যেমন খৃষ্টান পাদ্রীরা আমাদের অদ্বৈতবাদ বুঝিতে পারেন নাই তেমনি রামমোহনের পরবর্তী ও বিবেকানন্দের অগ্রগামী ব্রাহ্ম-সংস্কারকগণও অদ্বৈতবাদ সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। রামমোহন ও বিবেকানন্দের যুগে সময়ের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মাতৃভাবে কালী-সাধনা ও কান্তভাবে যুগল-সাধনার পরে, মূর্তিপূজা ও দেবদেবী পূজায় ব্রাহ্মযুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সুতরাং রামমোহন মায়াবাদ দ্বারা যেরূপ মূর্তিপূজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ শাস্ত্রীয় মীমাংসায় ব্রহ্মের উদ্দেশে নামরূপের প্রতীকোপাসনাকে 'অন্যায় নহে' বা 'পাপ কর্ম নহে' এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রতীককে, নামরূপকে, বিবেকানন্দ কখনই ব্রহ্ম কহেন নাই এবং প্রতীকোপাসনাকে কখনই অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া বলিতে পারেন নাই! তিনি 'ভক্তিযোগে' এই প্রসংগে বলিতেছেন—

"প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেকস্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আত্ম-স্বরূপ চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে সেই উপাসককে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না।"

রামমোহন ও বিবেকানন্দে এখানে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

কিন্তু রামমোহন যেমন প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে নিক্ষেপ করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ তাহা করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মূর্তিপূজা ও দেবদেবীপূজা অপেক্ষাও আর এক ভয়ংকর রাক্ষসের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্যের অনুকারী ভোগবিলাসবাদ, ইহকালবাদ, জড়বাদ। বিবেকানন্দ এই ইহকালসর্বস্ব জড়বাদের বিরুদ্ধেই মায়াবাদকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের মায়াবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র ভিন্ন এবং উভয়ের পার্থক্যও এইখানে। ইহা আপনাদের সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য। পাশ্চাত্যদেশে যে স্বামিজী মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও অনেকাংশে জড়বাদের প্রতিষেধক রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। হেগেল দর্শনের উপর যে স্বামিজী অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিলেন, তাহারও কারণ ইহাই।

স্বামিজী মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত সমগ্র জগতের নিকট এই মায়াবাদ ঘোষণা করিয়া যদি ক্ষমতা থাকে ত তাহাদিগকে উহা খণ্ডন করিতে আহবান করিয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতি ঐ আহবানে ভারতীয় মতের প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছে যে, তাহারা মরিয়াছে, তোমরা এখনও জীবিত আছ। * * * তাহারা যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাহারা মরিয়াছে। আর আমরা চিরকাল অক্ষত রহিয়াছি, তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি সবই মায়া। মহামায়ার সন্তানগণ চিরকাল বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু অবিদ্যার সন্তান-গণের পরমায়ু অতি অল্প।"

ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ দ্বারাই জাতি দীর্ঘায়ু লাভ করে, গ্রীস ও রোমের সহিত হিন্দুজাতির তুলনায় ইহাই দৃষ্ট হয়। এই ত্যাগের জন্য, এই সংসার-বৈরাগ্যের জন্যই হিন্দুগণ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। মায়াবাদ বিশ্লেষণে এইখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটা মৌলিকত্ব আমরা দেখিতে পাই। এযুগে এরূপ একটা কথা বলা কম দুঃসাহসেরও পরিচয় নহে।

শতাব্দীর প্রথমে রামমোহনের ভয় ছিল মূর্তিপূজায় ও বহুদেবদেবী পূজায়, শতাব্দীর শেষে বিবেকানন্দের ভয় জন্মিয়াছিল পাশ্চাত্যের অনুকারী ভোগবিলাসে। স্বামিজী বলিতেছেন—

"* * * হইতে পারে পাশ্চাত্য বিলাসিতার আদর্শে কতকগুলি ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া

গিয়াছে, হইতে পারে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয় ভোগরাশি পাশ্চাত্য গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছে তথাপি এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি * * ভস্মমাখা ঊর্ধ্ববাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয় সেও ভাল। যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মনুষ্যত্বহারী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন।"

সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন মায়াবাদকে ভিত্তি করিয়া শতাব্দীর শেষে অদ্বৈতবাদ প্রচার বাঙ্গলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দ কেন আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

আমার নিকট একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মহাশয়, শঙ্কর হইতে বিবেকানন্দ কি কিছু নূতন বলিয়াছেন? যদি না বলিয়া থাকেন, তবে আর এত অধিকে প্রয়োজন কি? বুদ্ধ বা শঙ্কর পৃথিবীতে দু'একবার মাত্র জন্মিয়াছে। মাত্র একশ বছরের ব্যবধানে কোন এক দেশে দুইবার করিয়া শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। তথাপি মতে বিশ্বাসে ও জীবনের কার্যে স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করানুগামী এ-যুগের দ্বিতীয় শঙ্কর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে তুলনা করিলে তাঁহার কার্যের গুরুত্বও বড় কম নয়।

শঙ্করাচার্যের প্রভাব যে প্রাক্-ব্রিটিশযুগে বাঙ্গলাদেশে অধিক বিস্তৃত হয় নাই তাহা স্বামিজীও স্বীকার করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও শেষভাগের বাঙ্গালী অনেকটা শাঙ্কর-ভাষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে। এ-যুগের পূর্বে বাঙ্গালীর দর্শন শাঙ্কর-ভাষ্য ছিল না। বাঙ্গালী প্রতিভাই বাঙ্গালীর দর্শন উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছিল। হইতে পারে তাহা নব্য-ন্যায়, হইতে পারে তাহা তান্ত্রিক-অদ্বৈতবাদ, হইতে পারে তাহা বৈষ্ণব জীব-বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। কিন্তু তাহা শাঙ্কর-ভাষ্য নহে। বৌদ্ধ ও জৈন মতও বাঙ্গলায় অনেককাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী প্রতিভা যে যুগধর্মের প্রয়োজনে কি দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহা আজিও অনাবিষ্কৃত, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শাঙ্কর-ভাষ্য অবলম্বন করিলেও শঙ্করকে অনেক স্থানেই তিনি সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের বাক্য-গুলিকে প্রথমে দ্বৈতবাদ পরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং সর্বশেষে অদ্বৈতবাদে শ্রেণী-বদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বৈতবাদসূচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে জোর করিয়া অদ্বৈত ব্যাখ্যায় পরিণত করা আচার্য শঙ্করের একটা ভ্রম বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "শঙ্করাচার্য এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে উপনিষদ কেবল অদ্বৈত পর, উহাতে অন্য কোন উপদেশ নাই।" এইখানেও শঙ্কর হইতে তাঁহার প্রস্থান। মায়া যে একটা মিথ্যা মরীচিকা নহে,

এই জগতে যাহা অহরহঃ ঘটিতেছে যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে তাহার প্রতি দৃষ্টি করি তবে স্পষ্ট দেখিতে পাই যে যাহা ঘটে, যাহা দেখিতেছি, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই মায়া। স্বামী বিবেকানন্দের বলিবার ভঙ্গীতে এখানেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে, সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাইয়াছেন, অন্যপক্ষে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি যখন যে যোগের কথা বলিয়াছেন, তখন সেই যোগকেই এমন শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ অদ্বৈতের ভূমি এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাতে মনে হয় শঙ্কর হইতে তাঁহার বিশেষত্ব আছে, বই কি? দেশের তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি সকলকে দরিদ্রনারায়ণ বলিয়া যেভাবে তিনি আহ্বান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমি বলিতে দ্বিধা করি না যে ইহা শঙ্কর হইতে তাঁহার কেবল স্বাতন্ত্র্য নহে, ইহা শঙ্কর হইতে অধিকতর বিশাল হৃদয়ের পরিচায়ক। ইহা শুধু শঙ্কর নহে, ইহা বুদ্ধ ও শঙ্করের এক অপূর্ব সংযোগ।

নীতিবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, কি ভারতবর্ষে, কি পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দ খুব নির্বিঘ্নে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে পারেন নাই। রামমোহনের সময়ে, দেবেন্দ্র-নাথের সময়ে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সময়েও খৃষ্টান পাদ্রীগণ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এই এক আপত্তি তুলিলেন যে অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের কোন ভিত্তি নাই। বরং ইহাতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সময়ে কেবল এক খৃষ্টান পাদ্রীরাই এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের সময়ে অধিকন্তু স্বদেশীয় ব্রাহ্ম-ভ্রাতাগণও তাহাতে যোগ দিলেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় কি, না এই সমস্যা স্বামী বিবেকানন্দের সময়েই অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল। পরন্তু স্বামিজীও তীব্রভাবে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে এদেশে এবং বিদেশে বহুস্থানে বহুবার তিনি তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সেই সমস্ত উক্তিগুলি যদি সংগ্রহ করা যায় তবে একখানি ছোট পুঁথি হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মভ্রাতাগণ অদ্বৈতবাদের দুর্নীতির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ মূল্য নাই। কেননা এ বিষয়ে তাঁহারা খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। আর বস্তুতঃ অতি অল্প বিষয়েই ব্রাহ্মগণ খৃষ্টান পাদ্রীগণ অপেক্ষা মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের নৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে—

(১) অদ্বৈতবাদে জীবাত্মা পরমাত্মায় কোন ভেদ স্বীকার করা হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মা যদি অভেদ হয়, তবে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকে না। জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব না থাকিলে জীবের ব্যক্তিত্বও রহিল না। যদি জীবের

ব্যক্তিত্ব না থাকে, তবে লোক-ব্যবহারে প্রত্যেক জীবের দায়িত্বও থাকে না। যেখানে ব্যক্তিত্ব নাই, দায়িত্ব নাই, যেখানে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবের পৃথক অস্তিত্বই নাই, সেখানে আবার নীতির অবসর কোথায়? সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ কোনরূপ নীতিবাদের ভিত্তি হইতে পারে না।

(২) অদ্বৈতবাদে যে প্রত্যেক জীবের পৃথক অস্তিত্ব নাই, তাহাই নহে; ঈশ্বরের পৃথক অস্তিত্বও ইহাতে স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের দণ্ডের ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে লোকে নীতিপরায়ণ হইবে এমন অবসরও ইহাতে নাই।

(৩) যেখানে জীব বলিতেছে 'আমিই ব্রহ্ম', সেখানে যে কোন মন্দ কার্য করিয়া সে এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারে যে আমি ব্রহ্ম, আমার অতিরিক্ত যখন আর কিছুই নাই তখন আমার কার্যের অপর কে বিচারক হইবে, আমি যাহা করি তাহাই ভাল।

(৪) যখন সর্বভূতেই আমি, তখন অন্যের যা কিছু সকলি আমার এইরূপ বিশ্বাসেও অদ্বৈতবাদী পরিচালিত হইতে পারেন।

শেষোক্ত দুইটি যুক্তির প্রশ্রয়ে অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টরূপে দুর্নীতিপরায়ণ হইতে পারেন, যাঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন তাঁহাদের এইরূপ আশঙ্কা।

স্বামী বিবেকানন্দ ইহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, দ্বৈতবাদীর নীতিবাদকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় অদ্বৈতবাদীর নীতিবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দ্বৈতবাদীর নীতিবাদকে আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের সাহায্য লইয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন যে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণায়—

"মানুষকে কাপুরুষ হইতে ও বাহির হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতে শিখায়, কেহই কিন্তু তোমাকে এরূপ সাহায্য করিতে পারে না। * * এক কাল্পনিক পুরুষের সমক্ষে আমি দুর্বল, অপবিত্র ও জগতের মধ্যে অতি হেয় অপদার্থ বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া থাকায়—বস্তুতঃ মানুষ নীতিপরায়ণ না হইয়া কুক্কুরতুল্য অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রত্যেক সমাজে যে সকল পাপ দেখিতে পাও, তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা, তাঁহার সম্মুখে কুক্কুরবৎ হইয়া থাকা, এই ভয়ানক ধারণা যে আশ্চর্য মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এইরূপ কুক্কুরবৎ হওয়া হইতেই হইয়াছে। * * এই ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের ধারণা হইতেই পৌরোহিত্য ও অন্যান্য অত্যাচারের ধারণা আসিয়া থাকে।"

অন্যদিকে অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামিজীর যুক্তি এই যে, অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নীতিবাদের কথা আছে সত্য কিন্তু নীতিবাদের কোন কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই। কেবল এক অদ্বৈতবাদেই নীতিবাদের হেতু পাওয়া যায়। খৃষ্টানেরা বলেন যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিও, কিন্তু এক ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন ইহার কোন কারণ তাঁহারা দিতে পারেন না। অন্যপক্ষে অদ্বৈত-

বাদ ইহার কারণ দিতে সমর্থ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, তোমার প্রতিবেশী ও তুমি এক। তোমার প্রতিবেশীকে হিংসা করিলে তুমি নিজেকেই নিজে হিংসা করিবে আর তোমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিলে তুমি নিজেকেই নিজে সাহায্য করিবে। অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ইহাই ভিত্তি। স্বামিজী বলিতেছেন—

"অপর প্রাণীবর্গকে আত্মতুল্য ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করে নাই। একমাত্র অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। তখনই তুমি ইহা বুঝিবে, যখন তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ডস্বরূপ জানিবে, যখন তুমি জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজকেই ভালবাসা হইল, অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল। তখনই আমরা বুঝিব অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়।"

আর যখন অদ্বৈতানুভূতিতে ব্রহ্মযোগে জীবাত্মা পরমাত্মা এক হইয়া যায় তখন সেই অবস্থায় পাপের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। জীব তখন কার্যকারণশৃঙ্খলের অতীত, সমস্ত পাপ ও পুণ্যের অতীত। সে অবস্থায় পরের টাকা আমার টাকা বলিবার যুক্তি বা আসক্তি তাহাতে সম্ভবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী বলিয়াছেন—

"আমাদের বালকেরা আজকাল অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহারা কাহারও কাছ হইতে উহা শুনিয়াছে—ঈশ্বর জানেন কাহার নিকট হইতে, যে অদ্বৈতবাদের দ্বারা সকলেই দুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয় আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর, অতএব আমাদের আর নীতিপরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। এ কথার উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয় যে, এ যুক্তি পশুপ্রকৃতির ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়, যাহাকে চাবুক ব্যতীত দমন করিবার উপায় নাই। যদি তুমি তাহাই হও, তবে এইরূপ কশামাত্র শাস্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা বরং তোমার আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবে। তাই যদি হয় তবে তোমাদের এখনই মারিয়া ফেলা উচিত, তোমাদের আর উপায় নাই।"

খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদিগকে প্রতিবাদ করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এখানে উষ্মা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্টান নীতি-বাদকে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জেরেমি বেন্থামের সম্মানিত সহযোগীর নিকট আমরা যে মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত লোকশ্রেয়ের আদর্শ পাইয়াছি তাহার আবরণ দেশীয় কিন্তু তাহার ভিতরে খৃষ্টান নীতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রামমোহন স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, খৃষ্টান ধর্মের নীতি-

বাদ অন্য যে কোন ধর্মের নীতিবাদ অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির অধিকতর উপযোগী ও সহায়ক। *

এই খৃষ্টান নীতিবাদকে তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তোমার প্রতি অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর।

যেখানে "পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত" নীতিপরায়ণ হইবার কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে অবশ্যই তিনি অদ্বৈতবাদের ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের সহিত খৃষ্টান নীতিবাদের সংযোগ করিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের উপরেই নীতিবাদের ভিত্তি প্রোথিত করিয়া বরং খৃষ্টান নীতিবাদের ভিত্তিকে আক্রমণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ অধিকতর আত্মস্থ, অধিকতর গৌরবান্বিত।

পাপবোধ

অদ্বৈতবাদে পাপবোধের স্থান কিরূপ, ইহাও একটি প্রশ্ন। এই পাপ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের যে সিদ্ধান্ত তাহাও এ যুগের একটি বিশেষত্ব।

আপনারা দেখিয়াছেন যে রাজা রামমোহনের উপর খৃষ্টান ধর্মের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। রামমোহন পাপে বিশ্বাস করিতেন এবং মানসিক প্রায়শ্চিত্তেরও একটা প্রয়োজন বোধ করিতেন। এক্ষেত্রেও তিনি পুরাপুরি অদ্বৈত বৈদান্তিক ছিলেন কিনা সন্দেহ।

দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী না হইলেও তাঁহার মধ্যে পাপবোধ বিশেষ দেখা যায় নাই। কেননা খৃষ্টান ধর্মেই অনন্ত পাপ ও অনন্ত নরকের কথা বেশী শুনা যায়। দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টানধর্মের প্রতি প্রীত ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা গত শতাব্দীতে সৌন্দর্যের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক বলিয়াই হউক বা আর যে কারণেই হউক, দেবেন্দ্রনাথে খৃষ্টানী পাপভীতি প্রশ্রয় পায় নাই।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের আরম্ভেই আমরা এই খৃষ্টানী পাপভীতি দেখিতে পাই। যখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের কি আঠার, তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে পাপ-ভীতি জাগ্রত হইতে থাকে। এই সময়ের কথা তিনি 'জীবনবেদে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

---

*"The doctrines of Christ are more conducive to moral principles and better adapted for the use of rational beings than any other which have come to my knowledge. অন্যত্র বলিয়াছেন. "The moral precepts of Jesus are something most extraordinary" আবার একস্থানে বলিয়াছেন, "Genuine Christianity is more conducive to the moral, Social and Political progress of a people than any other known creed."—*Ram Mohan Roy*.

"আমি পাপী, আমি পাপী, মন কেবল এইরূপই বলিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় যদি কোন কথা বলিত, কেবল বলিত, আমি পাপী। যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতাম ততক্ষণই পাপবোধ। ভিতরে এত লম্বা লম্বা দীর্ঘ দীর্ঘ পাপাকৃতি দেখি, ঠিক যেন নরকের কীট কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। এখন জানি প্রত্যহ একশত পাপের কম করি না।"

ব্রাহ্মধর্মে এক সময়ে কেশবচন্দ্র কর্তৃক এই খৃষ্টানী পাপ-ভীতি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মযুগের বক্তৃতার মধ্যে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণও অনেক স্থানে এই পাপের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের এই পাপবাদকে প্রথমে প্রতিবাদ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা নিজেকে পাপী ভাবে তাহারা ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাপীই হইয়া পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দীর শেষে এই খৃষ্টানী বা ব্রাহ্ম পাপ-ভীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষকে পাপী বলাই সব চেয়ে বড় পাপ। জগতে পাপ নাই, মানুষ বা জীবাত্মা পাপী নহে। এই তত্ত্ব প্রচার করায় কি পাশ্চাত্যদেশে কি আমাদের দেশে স্বামিজীকে অনেকে তীব্র গালাগালি দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইহা এক অতি ভয়ানক পৈশাচিক তত্ত্বের প্রচার। কিন্তু স্বামিজী আশা করিয়া গিয়াছেন যে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহার নিকট এজন্য কৃতজ্ঞ থাকিবে। আর বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। স্বামিজী বলেন, মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু পাপ বলিয়া এমন কিছু নাই, যাহা একবার করিলে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—

"The world sin, although originally a very good one, has got a certain flavour to it, that frightens me."

বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদীর পক্ষে, যিনি বলেন আত্মাই ব্রহ্ম, পাপের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের মধ্যে পাপ সম্বন্ধে যেমন একটা অসুস্থ উত্তেজনা আমরা দেখিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের মধ্যে, তাহার বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ আমরা দেখিতে পাইলাম।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি মুক্তি

স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব সমষ্টি মুক্তি। প্রাচীনকালে এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ছিলেন যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, সকলের মুক্তি না হইলে কেবল একাকী একজনের মুক্তি হইতে পারে না। যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারাও অপরের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া সমষ্টি-মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে বাধ্য। সংস্কার বা সমন্বয়যুগে আমরা কাহারো নিকট সমষ্টি-মুক্তির এই অপূর্ব তত্ত্ব শুনি নাই। এ যুগে সত্যই ইহা নূতন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সমষ্টি-মুক্তির উপর সমধিক জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, আমাদিগকে নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে, কেননা জগৎ ও আমি এক। জগৎ যদি মুক্ত না হয় তবে আমার মুক্তি অসম্ভব। যাঁহারা অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ ও সন্ন্যাসকে এ যুগের অনুপযোগী বলিয়া এবং মধ্যযুগের কর্ম-সন্ন্যাসের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বামিজীর এই সমষ্টি-মুক্তির কথা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখেন নাই। এই সমষ্টি-মুক্তির প্রেরণা এ-যুগে দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে বিবেকানন্দের প্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। অদ্বৈতবাদকে বর্তমান যুগে সামাজিক জীবনে কার্যকরী করিবার এক মহান্ প্রেরণা। ইহা স্বামী বিবেকানন্দকে সত্যই এক অতি বড় গৌরবের অধিকার প্রদান করিয়াছে।

রাজা রামমোহন যদি ব্রহ্মোপাসনায় গৃহীর অধিকার আছে বলিয়া এ-যুগে একটা বড় সংস্কারের কথা বলিয়া থাকেন, তবে স্বামী বিবেকানন্দও সমষ্টি-মুক্তির কথা বলিয়া অদ্বৈতবাদের আলোচনাকে যেমন পূর্ণতর করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে এ-যুগের কর্মযোগের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়া তাহাকে অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপরে প্রোথিত করিয়াছেন। শঙ্কর হইতে এই সমষ্টি-মুক্তির আদর্শেও স্বামী বিবেকানন্দের একটা বিশেষত্ব এবং রামমোহন হইতেও এখানে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খুব সুস্পষ্ট। অদ্বৈতবাদের সহিত সমষ্টি-মুক্তিকে যুক্ত করিয়া দিয়া সমগ্র ভারতে বিশাল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্যও এক সুমহৎ কর্মের প্রেরণা স্বামিজী দিয়া গিয়াছেন। স্বামিজী তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় একখানি পত্রে বলিতেছেন—

> "মনের অশান্তি, তার মানে কোন কাজ নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর্। নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। * * * তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করে দাও ত বাবা। * * * আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়।"

অন্যত্র বলিতেছেন—

> "দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল। দু'চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা।"

তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের পূর্বে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের নিকট সন্ন্যাসীর আদর্শ বুঝাইতে গিয়া এই সমষ্টি-মুক্তির কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> "মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে তাহার নিজ ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।"

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহা যে পন্থীই হউন বিস্মৃত হইবেন না যে বাঙ্গলায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সন্ন্যাস কেবল মধ্যযুগের একটা কঙ্কাল নহে। উহার আদর্শে বর্তমান ভারত ও সমগ্র মনুষ্য পরিবারের জন্য ধর্মের সহিত সামাজিক জীবনের এক অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র আবিষ্কৃত ও নির্ধারিত হইয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ উহা আবিষ্কার ও নির্ধারণ করিয়াছেন। যে মহাপুরুষ অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া দেশকে ও জাতিকে এই সমষ্টি-মুক্তির মহান্ বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন; শুনা যায়, দেশের একটা কুকুর যে পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে সে পর্যন্ত যিনি নিজের মুক্তি লওয়া পাপ মনে করিয়া গিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই অদ্বৈত-বাদ প্রচারে এমন কিছু আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন যাহা না হইলে—সম্ভবতঃ আচার্য শঙ্কর ও রাজা রামমোহনের পরেও এ-যুগে অদ্বৈতবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ভিত্তির উপর সমাজ-সংস্কার দাঁড়াইতে পারে কিনা এই প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী বেদান্তের যুগ কিনা?

বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ হস্তে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দকেও সেই শাঙ্কর অদ্বৈত ও মায়াবাদ হস্তেই দণ্ডায়মান দেখিতেছি। ভগিনী নিবেদিতার কথার প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে শতাব্দীর প্রথমে ও শেষে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করিয়াছেন যে বেদান্ত বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহনকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাঙ্গলায় একটা বেদান্ত-যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায় কিনা? রামমোহনের পরে এবং স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধর্ম-সংস্কারকে যাঁহারা পরিচালিত করিয়াছেন, যেমন রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—ইঁহাদের মধ্যে এক বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ছাড়া আর শেষোক্ত পাঁচজনই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের বিরোধী। এই কালের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার ও সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মমতে কোন বাদীই ছিলেন না। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট মায়াবাদই একমাত্র বৈদান্তিক মত নহে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এমন-কি দ্বৈতবাদও বৈদান্তিক মত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে এবং হইয়াছেও। কেননা বেদান্তে উক্ত দুইটি মতেরও প্রসঙ্গ

দেখা যায়। অপরাপর ব্রাহ্ম সংস্কারকগণ অল্পাধিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। যদিও তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি কোন-না-কোন পাশ্চাত্য দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সমগ্র শতাব্দীকে সাধারণভাবে একটা বৈদান্তিক-যুগ বলিয়া চিহ্নিত করায় আপত্তি কি?

আমি প্রথম হইতে যেরূপ ভাবে এই যুগ বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহাতে সমগ্র শতাব্দীকে একটা বৈদান্তিক যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে আমি কিঞ্চিৎ আপত্তি না করিয়া পারি না। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথমভাগে বাঙ্গলাদেশে যে দুইজন সিদ্ধ মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, অথবা শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারের ইতিহাসে যদি তাঁহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উপেক্ষা করা যাইত, তবে সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগকে একটা বৈদান্তিক-যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে আমি বিশেষ কিছু আপত্তি করিতাম না। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর মর্মর প্রাসাদশিখরে তাঁহারা এই অত্যল্প কালের মধ্যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। পণ্ডিতের গ্রন্থাগার ও মূর্খের বিলাসভবনেও তাঁহাদের সমান প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষ এজন্য সময় সময় যেরূপ নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া স্বামিজী যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়াছেন। আমারও জাতীয় চরিত্রের সেই শেষ কলঙ্ক-চিহ্ন উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবার প্রবৃত্তি নাই।

শতাব্দীর প্রথমে ধর্ম-সংস্কারের স্রোত যিনি বা যাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা নমস্য। সেই স্রোতে যাঁহারা সন্তরণ করিয়াছেন, স্বীয় বাহুর সঞ্চালনে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাঁহারা বিচিত্র হইয়াও স্রোতকে অব্যাহত রাখিয়াছেন। আর শতাব্দীর শেষভাগে যে দুই মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বর ও গেণ্ডেরিয়ার জঙ্গলে নিজ নিজ আসনে অটল হইয়া বসিয়া, কেবলমাত্র অঙ্গুলি হেলনে শতাব্দীর পূর্বাংশে প্রবাহিত স্রোতকে হেলায় মুখ ফিরাইয়া ভিন্ন পথে চালিত করিলেন—তাঁহারা কে? তাঁহারা কি শুধু ইতিহাস? না, ইতিহাসের নিয়ামক, কিম্বা তাহারা সত্যই পুরাণ-বর্ণিত অবতার? তাঁহাদের শক্তির পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত।

রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাদের পূর্ববর্তী সংস্কারযুগের অনেকাংশে প্রতিবাদ ও প্রতিষেধক। ইহাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈতবাদ হউক বা পরিণামবাদ হউক, রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ শুধু বেদান্ত নহে, শঙ্করও নহে, রামানুজও নহে। আর বাঙ্গলায় তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলার প্রাণ ও বাঙ্গালীর ধর্মের নবযুগের অবতার বলিয়াই শঙ্কর বা রামানুজের (বেশীর ভাগ জার্মান বা ইংরেজী তর্জমার) প্রতিধ্বনি হইতে পারেন নাই। তাঁহারা আসিয়াছিলেন—যেমন যুগে যুগে তাঁহারা আসিয়া গিয়াছেন, যেমন প্রতি পলে পলে

তাঁহারা আসিতেছেন। তাঁহারা কোন মতবাদ নহেন—তাঁহারা জীবন। মত হইতে জীবন অনেক স্বতন্ত্র—অনেক বড়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদও নহেন, বিশিষ্ট অদ্বৈত-বাদও নহেন, তাঁহারা তাহাই—যাঁহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া পরবর্তীয়েরা অদ্বৈতবাদ অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন। ইঁহারা এক, অথচ ইঁহারা বহু—অসংখ্য। ইঁহারা স্বাভাবিক বিকাশ। ইঁহারা সকলের। ইঁহারা বিশেষ করিয়া বাঙলার ও বাঙালীর। কেননা ইঁহারা কালীর উপাসক এবং রাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইঁহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব। অথচ ইঁহারা এক-দিকে দেশকালের অতীত। শুধু সার্বভৌমিক হওয়া কি কথা! ইঁহারা কেবল ব্যাসসূত্র বা কেবল শাঙ্কর-ভাষ্য নয়, যেহেতু ইঁহারা শাক্ত ও বৈষ্ণব, কাজেই ইঁহারা আগম ও পুরাণ। আগম ও পুরাণ-নির্দিষ্ট জীবন্ত বিগ্রহ। ইঁহারা কোন সুদূর অতীতের পথে বাঙালীকে ফিরিয়া যাইবার কথা বলেন নাই। পৌরাণিক যুগে প্রত্যাবর্তন ইঁহাদের ইঙ্গিত নয়। ইঁহারা কেবল বুদ্ধ ও শঙ্করের চিতাভস্ম উড়াইয়া বাঙালীর ধর্মক্ষেত্রকে অযথা ধূলিসমাচ্ছন্ন হইতে দেন নাই। চলার পথেই ইঁহারা জাতিকে চালিত করিয়াছেন। স্রোতে ইঁহারা তরঙ্গ তুলিয়াছেন। প্রবাহকে ইঁহারা বাধা দেন নাই, অগ্রসর করিয়াই দিয়াছেন।

বাঙালীর প্রাণধর্মের—স্বভাবধর্মের সহজ ও সরল পথে হাঁটিয়া, তথাকথিত পৌরাণিক যুগের আবর্জনার মধ্য দিয়া অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া ইঁহারা সমগ্র জাতিকে নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। ইঁহারা দেখাইলেন উপনিষদ হইতে, শাঙ্কর-ভাষ্য হইতে বাঙালীর আগমে ও পুরাণে ধর্মের আরো বিচিত্র বিকাশ হইয়াছে। তাহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না অস্বীকার করিলে চলিবে না। অবশ্য স্থানে স্থানে অতিক্রম করিতে হইবে। সংস্কারযুগ, বাঙালীর আগম ও পুরাণের যে ধর্মের অভিব্যক্তি—তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে না পারিয়া বাঙলার ধর্মসংস্কার ক্ষেত্রে সহসা উপনিষদ ও শাঙ্কর-ভাষ্য আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহা অযথা সাহস। ইহা দুঃসাহস। তবুও বুঝি ইহারও প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ বেদান্তে ফিরিয়া যাওয়া নহে, তন্ত্র ও পুরাণ বর্জন নহে এই সমস্তের মধ্য দিয়া বাঙলার বিশেষ দুই সাধন পথকে ভবিষ্যতের এক মহা সমন্বয়ের দিকে পৌঁছাইয়া দেওয়া। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের সাধনা শতাব্দীর শেষভাগে তাহাই করিয়াছে।

একথা সত্য যে রামমোহনেও পুরাণ, আগম ও স্মৃতি এমন কি রঘুনন্দন পর্যন্ত বিদ্যমান। বিবেকানন্দও পুরাণ তন্ত্রের বিরোধী নহেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণে বাঙালীর শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার যে রূপান্তর আমরা দেখিয়াছি, তাহা হইতে গৃহী রামমোহন ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, নিশ্চয়ই অনেকাংশে পৃথক্। সুতরাং যে যুগে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধনায় ও ধারায় রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে, সে যুগকে আমি কেবল এক

অদ্বৈতবাদই হউক আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই হউক, বেদান্তের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না। আমি মনে করি পুরাণ ও আগমের যুগ কোনো কোনো দিকে বেদান্তের যুগ হইতে বিচিত্র বিকশিত ও উন্নত। সে কথা বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে। কে জানে, কে বলিতে পারে যে বাঙ্গালীর দুই বিশেষ সাধন ধারার মধ্যে জগতের সকল ধর্মের যে অপূর্ব সংস্থান ও সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বেদান্তের পূর্ব পূর্ব যুগ অপেক্ষা তুলনায় বড় হইবে কি ছোট হইবে। রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ যুগের ধর্ম-সমন্বয় এখনও ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শুধু উপেক্ষা করা সুবিচার নহে। আর তাঁহাদের সংখ্যাও বেশী নয়, যাঁহারা এক অতি জটিল সমস্যাপূর্ণ যুগের ধর্ম-সমন্বয়কে বিচার অতি সহজেই করিতে পারেন। সুতরাং সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী কেবল এক বৈদান্তিক যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

আমি শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছি। এই ধর্মসংস্কারের বিচিত্র সৌধের ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ইহার আর একটি প্রকোষ্ঠে সমাজ-সংস্কারের যে লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছি যে, গত শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ প্রসঙ্গ, অনবধানতাবশতঃ নহে, স্থান সংক্ষেপ ও আমার অক্ষমতা বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ সংকীর্ণ স্থান পাইবার যোগ্য। যে রামকৃষ্ণ-যুগের চিহ্নিত প্রচারক হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে সাহসী হন নাই, যে বিজয়কৃষ্ণের অদ্যাবধি কোন বিবেকানন্দ আসিয়া দেখাই দিল না, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ যদি কোন অজ্ঞাত কারণে কেবল বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিয়া থাকেন, তথাপি রাজা রামমোহনের বাক্য স্মরণ করিয়া আমি বিদ্বেষপরায়ণ, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গকারীদিগের প্রত্যুত্তর দিতে বিরত হইব। এক্ষেত্রে রামমোহনের ভাষায় আমাকে বলিতে হইতেছে যে—"সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে, আর আমাদিগের জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি, পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।"

সমাজ সংস্কার

আলোচ্য শতাব্দীর প্রথমে ও শেষে, রামমোহন ও বিবেকানন্দ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ লইয়া যুগপৎ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান

হইয়াছিলেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই আত্মাকে ব্রহ্ম জানিয়া আত্মায় পরমাত্মায় অভেদ চিন্তনরূপ উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপে আত্মাকে পরমাত্মা ভাবিয়া উপাসনা করিলে কেবল যে ধর্মের সংস্কার হইবে তাহা নহে, সমাজক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এক আশ্চর্য সংস্কার সংসাধিত হইবে। রামমোহন ও বিবেকানন্দ যে শাঙ্কর অদ্বৈত সাধনার প্রচলনের জন্য এত মতে যত্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল। সেই অভিপ্রায় হইতেছে সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রের সংস্কার। তবে রামমোহন মায়াবাদকে প্রয়োগ করিয়াছেন মূর্তি ও বহু দেবদেবীকে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর-জ্ঞানে যে ভ্রমাত্মক পূজা তাহার বিরুদ্ধে। আর বিবেকানন্দ মায়াবাদকে প্রয়োগ করিয়াছেন ইউরোপের ইহকাল-সর্বস্ব ভোগবাদ ও জড়বাদের যে আত্মঘাতী অনুকরণ বাঙলায় দেখা দিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে। মায়াবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র রামমোহন ও বিবেকানন্দে স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে রামমোহন হইতে বিবেকানন্দে পেঁাছিতে সময়ের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজ কালস্রোতে নিরন্তর পরিবর্তিত হইয়াই চলে। চলার পথে স্রোতাবর্তে শৃঙ্খলাকেও রক্ষা করে।

রামমোহনে যে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, বিবেকানন্দেও মূলতঃ তাহাই। রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই মূলে শঙ্করানুগামী। তথাপি শঙ্কর হইতে তাঁহাদের যে যে দিকে প্রস্থান আমরা কল্পনা করিতে পারি, তাহার বিষয়ে পূর্বে আমি বলিয়াছি। কিন্তু ঐ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নহে, কেননা তাহা বিশেষভাবে সামাজিক উদ্দেশ্য-মূলক। প্রকৃত অদ্বৈতবাদ উদ্দেশ্যমূলক নহে। দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিতে গিয়া, এই সিদ্ধান্ত আমার নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যদি ধরা যায় শঙ্করাচার্যই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তবে কি তাঁহার সেই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের কোন সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল না? বৌদ্ধধর্ম নিরসন যদি তিনি জ্ঞাতসারে না করিয়া থাকেন, যদিও আমার বিশ্বাস তিনি জ্ঞাতসারেই তাহা করিয়াছেন, তথাপি ভারতের ধর্মের ইতিহাসে তাঁহার অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের ফল কিরূপে দেখা দিয়াছে? নিশ্চয়ই তাহা এক গুরুতর সমাজসংস্কারও সাধন করিয়াছে! আবার যদি ধরা যায়, বুদ্ধদেবেই প্রকৃত অদ্বৈতবাদ, যিনি অদ্বয়-সিদ্ধি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে কি বুদ্ধদেবের অদ্বয়-সিদ্ধি ও নীতিবাদ এক অতি যুগান্তকারী অদ্ভুত সমাজ-বিপ্লব সাধন করিয়া যায় নাই? কি বুদ্ধদেব, কি শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ সংশ্লিষ্ট ধর্মের ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবীরূপে এক অভূতপূর্ব সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস অনুস্যূত রহিয়াছে। রামমোহন ও বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন। আর যদি তাহা নাও জানিয়া থাকেন—যদিও এরূপ সম্ভব বলিয়া

আমি মনে করি না, তথাপি তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ প্রচারের মূলে একটা স্পষ্ট সমাজ-সংস্কাররূপ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া, আমি ইহা প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নয় এরূপ মনে করিতে পারি না। যদি শঙ্কর হইতে রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদে কোনরূপ সামান্যমাত্র বিশেষত্ব বা মৌলিকত্ব না থাকে, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, তাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ও শেষে শঙ্করের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ প্রচার সমাজ-সংস্কাররূপ উদ্দেশ্যপূর্ণ বলিয়া তাহা প্রকৃত অদ্বৈতবাদ নহে, এরূপ মনে করা এইজন্য সংগত নয় যে, যাঁহারা প্রকৃত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতেছে, সেই বুদ্ধ-শঙ্করের অদ্বয়-সিদ্ধি ও অদ্বৈতবাদ প্রচারও একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে, বরং ইতিহাস জ্বলন্তভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে তাহাদের অদ্বৈতবাদ প্রচারে ভারতের সমাজক্ষেত্রে বিপুল আবর্জনা দূরীভূত হইয়া এক অত্যাশ্চর্য সংস্কার দেখা দিয়াছে। দার্শনিক মতবাদ অতি অল্প দেশেই এরূপ বিরাট সমাজ-সংস্কার সাধন করিয়াছে।

সমাজ-সংস্কার পাপ নহে! রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সহায়ে গত শতাব্দীতে এক বিরাট সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাহার আশানুরূপ ফল হয় নাই। সে দোষ তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের বেশী। কিন্তু কেবল কৃতকার্যতা দ্বারা ইতিহাস মাত্র কয়জন সংস্কারককে চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে পারে? ইতিহাসে কৃতকার্যতাই কি মাপকাঠি? আমার মনে হয় না। যাঁহারা অকৃতকার্য হইয়াছেন—ইতিহাসে এমন অনেক আছেন, যাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বড়। বাংগালী সমাজে বিধবা বিবাহ চলিল না, ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই অকৃতকার্যতার ফুটের ফিতা হাতে করিয়া সেই সমুদ্রের গভীরতা, সেই গগনস্পর্শী গিরিশিখরের উচ্চতা মাপিতে যাওয়া কি বাতুলতা নহে? রামমোহন হইতে বিবেকানন্দে আসিবার পথে দেখিতে হইবে যে ইঁহারা কোথায় কোন্ আচার ও ব্যবহারকে অব্যাহত রাখিতে যত্ন করিয়াছেন এবং কোন্‌গুলিকে বা পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কিছু ভাঙিতে হইবে, কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে, কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহা আবশ্যক। অবশ্য মৃতের চিতা সংকারের ব্যবস্থা অন্যরূপ। কিন্তু রামমোহন ও বিবেকানন্দ তাহা দিয়া যান নাই। তাঁহারা আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃষ্ট উপায় সকলই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর এই জন্যই তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে সমাজ-সংস্কারের সুস্পষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত রহিয়াছে।

সমাজ-সংস্কারে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ভিত্তি—রামমোহন

আমাদের এখন এই প্রসংগে তিনটি প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। (১) সমাজ-সংস্কার বস্তুটি কি? (২) ধর্মসংস্কারের সহিত সমাজ-

সংস্কারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? (৩) অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি হইতে পারে কিনা?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আমি প্রধানতঃ বাঙ্গলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকদের মীমাংসার উপরেই নির্ভর করিব. এবং আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এরূপ করিতে গেলে প্রথমেই রাজা রামমোহনকে উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গে রামমোহনের উল্লেখ বড় সহজ কার্য নহে। স্বভাবতঃই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন। অথচ কর্মক্ষেত্রে তাঁহাকে বহুবিধ সংস্কারকার্যে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এজন্য তাঁহার সংস্কারের আদর্শ ও প্রণালী সকলের পক্ষে সুগম হইয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর রাজার অনুবর্তীদের মধ্যে রাজার সমাজ-সংস্কার দুইটি পরস্পর সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। একদল বলেন যে, রাজার সমাজ-সংস্কারের কোন উন্নত আদর্শই ছিল না। তিনি স্বাধীন চিন্তাবাদী ছিলেন না। এখানে সেখানে দু' একটা সংস্কারের কথা তিনি বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সংস্কারের কোন বিশিষ্ট প্রণালী তিনি অবলম্বন করেন নাই। যাহা তিনি মনে মনে স্পষ্ট বুঝিতেন, তাহাকেও একটা শাস্ত্রীয় আবরণ ভিন্ন বলিতে সাহস করিতেন না, তা সে জাতিভেদই হউক, বহু বিবাহই হউক, স্ত্রীজাতির স্বত্ত্বাধিকার বিষয়েই হউক, এমন কি মদ্যপান. শৈব-বিবাহ প্রসঙ্গেই হউক। সতীদাহ নিবারণকল্পেও তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতি উদ্ধার করিতে গেলেন। আর আচরণে আজন্ম হিন্দু-সমাজের আনুগত্য দেখাইয়াছেন। হিন্দু-সমাজ হইতে পাছে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, এজন্য সর্বদাই সতর্ক হইয়া চলিতেন, সুতরাং তিনি আদর্শ সমাজ-সংস্কারক নহেন। ব্রাহ্মধর্মের যাঁহারা দর্শন লিখিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সমাজের যাঁহারা ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদেরই এই মত।

অপরপক্ষে একদল বলেন যে, রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়মূলক এমন এক অত্যাশ্চর্য সমাজ-সংস্কারকের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে আর কোন সমাজবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত করিতে পারেন নাই। সমাজ-সংস্কারের অনেক বিষয়ে, আমাদের দেশের ত কথাই নাই, পাশ্চাত্য দেশের বেন্থাম ত অল্প, হার্বার্ট স্পেনসার ও হেগেল দর্শনকেও রামমোহন অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রুশো ভল্টেয়ার প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের স্বাধীন চিন্তাবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের যে সমস্ত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, রামমোহন তাহা বাঙ্গলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সংশোধন করিয়া তবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইখানেই রামমোহনের সংস্কারের সর্বাপেক্ষা বড় এবং গৌরবময় বিশেষত্ব। রামমোহনের বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনবরেণ্য মহাজ্ঞানী, রামমোহন-শিষ্য, বিবেকানন্দ-বন্ধু বাঙ্গালী অধ্যাপকের নিকট হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথাই বলিতেছি। আমার জীবনে, যদিও আমি অল্পই দেখিয়াছি, এত বড় জ্ঞানের অবতার আর কোথাও দেখি নাই।

তথাপি রামমোহনের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ আমি উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন একটিকেও আমি অবিকল গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। প্লেটো, আরিস্টটল্ হইতে স্পেনসার, হেগেল অবধি যেমন রামমোহনের মস্তিষ্কের মধ্যে ঠাসিয়া দিবার কোন আবশ্যকতা আমি দেখি না, তেমনি সমাজসংস্কারে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংস্কার-প্রণালীকে তাচ্ছিল্য করিবারও কোন কারণ দেখি না। রামমোহনের সমাজসংস্কার-প্রণালী সম্বন্ধে উল্লিখিত উভয়বিধ মতবাদই কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে একদেশদর্শী। যাঁহারা দোষ দেখিয়াছেন তাঁহারা গুণ দেখেন নাই, যাঁহারা গুণ দেখিয়াছেন তাঁহারা দোষ অবশ্য একটু কম দেখিয়াছেন। তথাপি কল্পনার বাহুল্য একটু কমাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদকে গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। কেননা এই মতবাদই সত্য বলিয়া রাজার রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা যায়। যাহা হউক, রামমোহন আমাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া গিয়াছেন যে, "তোমরা শিক্ষিত হও যে কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না।" সংস্কারের প্রণালী সম্বন্ধে, শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় রাজা রামমোহন যেরূপ উল্লেখ ও অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহা আমি পূর্বে অতি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহনকে এ-যুগের সর্বপ্রথম সংস্কারক বলিয়া একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা শুধু কেবল ভগিনী নিবেদিতার কাছেই তিনি বলেন নাই। রাজার পরবর্তী অন্যান্য ব্রাহ্ম-সংস্কারকদিগের অপেক্ষা তাঁহার পার্থক্য ও বিশেষত্বের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহনের সংস্কারের মধ্যে একটা কিছু সৃজন করিবার, গড়িয়া তুলিবার শক্তি ছিল যাহা তাঁহার পরবর্তীদের মধ্যে ছিল না। রামমোহনের সংস্কার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই সিদ্ধান্ত। তবে রামমোহন যে আমাদের অনেকগুলি সামাজিক সমস্যাকে, সামাজিক দুর্গতিকে ধর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলিয়া, সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্মের মূলচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, স্বামিজীর মতে এইখানে রামমোহন ভুল করিয়াছিলেন। শুধু রামমোহন নয়, এইখানে বুদ্ধদেবও নাকি ভুল করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘের স্বামী সারদানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের দেশে প্রচলন করিতে দিয়া রামমোহন নাকি আরো একটা গুরুতর ভ্রম করিয়া গিয়াছেন। স্বামিজীর মতে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচলিত হইলে আমরা

এত সহজে জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতাম না! যে-কোন কারণেই হউক, স্বামিজীর মতে বিজাতীয় হইয়া উঠা ভাল নহে।

রামমোহনের সংস্কার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই সমস্ত মতামত সমালোচনার অতীত নহে কিন্তু এখানে আমি ইহা উদ্ধার করিয়া ইহা আপনাদের নিকট প্রতিপন্ন করিতে চাই যে সমাজসংস্কার সম্পর্কে রামমোহন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। অনেকে এ বিষয়ে ইঁহাদের যে একটা ভাবগত যোগ ছিল তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। এই সম্পর্কে আমেরিকার 'থাওজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে' জনৈকা শিষ্যার নিকট স্বামিজী বলিয়াছিলেন—

"সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। * * * তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজ স্থাপন করেন। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। * * * তিনি নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না।"

সুতরাং আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দ বিশেষরূপে সচেতন। উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট যোগসূত্র বিদ্যমান।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে সমাজসংস্কার বস্তুটি কি? এ সংসারে অণু-পরমাণু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কিছুই স্থির হইয়া বসিয়া নাই। মনুষ্য-সমাজ পরিবর্তনশীল। রাজা রামমোহন তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের গতিবিধি পর্যালোচনা করিয়া সমাজের এই স্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রতি তাঁহার সমকালীন মহাত্মাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেননা কি রামমোহন যুগে, কি বিদ্যাসাগর যুগে, কি কেশবচন্দ্রের যুগে বা কি বিবেকানন্দ যুগে, এমন একদল লোক দেখা যায়, যাহাদের বিশ্বাস সমাজ চিরদিনই একভাবে চলিয়াছে, ইহার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজের কোন গতিবিধি আছে কিনা, অনেকে তাহাও জানেন না। জানিলেও তাহা মানেন না। কেননা মানিলে পর কাজ করিতে হয়। বসিয়া থাকা চলে না। অথচ তাহাদের বিশ্বাস বসিয়া থাকিলেও চলে। সমাজের এই স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে সমাজস্থ মনুষ্যদিগের সজ্ঞানে এবং সচেষ্টায় প্রচলিত পথ হইতে আবশ্যক মত অন্য কোন ভিন্ন পথে চলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং তাহা কর্তব্য হয় কিনা এ বিষয়েও অধিকাংশেরই মত সুস্পষ্ট নহে। রাজা রামমোহন বলিতেছেন—

"ইহা পশুজাতীয়ের ধর্ম হয় যে সর্বদা স্ব-বর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করে। মনুষ্য, যাহার সৎ-অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে, সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা

না করিয়া স্ব-বর্গে করেন, এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকার্য নির্বাহ করিতে পারে। এই মত সর্বত্র সর্বকালে হইলে পর পৃথক পৃথক মত এ পর্যন্ত হইত না। বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে একজন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয়। আর স্মার্ত ভট্টাচার্যের পর যাহাকে একশত বৎসর হয় না, যাবতীয় পরমার্থকর্ম, স্নান, দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্বমতের ভিন্ন প্রকার হইতেছে।"

রামমোহনের এই সাধারণ উক্তিটির মধ্যে আমরা সমাজসংস্কার বস্তুটি কি তাহার একটি সুসম্পূর্ণ এবং অতি সুসংগত উত্তর পাই। এই উক্তিটির মধ্যে (১) সমাজের একটি গতি স্বীকার করা হইয়াছে। (২) সমাজের একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন স্বীকার করা হইয়াছে। (৩) সমাজের পরিবর্তনে ক্রিয়ার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া সৎ-অসৎ বিবেচনা বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের কর্তব্য ও দায়িত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। (৪) সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তের মতপার্থক্যে, একই সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। (৫) ইহাতে তৎকালীন শাক্ত, বৈষ্ণব ও রঘুনন্দনের সহিত তৎকালীন বাঙালী সমাজের একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক চিত্রও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

আমি রামমোহনের এই উক্তিটির এত বিশদ বিশ্লেষণ এইজন্য করিলাম যে, তখন সমাজবিজ্ঞান পাশ্চাত্যদেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও আতুর-ঘরের বাহিরে আইসে নাই। আর রামমোহনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া সমাজ সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে। প্রতিভা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অনন্য-সাধারণ। সাধনসাপেক্ষ হইলেও প্রতিভা আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। রামমোহনের এই উক্তির মধ্যে ও অন্যত্র অন্যান্য রচনাবলীতে সমাজবিজ্ঞানের পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়।

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, ধর্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা?

রামমোহন মহাত্মা ডিগবীর নিকট চিঠিতে বলিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাধিকারের জন্য আমাদের মূর্তি ও বহু দেবদেবীর পূজার মধ্যে একটা আশু ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজন। তাঁহার কথা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ধর্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কার এমন কি রাষ্ট্রের সংস্কারও অনুস্যূত। রাষ্ট্র, ধর্ম, প্রভৃতি সমাজের এই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ তত্ত্বও রামমোহন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, রামমোহন ধর্মকে সমাজের এই শরীরের একটা অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। আর তাহাই আধুনিক মত। সমাজবিজ্ঞান ভূমিষ্ট হইবার প্রাক্কালে, স্বাধীনভাবে সমাজ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কত বড়

উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক তাহা প্রত্যেক সমাজতত্ত্ববিদই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং সমাজ-সংস্কারের এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

এখন তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি হইতে পারে কিনা? রামমোহনের রচনা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। কেননা, তাঁহার রচনার মধ্যে এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ স্ববিরোধিতা একটু অনুধাবন করিলেই লক্ষিত হয়।

আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, রামমোহনের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। আর বস্তুতঃ শুদ্ধ চিন্তার রাজ্যেও কোন দার্শনিক মতবাদ একেবারে সামাজিক উদ্দেশ্যশূন্য ইহা ইতিহাস আলোচনায় আমার চক্ষে পড়ে নাই। রামমোহন ধর্মসংস্কারের জন্যই অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ গ্রহণ ও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই অদ্বৈতবাদের প্রতি একটা সহজাত ঝোঁক ছিল। আর ধর্মের সংস্কার দ্বারাই যে সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও সংস্কারের সম্ভাবনা আছে; এমন আভাসও তিনি ডিগবীর নিকট চিঠিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে গৌণভাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের সংস্কারও সম্ভব। কিন্তু লর্ড আমহার্স্টের নিকট চিঠিতে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ, বিশেষভাবে মায়াবাদ একটা মিথ্যা কাল্পনিক বিদ্যা। যে বিদ্যার চরম সিদ্ধান্ত এই যে পিতা-মাতা-ভ্রাতা সব মিথ্যা, মায়া ও ভ্রম, সে বিদ্যার বলে কখনও গার্হস্থ্য ও সমাজজীবন উন্নত হইতে পারিবে না এবং ঐ বিদ্যা এদেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিলে উন্নতির পরিবর্তে আমরা সেই এক অজ্ঞান অন্ধকারেই থাকিয়া যাইব। ইহার সহিত যদি বিবেচনা করা যায় যে, রামমোহন কত স্থানে বলিয়াছেন যে, হিন্দুর দর্শনের দিকটা উন্নত হইলেও নীতির দিকটা সমধিক অবনত, পরন্তু খৃষ্টান নীতিবাদ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ-যুগে গ্রহণ করা অতি আবশ্যক, তাহা হইলে স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে রামমোহন বৈদান্তিক মায়াবাদের উপর আমাদের এ যুগের সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই।

এখানে তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কারে মায়াবাদ অস্বীকার —ইহার মধ্যে অনেকে একটা অসঙ্গতি দেখিয়াছেন। এই অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন যে, রামমোহন নির্গুণ ও সগুণ এই উভয় দিকেই সমান জোর দিয়াছিলেন। তাঁহারা রামমোহনের এই উক্তিটি উদ্ধার করেন—

> "জগতের স্রষ্টা, ত্রাতা, সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন। অথবা সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।"

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম, সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়ের প্রতি রামমোহনের সমান দৃষ্টি। এই সগুণ ঈশ্বরকে তিনিই আবার অন্যত্র বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের এই গুণ কল্পনা একটা অপবাদ মাত্র এবং ইহা কেবল প্রথম অধিকারীর বোধের নিমিত্ত হয়। সুতরাং

সগুণ ঈশ্বর রামমোহনের মীমাংসা নয়। পরিণামবাদও রামমোহনের মীমাংসা নয়। শঙ্করানুবর্তী রামমোহনের সিদ্ধান্ত নিরাকার নির্গুণবাদ ও বিবর্তবাদ এবং এই বিবর্তবাদকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে তিনি মায়াবাদে উপনীত হইয়াছেন। মূর্তিপূজা ও দেবদেবী পূজার বিরুদ্ধে এই মায়াবাদ তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে ইহাকে মিথ্যা ও কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে স্ব-বিরোধিতা, যে অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না। তবে ব্যবহারিক জগতেও "লোকযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত"—"চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদি দ্বারা অবশ্য করিতে হয়", তাঁহার এই সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সমাজ-সংস্কার সম্ভব বলিয়া মনে করি। মায়াবাদী হইলেই কর্ম-সন্ন্যাস লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। জীবন্মুক্ত হইলেও যদি ব্রহ্ম জীবের নিকট সাধনীয় থাকিয়া যান, তবে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তিষ্কের কর্মও কেননা সাধনীয় থাকিবে? বিশেষতঃ রামমোহন "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবার জন্য" উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কেবল সন্ন্যাসীই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন তাহা নহে। গৃহীরও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার অধিকার আছে। এ যুগে তাহাই হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে তাহার বড় প্রয়োজন। আমাদের দেশে রামমোহনের কালে ইহা খুব বড় কথা। ইহা খুব বড় এক সমাজসংস্কার। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তী মায়াবাদী হইয়াও যদি গৃহী হইলেন, তবে সেই গৃহী কিছু একা গৃহে বাস করিতে পারেন না। পরিবারস্থ হইয়া তাঁহাকে বাস করিতে হয়। মনুষ্য-পরিবারে স্ত্রী-পুরুষ একত্র বাস করে। কেবল পুরুষে গার্হস্থ্য হয় না। গার্হস্থ্যে নারীও পুরুষের সহযোগী। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তী গৃহী রামমোহন সমাজ-সংস্কারে, নারীজাতির তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার সংস্কার অপরিহার্য দার্শনিক কারণ ও সামাজিক অভাব পূরণের জন্যই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রধান সমাজ-সংস্কার এবং বিগত শতাব্দীর সর্বপ্রধান জাতীয় কলঙ্ক। অদ্বৈতবাদের ভিত্তির উপর সমাজ-সংস্কারকে দাঁড় করাইলে, প্রত্যেক আত্মাই পরমাত্মার সহিত অভেদ হইলে পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই সমান। এই পারমার্থিক দৃষ্টিকে ব্যবহারিক জগতে সম্প্রসারিত করিলেই জাতিভেদে মনুষ্যভেদ করা অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। 'বজ্রসূচী' গ্রন্থে রাজা জন্মগত জাতিভেদের যে অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন তাহার মূলেও জাতিধর্ম অপেক্ষা নবযুগের মানবধর্মের, মানবের জন্মগত সমান অধিকারের—এক কথায় মানবত্বের প্রেরণার এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের পারমার্থিক জ্ঞানও বিদ্যমান। অদ্বৈত-বেদান্তের ভূমিই বর্তমান মানবের সমান অধিকারের একমাত্র ভিত্তি।

লর্ড আমহার্স্টের নিকট চিঠিতে মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামমোহন যাহাই

লিখিয়া থাকুন এবং খৃষ্টান নীতিবাদের যতই পক্ষপাতিত্ব করুন, তাঁহার অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে যৎকিঞ্চিৎ স্ববিরোধিতা দোষ থাকা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কারে রামমোহন অদ্বৈত-বেদান্তের ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জেরেমী বেন্থামের সহযোগী রামমোহনের সামাজিক নীতিবাদে মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত "লোক-শ্রেয়ের" আদর্শেও বেন্থামের নীতিবাদের "অধিকতর লোকের অধিকতর সুখ" এবং বাইবেল-উক্ত খৃষ্টান নীতিবাদ অপেক্ষা একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। রামমোহনের সামাজিক নীতিবাদের মধ্যে অদ্বৈত-বেদান্তের প্রেরণা কষ্টকল্পিত হইলেও একেবারে যে নাই, এমন কথা কে বলিতে পারে? তবে খৃষ্টান নীতিবাদের দিকে—যাহা বলে, "তোমার উপর অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার কর" রামমোহন বেশী ঝোঁক দিয়াছেন বলিয়া এই প্রেরণা সুস্পষ্ট নহে, অস্পষ্ট। কাজেই আমি অন্যত্র ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রতিবাদও করিয়াছি।

যাহা হউক রামমোহনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারক নহেন। রামমোহনের পরে সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর। দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহনের অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদে সমাজ-সংস্কার অসম্ভব বলিয়া নহে, তাহার কারণ আত্মা-পরমাত্মা অভেদ হইয়া গেলে কে কাহার উপাসনা করিবে? আর অদ্বৈত-বৈদান্তিকেরা "ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে" বলিয়া ব্রাহ্মধর্মকে এই মতবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম-সংস্কারের সহিত সমাজ-সংস্কারের যে অঙ্গাঙ্গী যোগ রামমোহন দেখিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পান নাই। দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সমাজ-সংস্কারে সম্পূর্ণ নহে—অসম্পূর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-সংস্কারেই সৎ-অসৎ বিবেচনা করিয়া, ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা "স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য করিয়া" গিয়াছেন। এক্ষেত্রে রামমোহনের মত মনীষা তাঁহার ছিল না অথবা রামমোহনের মত ব্যবহারিক জগতের এত বিভিন্ন দিকের কর্মীও তিনি ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র ছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানে তাঁহার সহিত বিহার করা। এই সৌন্দর্যানুভূতি সমগ্র শতাব্দীতে মহর্ষির মহিমাকে চিরপূজ্য করিয়া রাখিয়াছে।

তথাপি রামমোহন যেমন ধর্মকে সমাজের একটি অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়াছেন এবং ধর্মের সংস্কার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্যই প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন—যাহা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডিগবী সাহেবের নিকট চিঠিতে* তিনি প্রকাশ করিয়াছেন

---

*"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divi-

—দেবেন্দ্রনাথ তাহা কিছুই মনে করেন নাই। তিনি ধর্ম-সংস্কারে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু সমাজ-সংস্কারে কথঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে ফিরিয়া আসিয়া মূর্তিপূজা আরম্ভ করিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, "একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্ম-ধর্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন"। দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিতই এক্ষেত্রে রামমোহনকে ভুল বুঝিয়াছেন। যে পৌত্তলিকতা পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কার নাই, রাজনৈতিক উচ্চাধিকার লাভের চেষ্টা নাই তাহা রামমোহনের ব্রাহ্ম-ধর্ম নহে। তাহা দেবেন্দ্রনাথের ও তদনুবর্তীদের ব্রাহ্মধর্ম হইতে পারে এবং হইয়াছেও তাহাই। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর নিকট একখানি পত্রেও দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, "জাতিভেদ যে না থাকে তাহা আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে। আমাদিগের লক্ষ্য যে জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়"। অথচ "জাতিভেদ যে না থাকে" ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে 'বজ্রসূচী' চটি গ্রন্থে রামমোহনের বিশেষরূপেই মুখ্য লক্ষ্য ছিল।

সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগর

এইবার আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক সিংহবীর্য, স্বাতন্ত্র্য ও পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার—রামমোহনের পরে সর্বপ্রধান সমাজ-সংস্কারকের সমীপ-বর্তী হইতেছি।

শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার সমাজে এক ভূমিকম্প হইল। যেন সহসা আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে এক গৈরিক স্রাব নির্গত হইল। বিদ্যাসাগর বলিলেন যে, বিধবার বিবাহ দিতে হইবে এবং শাস্ত্রে তাহার সমর্থন আছে। বাঙ্গালী ভয় পাইল। চীৎকার করিয়া উঠিল। কেননা, রামমোহনের সতীদাহ নিবারণের পর এত বড় সিংহগর্জন বাঙ্গালী আর শুনে নাই।

বিধবা-বিবাহ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সংস্কার নহে। কেননা, বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম ছিলেন না। তাঁহার ধর্মমত সুস্পষ্টরূপে আমরা জানিতে পারি না। 'বোধোদয়ে'র ধর্মমত ঠিক তাঁহার নিজের ধর্মমত কিনা কে বলিতে পারে? "ঈশ্বর নিরাকার

---

sions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feelings, and the multitude of religious rite and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them, from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort." *Extract from a letter to John Digby, England: Dated January* 18, 1828 *by Ram Mohan Roy.*

চৈতন্যস্বরূপ।" ইহাই 'বোধোদয়ে'র ধর্মমত। তাঁহার একজন জীবনচরিত লেখক বলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও গায়ত্রী জপ করিতেন না। এমন কি গায়ত্রী নাকি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নাকি নাস্তিক ছিলেন। ক্ষতি কি? কে মাথার দিব্য দিয়াছে যে দেশশুদ্ধ সকল আহাম্মকে মিলিয়া আস্তিক হইতে হইবে? এইরূপ এক প্রকার যুক্তি আছে যে, ঈশ্বরের উপরে আর কেহ নাই। সুতরাং এখন ঈশ্বরের নিজের যদি নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে তবে তাহা অহংজ্ঞান মাত্র। ঈশ্বরের অতিরিক্ত আর কিছু নাই বলিয়া পরমেশ্বর নিজেই নাস্তিক। অবশ্য যদি তাঁহার আত্ম-সম্বিৎ, আত্মজ্ঞান আমাদেরি মত থাকে। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয় সহসা এক আশ্চর্য ঘটনা বলিয়া মনে হয়। এই অভ্যুদয়ের যোগসূত্র নিরূপণ করা কঠিন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন, একক একজন মানুষ এই সাত কোটী বাঙ্গালীর মধ্যে হঠাৎ একদিন অভ্রভেদী পর্বতের মত গর্বিত শির লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখের কথায় সত্যই আমরা ভয় পাইলাম। দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে সহ্য করিবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আজিও নাই। আমরা বাঙ্গালী—স্বজাতীয়দের ভাব ও ভাষা বুঝি।

হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন মানুষের মত কথা বলিতে আরম্ভ করিল—এ বড় আশ্চর্য ও চমক্‌প্রদ। কিন্তু আমরা তাঁহার কথা—তাঁহার ব্যথা বুঝিলাম না। সমুন্নত গর্বিত শির লইয়া জীবনের কঙ্করময় পথে—সিংহ একাই চলিয়া গেলেন। কেহ তাঁহার সঙ্গী হইল না। বঙ্গ-বিধবার কত জন্ম-জন্মান্তরের শোকাশ্রু, যাহা কেহ চাহিয়া দেখে নাই তাহা তাঁহারই পঞ্জরাস্থির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া একদিন তাঁহারই বুক ফাটাইয়া দিয়া, ঋষিকেশের গঙ্গার মত বিরাট প্লাবনে বাঙ্গলাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গর্জিয়া চলিয়া গেল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই হিন্দু বিধবার বিবাহ আইনে পরিণত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার দুই ভ্রাতাকে বিধবা বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে রাজনারায়ণ বসু এই বিবাহের সংবাদ দেন। তাহাতে অমৃতসর হইতে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন যে, "এই বিধবা বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" দেবেন্দ্রনাথ এখানে বিধবা বিবাহকে 'সাধু ইচ্ছা' বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'কেশবচরিতে' লিখিয়াছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ পছন্দ করিতেন না। বিধবা বিবাহ তাঁহার অপ্রীতিকর ছিল।*

---

*"Debendra, however, could never reconcile himself to the idea of marrying widow, * * Widow-marriage was to him a disagreeable thing."—*By Protap Chandra Mazumder.*

কিন্তু যাঁহারা বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নামও আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত বিধবা বিবাহের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিলেন,— "আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবা বিবাহের শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। আমি যে এ সময়ে তথায় থাকিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র মনের উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমার এ দুঃখ কস্মিন্‌কালেও যাইবেক না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্ম না হইলেও—দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ এই তিনজন ব্রাহ্মনেতাই বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করিলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ—রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতি স্যার রাধাকান্ত স্বয়ং এবং আপামর সাধারণ—বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের প্রণালী কিরূপ ছিল? তিনি পরাশর-সংহিতা হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতে উদ্যত হইলেন। যথা—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে॥"

কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের এরূপ অর্থ করিলেন যে, যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া আছে অথচ বিবাহ হয় নাই, সেই ভাবী পাত্র যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয়, পতিত হয় তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত। আমাদের মনে হয় রক্ষণশীল পণ্ডিতদের এই ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত ও মিথ্যা। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহস্রবার সত্য হইলেও দেশাচার শাস্ত্রীয় প্রমাণে এত সহজে দূরীভূত হইল না। শাস্ত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও যুক্তির অপূর্ব সমন্বয়মূলক যে পদ্ধতি বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনকল্পে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রামমোহনের অবলম্বিত শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়মূলক পদ্ধতির অনুরূপ।

কিন্তু ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে, শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও, রাজশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কি রামমোহন, কি বিদ্যাসাগর কেহই সমাজ-সংস্কারে আশানুরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অতিরিক্ত আরো কিছুর আবশ্যক। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়। স্বামিজীর কথার ভাব এইরূপ যে বিধবারা জানে

—আমরা বিধবা নই। কাজেই সে সম্বন্ধে আমাদের বলপূর্বক হাঁ কিংবা না করিলে বিধবাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। তাহা অত্যন্ত অন্যায়। আমাদের মত পুরুষের কর্তব্য বিধবাদিগকে জ্ঞানে, ধর্মে স্বদেশীয়ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া তাঁহাদের নিজেদের বিষয় তাঁহাদিগকে ভাল-মন্দ বুঝিয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়া। বিধবারা জ্ঞানে-ধর্মে উন্নত হইয়া যদি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, উত্তম। তাঁহারা বিবাহ করিবেন সে ক্ষেত্রে কোনদিক হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করা কেহর কর্তব্য নয় আর যদি তাঁহারা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন—তাহা আরো উত্তম। সে বিষয়েও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার।* স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কার-প্রণালী—সাধারণভাবে যেরূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন বিধবা-বিবাহ ক্ষেত্রেও তদনুরূপ প্রণালীই প্রয়োগের তিনি পক্ষ-পাতী বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি।

স্বামিজী বলেন যে, "সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়?" বাহির হইতে—উপর হইতে জোর করিয়া কোন সমাজ-সংস্কার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহা স্বায়ী হয় না এবং তাহা সমাজ-বিজ্ঞান অনুমোদনও করে না। বিধবারা কি বিবাহ করিতে চান? বিধবা-বিবাহের পূর্বে স্বামিজীর ইহাই প্রশ্ন? বিধবাদের বিবাহ প্রচলন করিতে হইলে বিধবারাই তাহা করিবেন এবং সে বিষয়ে পুরুষদের কর্তব্য যে তাহারা কোন বাধা দিবে না। কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিক দিয়া, কি সমাজ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

তারপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। তাঁহার সংস্কার দশচক্রে হিন্দুর সংস্কার বলিয়াই গৃহীত হইতে পারিল না। অদ্বৈত ও মায়াবাদ ত দূরের কথা তিনি সমাজ-সংস্কারের ভিত গাড়িলেন একেবারে হিন্দু সমাজের বাহিরে গিয়া। বাঙ্গলা দেশে ব্রাহ্ম বিবাহ-বিধি আইনের তৃতীয় ধারা অনুসারে যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করেন তাঁহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু হিন্দু কিনা সন্দেহস্থল। কেহ বলিতে পারেন যে হিন্দু ব্যবস্থানীতির অধীনে কি তাঁহারা নহেন? অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরও এক নিঃশ্বাসে দেওয়া যাইতে পারে না। আর হিন্দু আইনের অন্তর্ভুক্ত হইলেই কিছু সকলে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা

---

*"I am asked again and again, what I think of the widow-problem and what I think of the Woman-question. Let me answer once for all—am I a widow that you asked that nonsense? Am I woman, that you ask me that question again and again?" "Of course women have many and grave problems, but none that are not be solved by that magic word "education."—"Who are to solve woman's problems, Are you the Lord God that you should rule over every widow and every woman? Hands off! They will solve there own problem."—*Swami Viveckananda.*

আইন পড়িয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই জানেন যে অনেক স্বদেশী খৃষ্টান সম্প্রদায়ও হিন্দু ব্যবস্থানীতির অন্তর্ভুক্ত।

সমাজ-সংস্কারে স্বামী বিবেকানন্দ

তারপর স্বামী বিবেকানন্দ। শতাব্দীর তখন অতি অল্পই বাকী। সেই সময়কার সমাজ-চিত্র অংকন করিতে গিয়া সংস্কারযুগের সমালোচনামূলক একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের শেষভাগে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু লিখিতেছেন—

"যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাইতেছি, যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস হইতেছে, যখন দেশীয়-সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে, যখন বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত, যখন উপজীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না, যখন সমাজ-সংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল, যখন আমাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষতঃ যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে; তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।"

এই সময় শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোর ধর্মমহাসভায়, গুরুকৃপায় জয়ী ও যশস্বী হইয়া, সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে অদ্বৈত ও মায়াবাদের বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিয়া যখন বিবেকানন্দ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন দেশব্যাপী অনেক সংস্কার-সভাসমূহ তাঁহাকে আপন আপন দলে টানিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু মাদ্রাজ প্রভৃতি অন্য প্রদেশ ত দূরের কথা এই বাংলার ব্রাহ্ম-সমাজের সহিতও তিনি বিরোধীয় না হইয়াও একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদের আপন আপন সমাজ সংস্কার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের গাত্রদাহ হইবে কেন? অবশ্য এরূপ গাত্রদাহ হয় বলিয়া আমার মনে হয় না। হইলে দুঃখের বিষয়, সন্দেহ কি। ব্রাহ্ম-সমাজকে তিনি হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন। আর যাঁহারা নিজেরাই বলেন যে তাঁহারা হিন্দু নন, তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দই বা কি করিতে পারেন? সংস্কার সম্প্রদায়গুলি হইতে পৃথক হিন্দু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একজন সন্ন্যাসী বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নিজেকে পরিচয়

দিয়াছেন এবং এই রক্ষণশীল বিরাট হিন্দু-সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিস্তর চিন্তা করিয়াছেন।

যেখানে স্বামিজী বলিয়াছেন আমি কোন সমাজ-সংস্কারক নহি, সেখানে তিনি এই হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সংস্কারের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। আবার যেখানে ছুঁৎমার্গের উপর ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের বর্তমান হেয় ব্যবধানের উপর তীব্র শ্লেষাত্মক কশা উদ্যত করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি ছুঁৎ-মার্গীদের দলে নই, সেখানে তিনি রক্ষণশীল সমাজকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামিজীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণায় আসিতে হইলে এই দুইদিকের প্রতি সমান লক্ষ্য না থাকিলে স্বামিজীর উপর অবিচার করা হইবে। বস্তুতঃ একদিক দিয়া ধরিতে গেলে সন্ন্যাসী কোন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত নহে। তথাপি সমাজকে ব্যাপক অর্থে ধরিলে সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই সমাজের অতীত বস্তু হইতে পারে না। যেহেতু সন্ন্যাসীরও মন বলিয়া একটা বস্তু আছে। আর ব্যক্তির মন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকে না। ব্যক্তির মনকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই—আর ক্রমোন্নতির জন্য ত বটেই—সমাজের অপরাপর ব্যক্তিদের মনের চিন্তার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থাকিতে হয়, বাঁচিতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ রাজা রামমোহনের পরে বাঙলায় সমাজ-সংস্কারকে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। রাম-মোহনের পরে, দীর্ঘ এক শতাব্দীর দীর্ঘতর সমাজ-সংস্কারের লীলাভিনয় যখন প্রায় সাঙ্গ হয় হয়, যবনিকা পড়ে পড়ে, সেই সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া মায়াবাদের উপর সমাজ-সংস্কারের সৌধ নির্মাণের যে অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে সমগ্র শতাব্দীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল।

আমি সপ্তম পরিচ্ছেদে অদ্বৈতবাদে নীতিবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামিজীর যে সমস্ত যুক্তির কথা অবতারণা করিয়াছিলাম, মায়াবাদে সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যও সেই সমস্ত যুক্তিই প্রধানতঃ অবলম্বন করা যাইতে পারে।

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী এবং জড়বাদীও বটে, ইঙ্গারসোলকে স্বামিজীর যে সমস্ত যুক্তির কথা অবতারণা করিয়াছিলাম, মায়াবাদে সমাজ-অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের পক্ষ হইতে যাহা বলিয়াছিলেন, বস্তুতঃ মায়াবাদে সমাজ-সংস্কারের তাহাই ভিত্তি। স্বামিজী ইঙ্গারসোলকে বলিয়াছিলেন—

"জড়বাদ অপেক্ষা, এই জগৎরূপ কমলালেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী আমি জানি। আর আমি এ থেকে বেশী রসও পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই সুতরাং বেশ ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার

কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি! সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কি আনন্দ, একবার ভেবে দেখুন দেখি।"

ইহা অবশ্য খুব প্রবল যুক্তি নয়। কিন্তু তাহা হইতেও উচ্চ অথবা স্বতন্ত্র—ইহা একটা অবস্থার কথা। সেই অদ্বৈত ও মায়াবাদের অবস্থায় যাঁহারা পোঁছাইতে অক্ষম—রামমোহনের মতে কেবলমাত্র সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই ইহা সম্ভব—তাঁহারা এক্ষেত্রে স্বামিজীর উপর বিশেষ সুবিচার করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করি না। কেননা, যে দেশে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে পরমহংসদেবের স্ত্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া গুরুতর অভিযোগ উত্থিত হইয়া আচার্য মোক্ষমূলারের মত পণ্ডিতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল, সেদেশে অদ্বৈত-বাদ ও মায়াবাদে সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি সম্ভব কিনা, এ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ জাগে তবে আমাদের আশ্চর্য হইবার কথা কি?

যে দেশে বুদ্ধ হইতে সকল ধর্ম-প্রচারক বলিয়া গিয়াছেন, নিষ্কাম হইয়া কর্ম কর, সেই দেশের বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ এবং মধ্যভাগে মহাত্মা ডফ্ যে বাঙলার সম্প্রদায়-বিশেষের কাণে কি মন্ত্র দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদে সমাজ-সংস্কার সম্ভব নয়, যাহার ফলে স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শতাব্দীর শেষভাগে একথা দেশ-বিদেশে চীৎকার করিয়া বলিতে হইল যে—তোমরা শুন, অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদেও সমাজ-সংস্কার সম্ভব। স্বামিজী এই বাঙলার এবং বাঙলার বাহিরে এই বিরাট হিন্দু-সমাজের প্রতি যেরূপ উদারভাবে, যেরূপ ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কল্পনাতে তাহা মনে করিয়া কাহার না হৃদয় স্তম্ভিত হয়? তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিতেন, "সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়?" সমাজের এই স্ত্রী-শূদ্রের অভ্যুত্থানের জন্য তিনি বিনিদ্র নিশায় মর্মে মর্মে কি যে বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার ক্ষমতা নাই যে আপনাদের নিকট ভাষায় ব্যক্ত করি। স্ত্রী-শূদ্রকে খাদ্য দিয়া, জ্ঞান দিয়া, স্বাধীনতা দিয়া তাঁহাদের আত্মার মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিয়া তিনি সমাজ-সংস্কারে এমন এক স্বাধীনতার অবসর দিয়াছেন যাহা সংস্কারযুগের বিবেচনার মধ্যে আসে নাই।

অনেকে বলিবেন তিনি কোন্ বিষয়ে কি সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেখাও। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে মেয়েরা উপাসনার সময় পর্দার বাহিরে আসিয়া বসিবে কিংবা ভিতরে গিয়া বসিবে, এই বিশেষ সমাজ-সংস্কারে তাহার কি মত ছিল এবং তিনি কি বা করিয়া গিয়াছেন?

সত্য বটে বাঙলার এক অংশ বাঙলা সমাজের সংস্কার ব্যাপারকে একদিন এইরূপ প্রহসনের বিষয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কারের ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। স্বামিজীর এই অভিপ্রায় ছিল যে ভিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো ভাবে সমাজ-সংস্কার করিয়া কোন ফল হইবে না। পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণমূলক সংস্কার সম্প্রদায়গুলিরও পরমায়ু খুব বেশীদিন নহে। কাজেই স্ত্রী-শূদ্রকে পুষ্টিকর খাদ্য, কার্যকরী শিক্ষা ও আত্মা-পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ শক্তিশালী ধর্মদান করিতে হইবে। তারপর স্ত্রী-শূদ্রের সমাজে অধিকার কিরূপ হওয়া উচিত তাহারা নিজেরাই তাহা নির্ধারণ করিয়া লইবে। ইহা সংস্কারযুগের কার্যপ্রণালীর যেমন এক হিসাবে প্রতিবাদ তেমনি ইহার আদর্শ ও ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহার মূল মন্ত্র বর্তমান যুগের একমাত্র স্বাধীনতা।

রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে মাত্র আর একটি বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

রামমোহনের ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করিলেই পরিবর্তিত অনুষ্ঠান-গুলি সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত ও বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করিতে পারিবে। এইজন্য কি ধর্মসংশ্লিষ্ট, কি সমাজসংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান-গুলির পরিবর্তনের দিকে তাঁহাদের একটা চেষ্টা ছিল। পক্ষান্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ না করিলে, কেবল ধর্মের বা সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবর্তন করিলে বিশেষ কোন শুভ ফল দেখা দিবে না। কেন স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান, বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদিকে পরিবর্তন করিবার দিকে ঝোঁক দেন নাই, তাহারও কারণ পাওয়া যাইবে এইখানে। তবে একথা স্বীকার্য যে ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারাপন্ন অনুষ্ঠানগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যথা ঐ অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বাস করিয়া ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয় না।

আমার মনে হয় রামমোহন ও বিবেকানন্দের পৃথক্ পৃথক্ যুগে একে অন্য হইতে সমাজ-সংস্কারের কার্যপ্রণালীতে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সমাজ-সংস্কারের জন্য যেমন সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ প্রয়োজন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরিপন্থী সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তনও প্রয়োজন। এই পরিবর্তন সংস্কারপ্রার্থী লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে সংস্কার বা পরিবর্তন স্থায়ী হয়। অন্যথা লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া কেবল রাজশক্তির প্রভাবে কোন সামাজিক প্রথা বিধিবদ্ধ করিলে, লোকসমাজে উহা গৃহীত হয় না। বাহির হইতে বলপ্রয়োগে প্রতিক্রিয়ার ভাব বৃদ্ধি পায়। স্থান-কাল ও পাত্রভেদে সমাজ-বিপ্লবেরও সম্ভাবনা থাকে। সমাজ-বিপ্লব সমাজের গতিমুখে অপরিহার্য হইলে ইতিহাসে তাহাও ঘটে। তাহারও প্রয়োজন হয়। খুঁজিলে

তাহারও সমর্থন পাওয়া যায়। বিপ্লব ব্যতীত যেখানে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার আর কোন উপায় নাই, অথচ যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সমাজে পরিবর্তন ও গতির প্রয়োজন—সেখানে বিপ্লব আসিতে পারে। এই বিপ্লব জয়যুক্ত হইলে জাতি উন্নতির পথে চলিতে থাকে। পরাজিত হইলে জাতির মৃত্যুও হইতে পারে। ইতিহাসে জাতির এবম্বিধ অবস্থায় মৃত্যুর অভাব নাই।

আমি পরবর্তী নবম পরিচ্ছেদে ঊনবিংশ শতাব্দীর সহিত তাহার পূর্ববর্তী অন্যান্য শতাব্দীর যোগ; এবং ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী সভ্যতার যে সকল বৈশিষ্ট্য এবং তৎসংশিলষ্ট অপরাপর কতকগুলি সমস্যা—সেই সম্বন্ধে আর একটি আলোচনা করিব।

নবম পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগসূত্র—রামমোহন ও বিবেকানন্দ

রাজা রামমোহন হইতে যে শতাব্দীর আরম্ভ এবং স্বামী বিবেকানন্দে যে শতাব্দীর শেষ হইয়াছে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনায়, উল্লিখিত দুই মহাপুরুষের প্রসঙ্গ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ ইঁহাদের উভয়ের চিন্তা ও কার্যপ্রণালীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জাতীয় জীবনে ইঁহাদের প্রভাবও খুব বেশী।

বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তার ধারা অব্যাহত আছে, একটা কর্মের প্রেরণা তরঙ্গের মত সাময়িক উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে এবং ক্রমশঃই তাহা জাতীয় জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছে। রাজা রামমোহনের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের যে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রহিয়াছে, যাহা স্বামিজী নিজে স্বীকার করিয়াছেন, সেই মানসিক যোগসূত্রই বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীকে এক অখণ্ড, অবিভাজ্য সুসম্পূর্ণ রূপ বা আকার প্রদান করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস রামমোহন ও বিবেকানন্দে কোন যোগসূত্র নাই, কিন্তু যাঁহারা জানেন না,—তাঁহারাই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দের যোগসূত্র এত সুদৃঢ় যে, এই উভয় মহাপুরুষের সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ যদি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এই যোগসূত্র ছিন্ন করিবার প্রয়াস করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা ব্যর্থকাম হইবেন। নৈনিতাল পাহাড়ে ভগিনী নিবেদিতার সহিত স্বামিজীর একবার রামমোহন প্রসঙ্গে কথোপকথন হয়। সেই সময় ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামিজী বলেন যে, তিনটি বিষয়ে তিনি রাজা

রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। যথা—(১) রামমোহনের বেদান্ত-গ্রহণ ও প্রচার; (২) রামমোহনের স্বদেশপ্রীতি ও তাহার প্রচার; (৩) রামমোহনের স্বদেশপ্রেমের উদারতা যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবে আলিঙ্গন করে।* বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটা ভাবের ধারা অব্যাহত থাকিয়া জাতিকে চালিত করিতেছে, আশা করি, আপনারা তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি যে নূতন নূতন ভাবই জাতিকে চালিত করে। মহাপুরুষেরা এই সমস্ত নূতন ভাবরাশির প্রকাশমাত্র। তাঁহারা চতুর্দিক হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া এই নূতন ভাব জাতির মনে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহা যাঁহারা পারেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জন্য রাজা রামমোহন যেমন অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন সেই সঙ্গে তিনি ইউরোপের বিজ্ঞানকে যথা, "গণিত, ন্যাচারল ফিলজফি, রসায়ন, 'য়্যানাটমি' এবং অন্যান্য 'কার্যকরী বিজ্ঞান' গুলিকেও বরণ করিয়া লইবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রসার ব্যতিরেকে এ যুগে কেবল শাঙ্কর-বেদান্ত যে নিতান্তই নিষ্ফল হইবে এবং তাহা যে বাঞ্ছনীয় নয় একথা রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্ট-এর নিকট সেই স্মরণীয় চিঠিখানিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানবর্জিত শুধু বেদান্তবিলাসী করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা রামমোহনকে ভুল বুঝিয়াছেন। এ যুগে বেদান্তের সহিত বিজ্ঞান চাই, ইহাই ছিল রামমোহনের অভিপ্রায়। বেদান্তবর্জিত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবর্জিত বেদান্ত এ দুই রামমোহনের অনভিপ্রেত ছিল।

বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব কি?

এক্ষণে আমি বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আমার আগেকার পরিচ্ছেদগুলি পড়িয়া আপনাদের মনে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীই কি

*"It was here, too, that we heard a long talk on Rammohan Roy, in which he pointed out *three things* as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love of country that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he (Swamiji) claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan had mapped out." *Notes on Some Wandering by Sister Nivedita*. p. 19

বাঙগালী সভ্যতার প্রথম শতাব্দী? তাহার পূর্বে কি বাঙগালী-সভ্যতা ছিল না? যদি থাকিয়া থাকে, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙগালী সভ্যতার কি কি উপাদান ছিল? এবং এই সভ্যতার বিশেষত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তাহা কি?

পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার, অর্থাৎ রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের উদ্যম বাঙগালী সভ্যতার মধ্যে কোন্‌গুলি রক্ষা করিতে বলিয়াছে, কোন্‌গুলি বা কিরূপ আকারে সংশোধন করিতে বলিয়াছে এবং কোন্‌গুলিই বা একেবারে বর্জন করিতে বলিয়াছে এক্ষণে এই প্রশ্নের আমি সাধ্যমত উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙগালী সভ্যতার যে সমস্ত উপাদান লক্ষ্য করা যায় তাহার প্রায় সবগুলিরই উৎপত্তিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে মধ্যভাগের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মত ষোড়শ শতাব্দীও একটা সংস্কারের শতাব্দী। শুধু তাই নয়, বাঙগালী সভ্যতার আধুনিক যা কিছু বিশেষত্ব তাহার প্রায় সবগুলিই রূপ পাইয়াছে, পরিপুষ্ট হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীতে যে বাঙগালী সভ্যতা দেখা দিয়াছিল, সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী যাহার আলোকে আলোকিত, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাহা পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ আগে বা পর হইতে খন্ড বিখন্ড হইয়া পড়িল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই যে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সভ্যতার উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইবার প্রয়োজন অনুভব করা গেল, সেই অল্পাধিক মাত্র তিন শতাব্দীর বাঙগালী সভ্যতার রূপকে আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙগালী, (অর্থাৎ রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ) সংস্কার ও সংশোধন করিতে চাহিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর বাঙগালী সভ্যতাকে, যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহা প্রাণ পাইয়াছিল—পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে যাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য, রঘুমণি—নব্যন্যায়ের দার্শনিক, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তন্ত্রশাস্ত্রের মীমাংসক ও সংগ্রহকার এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—বাঙগালীর বৈষ্ণব ধর্মের যুগাবতার, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক একজনে দিক্‌পাল। যে কোন দেশে, যে কোন জাতির মধ্যে যে কোন যুগে ইহাদের কেহ একজন জন্মিলে সেই দেশ, সেই জাতি, সেই যুগ ধন্য হইত।

এখন প্রশ্ন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙগলার কি এই সভ্যতা, যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। যাহা বাহিরের আঘাতে স্থির থাকিতে পারিল না এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই পুনরায় সেই বহুধাবিচ্ছিন্ন—বিচূর্ণ—সভ্যতার উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া যাহার মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিল এবং রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এই কার্যের জন্য অগ্রসর

হইলেন, আজীবন প্রাণান্তকর পরিশ্রমে দেহপাত করিয়া গেলেন? ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সেই সভ্যতা কি?

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতা

আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন আমি মনে করি না, যিনি আমার কথা হইতে মনে করিবেন যে বাঙ্গালী জাতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে অসভ্য ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে সভ্যতার সোপানে প্রথম পদক্ষেপ করিল। না, তাহা নহে। বাঙ্গালী জাতি যে কতদিন হইতে সভ্য তাহা ঐতিহাসিকগণ এখনও সম্যক্ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার প্রসঙ্গ আপনারা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গলার নব আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপাদান পরীক্ষা করিয়া বুঝা যাইতেছে যে তৎকালেও বাঙ্গালী জাতি সভ্য ছিল। বাঙ্গালীর রাজত্ব, সাম্রাজ্য, বাণিজ্য, দিগ্বিজয়—তাহার ধর্ম, সাহিত্য, ভাস্কর্য এই সমস্তের ভগ্নাংশ যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তাহা সমস্তই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সমসাময়িক এবং সে সমস্তই একটা সভ্য জাতির বিলুপ্ত অস্তিত্বের নিদর্শন। সে বাঙ্গালী জাতি বিলুপ্ত। তার অস্তিত্ব আজ নাই। আমি আপনাদিগকে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার সম্পর্কে—শুধু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী সভ্যতার কথা সংক্ষেপে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি।

এই শতাব্দীতে বাঙ্গালী তাহার সাম্রাজ্য হারাইয়াছে। মুসলমানের অধীনে ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি বাঙ্গলায় নহে—দিল্লীতে। বাঙ্গলা ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত সাম্রাজ্যের অনেক প্রদেশের মধ্যে একটি প্রদেশমাত্র। অথচ এই শতাব্দীতে বাঙ্গলা সম্পূর্ণ দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনতা স্বীকার করে নাই। বাঙ্গলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ত দূরের কথা, দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধেই বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর ভুঞা জমিদারগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল, যুদ্ধ করিয়াছিল—কোনো কোনো যুদ্ধে জয়লাভ পর্যন্ত করিয়াছিল। এই জমিদারদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান আর অল্পাংশ ছিল হিন্দু। দ্বাদশ ভুঞার মধ্যে নয়জন ছিল মুসলমান পাঠান, আর তিনজন—কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, মধুসিংহ ভৌমী ছিল হিন্দু। দিল্লীর মোগলের বিরুদ্ধে ইহা প্রধানতঃ ছিল বাঙ্গলার পাঠানের বিদ্রোহ। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি যে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রথম কারণ, দিল্লী সম্রাটের শাসন তখন পর্যন্ত বাঙ্গলার সুদূর পল্লীগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর জমিদারগণ তখনও স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে জানিত ও পারিত। এই বিদ্রোহ জয়যুক্ত না হওয়ার কারণ তখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় ভবানন্দ মজুমদারের মত বিশ্বাসঘাতক ছিল আর কেদার রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশা খাঁর মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বদেশ-দ্রোহী ব্যক্তিও ছিল। বাঙ্গলার বারভুঞা কখনো

বাঙ্গলার স্বাধীনতার জন্য একত্র হইয়া যুদ্ধ করে নাই। নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু সেদিন একত্র হইলে হয়ত দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত আক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু মুসলমান তখন এক হইতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীতে আজিও পারিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। হিন্দু মুসলমানের মিলন এক কঠিন সমস্যা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতার আধুনিক বিশেষত্ব—স্মৃতি, ন্যায়, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বাঙ্গলা সাহিত্য আত্ম-প্রকাশ করে। সেই সময় দিল্লীর বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বার-ভুঞার বিদ্রোহ ধীরে ধীরে একের পর আর চলিতেছিল। রাজনৈতিক এক মহা বিপ্লবের মধ্যেই আধুনিক বাঙ্গালী-সভ্যতা জন্মলাভ করে। বাঙ্গলায় জমিদারগণ যখন স্বতন্ত্রভাবে দিল্লীর অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল তখন যে বাঙ্গালী সভ্যতার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের নিকট বলিব।

এই ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীতে রাজত্ব করেন প্রথম বাবর ১৫২৬—'৩০=৫ বৎসর। ক্রমে হুমায়ুন ১৫৩০—'৪৩=১৪ বৎসর। পরে শের শা ১৫৪০—১৫৪৫=৬ বৎসর এবং সর্বশেষে পৃথিবীবিখ্যাত সম্রাট আকবর ১৫৫৬—১৬০৩= ৩৮ বৎসর। আর এই শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন পনর জন শাসনকর্তা। তাহার মধ্যে টোডরমল ও মানসিংহ ব্যতিরেকে আর তেরজন মুসলমান। মুসলমান শাসনকর্তাদের মধ্যে রাজা টোডরমলের পূর্বে—হোসেন শা সোলেমান কররানী ও দায়ুদ খাঁর নাম সসম্মানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

যে সময় বাঙ্গলার জমিদারগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিত সেই সময়ে বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতায় একটা পরিবর্তন দেখা দেয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই যুগের বাঙ্গলা-সাহিত্য। এই চণ্ডীর যা উপাখ্যান তাহা লইয়া কবিকঙ্কণের পূর্বে ও পরে অনেক কবি অনুরূপ অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে সমস্ত চরিত্রের মানুষ দেখা যায় যে রকম দেবতা ও দেবীর লীলাভিনয় দর্শন করা যায়, তাহাতে এই কাব্য—শুধু কাব্য নয়, সমাজ-জীবনের একখানি আলেখ্য বলিয়াও আমরা নির্দেশ করিতে পারি। বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত তাহার সামাজিক জীবন তখনও অঙ্গাঙ্গীযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছিল। এই চণ্ডীতে ভাষার সাক্ষ্যে "দালান এমারত" "পেয়াদা বরকন্দাজ" প্রভৃতিতে যেমন মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি "চন্দ্রসূর্য তরু, ফুল-পল্লবে" হিন্দুর মন্দিরে দেবী প্রতিমার অর্চনারও পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই। এই চণ্ডী কাব্যে ভাঁড়ুদত্তের ধূর্ততা আছে, পুরুষ চরিত্রের অবনতি আছে, নারী-চরিত্রের উৎকর্ষ বিশেষ নাই, ধর্ম বিপ্লবের ছায়া আছে—চতুর্দিক হইতে টানিয়া লইবার, একটা আহরণ করিবার শক্তি আছে। সমাজের এই প্রাণশক্তিই চণ্ডী কাব্যকে জাতীয় সাহিত্য অতি উচ্চে স্থান দিয়াছে। আর সাহিত্যে চতুষ্পার্শ্ব হইতে

আহরণ করিয়া নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে প্রকাশ করিবার শক্তি যে শতাব্দীর আছে সেই শতাব্দীই জীবন্ত। তাহার ইতিহাস থাকিবে।

রঘুনন্দনের স্মৃতি

সাহিত্যের পর সমাজ ব্যবস্থা। কিরূপে ষোড়শ শতাব্দীর বাংগালী তাহার সমাজ ব্যবস্থায় একটা সময়োপযোগী নূতন পরিবর্তন আনিয়াছিল এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট বলিব। রঘুনন্দন স্মার্ত-ভট্টাচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন। রঘুনন্দন যে অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব রচনা করিয়া বাংগালী হিন্দু-সমাজকে সমাজ-ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহা অন্ততঃ তাঁহার পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। রঘুনন্দনের সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দোলন হয়। সুতরাং শতাব্দীর প্রথমভাগেই রঘুনন্দন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংগলাদেশ বখ্‌তিয়ার খিলিজী আক্রমণ করে। হিন্দুর রাজা লক্ষ্মণ সেন পরাজিত হয়। ক্রমে পশ্চিমবংগ, পরে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে পূর্ববংগ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে আসে। সুতরাং প্রায় তিন শতাব্দী পাঠান মুসলমানের অধীনে থাকিয়া বাংগালী হিন্দুর আচার ও ব্যবহার এমন পরিবর্তিত হয় যে স্মার্ত রঘুনন্দন আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার অর্থাৎ স্মৃতির নব সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাংগলায় তখন প্রাচীন স্মৃতি-কথিত বর্ণাশ্রমধর্ম ছিল না। চারি বর্ণও ছিল না। চারি আশ্রমও ছিল না। ছিল মাত্র দুই বর্ণ—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। কায়স্থ জাতি ত দূরের কথা, কলিতে বৈদ্য জাতিকেও রঘুনন্দন শূদ্র জাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'কলৌ বৈদ্যঃ শূদ্রবৎ'।

মুসলমান অধিকারে জাতিভেদ শিথিল না হইলেও নিম্ন জাতির অনেক লোক মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যবর্ণের জাতিসকল, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও অর্থশালী ছিল বলিয়া সহসা মুসলমান হয় নাই। পরে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-ধর্ম দেখা দিলে তাহারা বৈষ্ণব হইয়া হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

ব্রাহ্মণদিগের আচারে এই শতাব্দীতে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্রাহ্মণেরা পূর্বে সিদ্ধ চাউল, মৎস্য ও মশুর ডাইল আহার করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া রঘুনন্দন উহার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। উপনয়ন ও শ্রাদ্ধবিধিও তিনি প্রাচীন স্মৃতি হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবংগে উপনয়ন ও পূর্ববংগে বিক্রমপুরে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধবিধি প্রচলিত হইতে পারিল না। রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

তখনকার রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি পরিবর্তিত সময়োপযোগী সমাজব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া রঘুনন্দনের স্মৃতির উপরেই বাঙ্গালী হিন্দু ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া নির্ভর করিয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীতেও রঘুনন্দনই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রামাণিক স্মৃতি। ইহাতে স্বভাবতঃই কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

রঘুনন্দন একজন উচ্চশ্রেণীর মীমাংসক। তাঁহার পূর্বে জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত হয়। কিন্তু আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতের তাদৃশ প্রভাব লক্ষিত হয় না। কুল্লূক ভট্ট বাঙ্গালী ছিলেন। ইনিও একজন বড় স্মার্ত পণ্ডিত। মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট টীকা (মন্বর্থ-মুক্তাবলী) ইঁহার দ্বারাই রচিত হয়। কুল্লূক ভট্ট চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়াই আমার অনুমান হয়। রঘুনন্দনের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপে শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি মীমাংসা সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকরাচার্য, পিতা ও পুত্রে উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন। এই সমস্ত স্মার্ত পণ্ডিতদিগের নব্যস্মৃতি বিশেষতঃ মনু আদি প্রাচীন স্মৃতির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন বাঙ্গলাদেশে আচার-ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্তের নূতন ব্যবস্থা দিলেন। এই আচার-ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত বাঙ্গালী-সভ্যতার এক বিশেষ উপাদান। বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে রঘুনন্দনের স্মৃতি ব্যবহার বিভাগে যাহা জীমূতবাহনের দায়ভাগকে অনুসরণ করিয়াছে ও কোন কোন দিকে সময়োপযোগী সংস্কার করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের পাদপীঠ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুর মত অবশ্য বাঙ্গালীও হিন্দু। কিন্তু সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর যে জাজ্বল্যমান অথচ গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ—তাহার ভিত্তিভূমি—চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবহারশাস্ত্রে জীমূতবাহনের দায়ভাগ আর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিভাগে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান। ইহাতে দোষ ছিল না এমন বলা যায় না। তবে ইহাই প্রধানতঃ, এমন কি আজ পর্যন্তও বাঙ্গালী-সভ্যতার যে বিশেষত্ব তার ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগকে বলিতে পারিয়াছে যে, আমরা সাধারণতঃ হিন্দুত্বে এক হইয়াও বাঙ্গালীত্বে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ভারতের সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, সমগ্র হিন্দুজাতিকে খর্ব করে নাই—গৌরব দান করিয়াছে, উন্নতির পথে, বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন দিকে বিশেষত্বে পরিপুষ্টি ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছে। সমগ্র হিন্দুজাতি এজন্য বাঙ্গালী-প্রতিভার নিকট ঋণী। আমি বাঙ্গালী হইয়াও একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু, হিন্দুত্বের

প্রাদেশিক বিশেষত্ব গবেষণা করিয়া পরিস্ফুট করিতে পারিলে সাধারণ হিন্দুত্ব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইবে। এই প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অভিনব দৃঢ়তর ঐক্য আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে। কেন না হিন্দুত্ব বহু নয়—মূলে এক।

এখন বাঙ্গালীর স্মৃতিশাস্ত্রের দিক্ অর্থাৎ পারিবারিক ও সমাজ বিধানের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে, আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানে এবং ব্যবহারে অর্থাৎ আইন-সম্পর্কীয় ব্যাপারে বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু হইতে কোন্ কোন্ দিকে পৃথক্, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে ব্যবস্থা মধ্যযুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মিতাক্ষরা আইনের মধ্য দিয়া পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থকে অনেকাংশে খর্ব করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু জীমূতবাহন ও রঘুনন্দন একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির উপর প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অধিকার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের প্রসার এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, আইনের দিক্ হইতে মনে হয় বাঙ্গলার দায়ভাগ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মিতাক্ষরার গ্রাস হইতে ব্যক্তিত্বকে উদ্ধার করিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী-প্রতিভার বিশেষত্ব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি ইহাও বলিতে বাধ্য যে, বাঙ্গলার দায়ভাগ, সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনে ও বিক্রয়ের ক্ষমতায়—তা সে সম্পত্তি পৈতৃক বা স্বোপার্জিত যাহাই হউক—পুরুষকে যে স্বাধীনতা দিয়াছে, স্ত্রীলোক অর্থাৎ বিধবা স্ত্রী বা কন্যাকে ততদূর স্বাধীনতা দেয় নাই। তবে বেনারস-স্মৃতির 'বীরমিত্রোদয়ে' ও বোম্বাইস্মৃতির 'ব্যবহার ময়ূখে' বাঙ্গলাদেশের দায়ভাগ হইতে কোন কোন দিকে সম্পত্তির উপর নারীজাতির অধিকার বেশী দেওয়া হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের মনে রাখিতে হইবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর কোন দেশই সম্পত্তি বা পরিবারের মধ্যে স্ত্রীজাতিতে কোন বড় রকমের অধিকার বড় একটা দেয় নাই। বাঙ্গালী যাহা দিয়াছে তাহা অপেক্ষা কেহ বেশী দিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জীবন্ত ও উন্নতিমুখী জাতিসকল যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, জ্ঞানে বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, বাঙ্গালীজাতি তাহা পারে নাই। বরং তাহার বিপরীত দেখা গিয়াছে।

নব্য-ন্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতায় রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ ও পরিবার বন্ধনের নিমিত্ত স্মৃতির বিধানে বাঙ্গালী-প্রতিভার যে বিশেষত্ব তাহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনারা পাইলেন। এক্ষণে এই শতাব্দীর দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। বাঙ্গলার দর্শনশাস্ত্র বাঙ্গালীর নব্য-ন্যায়। ষোড়শ

শতাব্দীতে ইহার উদ্ভব। রঘুনাথ শিরোমণি এই নব্য-ন্যায় আবিষ্কার করেন। গাঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা রচিত হইলেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি বিভাগে ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে তর্কসকল এত নিগূঢ় ও পরিষ্কৃতরূপে বিচারিত হইয়াছে যে, ইহা একখানি নূতন ন্যায়ের দর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা সেকালে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রঘুমণির গ্রন্থের নাম 'চিন্তামণি-দীধিতি।' এই গ্রন্থ ছাড়াও রঘুমণি বৈশেষিক শাস্ত্রীয় 'পদার্থতত্ত্বনিরূপণ' গ্রন্থ অবলম্বনে 'পদার্থ-খণ্ডন' গ্রন্থ এবং 'আত্মতত্ত্ব-বিবেক' ও মৈথিলি নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ও বল্লভাচার্য প্রণীত ন্যায়গ্রন্থের মৌলিক টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত 'নঞর্থবাদ', 'প্রামাণ্যবাদ', 'নানার্থবাদ', 'আখ্যাতবাদ' নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রঘুমণির পূর্বে মিথিলায় গিয়া বাঙ্গলার ন্যায়-দর্শনের ছাত্রকে ন্যায় পড়িতে হইত। কিন্তু রঘুমণির নব্য-ন্যায় সর্বত্র পণ্ডিত-সমাজে স্বীকৃত হইলে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র হইতে দলে দলে ছাত্রেরা নবদ্বীপ আসিয়া নব্য-ন্যায় পড়িতে লাগিল। দর্শনশাস্ত্রে একজন মাত্র বাঙ্গালীর প্রতিভা, সমগ্র ভারতে এইরূপে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার প্রমাণ করিয়া গিয়াছে।

এই নব্য-ন্যায় জীবাত্মাকেও স্বীকার করে, ঈশ্বরকেও স্বীকার করে। ঈশ্বরকে স্বীকার করে বলিয়া ইহা আস্তিক, আর জীব ও ঈশ্বর এই দুইকেই স্বীকার করে বলিয়া ইহা অনেকটা দ্বৈতবাদ না হইলেও দ্বৈতবাদ-ঘেঁসা—আমার এইরূপ ধারণা। এস্থলে বলা আবশ্যক রঘুমণি শুধু নব্য-ন্যায়ের দার্শনিক ছিলেন না, তিনি স্মৃতি-শাস্ত্রীয় 'মলিম্লুচ-বিবেক' নামক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে আজ এত তার্কিক তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, বোধহয় রঘুমণিই তাহার জন্য অনেকটা দায়ী। বাঙ্গালী জাতি দার্শনিক। ষোড়শ শতাব্দীতে একদিন ছিল যেদিন বাঙ্গালী জাতি বিনাপ্রমাণে ঈশ্বরকেও তর্কে স্বীকার করিত না। এই গেল বাঙ্গলার দর্শন।

বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্ম

তারপর ধর্ম। ধর্ম বলিতে আমি সাধনের ধর্মকেই নির্দেশ করিতেছি। সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ স্থির করিতেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার অনেক লোক, অনেক জাতি বৌদ্ধ ছিল। ইহা অসম্ভব নয়। কেননা একসময়ে বাঙ্গলার প্রায় তিনচতুর্থাংশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।* নব্য হিন্দুর পুনরুত্থানকালে তাহারা

*"More than three fourths of the population of Bengal were Buddhists."—*Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri* in his Introduction to Nagendranath Vasu's"—"Modern Buddism."

কিন্তু একদিনেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ও আচার-ব্যবহারে ফিরিয়া আসে নাই। সমাজে কোন বড় রকমের একটা পরিবর্তনের মুখে দুই তিন শতাব্দীর কাজ নিশ্চয়ই দুই একদিনে হয় না। শুধু বৌদ্ধ কেন, জৈন মতও বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তবে তাহা কতটা প্রবেশলাভ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম—সাধনের ধর্ম। কিন্তু তথাপি ইহা কেবল সাধনের ধর্ম নয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমবিরোধী সমাজগঠনও বাঙ্গলায় দেখা দিয়াছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে বৌদ্ধাধিকারের পর বাঙ্গলায় নব্য-হিন্দুধর্ম ও বঙ্গীয় সমাজের পুনর্গঠনে মন্বাদি প্রাচীন-স্মৃতি-কথিত বর্ণাশ্রম আর মাথা উঠাইতে পারিল না। রঘুনন্দনকে ষোড়শ শতাব্দীতে বলিতে হইল, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণই আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই। চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম আর দেখা দিল না। তথাপি ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙ্গলা আবার নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া হিন্দু হইতে আরম্ভ করিল। ইহা দুই বর্ণ ও মাত্র দুই আশ্রমের ব্যাপারে দাঁড়াইল। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে, স্মৃতিশাস্ত্রের দিক্ হইতে বিচার করিলে বাঙ্গলায় হিন্দুত্ব দুই বর্ণ আর দুই আশ্রমের ইতিহাস। তবে সন্ন্যাস যে বাঙ্গলায় ছিল না এমন কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যাহা এমন প্রকটভাবে দেখা দিল তাহা ফল্গুনদীর মত ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া নিশ্চয়ই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে এবং ইতিহাসে তাহার প্রমাণও আছে।

তন্ত্র—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

ষোড়শ শতাব্দীর সাধনধর্মে এইবার আমি তন্ত্রের কথা আলোচনা করিব। আজ বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী কোনদিনই বৈষ্ণব অপেক্ষা তান্ত্রিক কম নয়। রক্ষণশীল বাঙ্গালী হিন্দু, তাহার দীক্ষা, আহ্নিক, উপাসনা প্রভৃতি ব্যাপারে আজিও তান্ত্রিক ভূমির পাদপীঠের উপরেই দণ্ডায়মান। বাঙ্গলা-দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে তন্ত্রশাস্ত্রের নব কলেবর হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' নামে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্ত্রমতে সাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় আগমবাগীশই তাহার বিধি দেন। কার্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে সেই শ্যামামূর্তি ও পূজাপদ্ধতি আগমবাগীশই প্রচলন করেন। মূর্তি অবলম্বন করিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্তিক পূজা প্রভৃতি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতেই দেখা দেয়। কেননা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে মূর্তির অধিক বাহুল্য বাঙ্গলাদেশে প্রায় ছিল না। তান্ত্রিক মতে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা-অর্চনা হইত। কার্তিকী অমাবস্যার শ্যামাপূজার মূর্তি আগমবাগীশের দ্বারা কল্পিত ও প্রচলিত। মূর্তি সত্ত্বেও প্রত্যেক তান্ত্রিক পূজায় অদ্যাপি ঘটের প্রচলন আছে।

কেবল আগমবাগীশ নয় পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসও ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তন্ত্রের সাধনায় তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ। 'ষটচক্রভেদ,' 'বামকেশরতন্ত্র,' 'শ্যামা-রহস্যতন্ত্র,' 'শাক্তক্রমতন্ত্র' এবং বেদান্ত দর্শনে 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক মুক্তি-বিষয়ক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। 'তত্ত্বচিন্তামণি' ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থভাগের প্রথমে রচিত হয়। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া যে সমস্ত স্থানে তিনি বাস করিয়াছেন তাহা 'সিদ্ধ-পীঠ' বলিয়া কথিত আছে। নবদ্বীপের পশ্চিমে 'ব্রাহ্মণীতলার ঘাট' পূর্বস্থলীর 'বুড়মার ঘট' বা 'বাগ্‌দেবীর ঘট' এবং নবদ্বীপের 'পোড়ামার ঘাট' ইঁহা দ্বারাই স্থাপিত বলিয়া তান্ত্রিকেরা বলেন। আমি তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি।

সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরেকেও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে অনেক তান্ত্রিক অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়-দর্শনের টোলের মত তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সাধনাঙ্গ ছাড়িয়া শুদ্ধ তত্ত্বের ও তন্ত্রের দর্শনের দিক দিয়া উপদেশ দিতেন। তন্ত্রের দর্শন অনেকটা শাঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের মত।

তন্ত্রের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার কথা হইতে আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, তন্ত্র-মত বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতেই দেখা দেয়। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্মের বহুপূর্বে এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্ব হইতে বাঙ্গলায় তন্ত্রধর্মের প্রচলন দেখা যায়। তবে তাহা বৌদ্ধ-তন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম কতকটা এই প্রচলিত তন্ত্র-ধর্মের দুর্গতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। ধর্মও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। যেমন বৌদ্ধ ধর্মটাই বৈদিক ধর্মের দুর্গতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। যেমন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে তেমনি কর্মকাণ্ডের দিক দিয়া বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনেক পণ্ডিত সম্প্রতি দেখাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র।

মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

এক্ষণে সাধনধর্ম বিষয়ে বাঙ্গলায় মহাপ্রভু দ্বারা অনুষ্ঠিত ও প্রচলিত ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে আপনাদিগকে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিব।

বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্রভুর পূর্বেই—বহু পূর্বেই ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিশেষতঃ আচার্য রামানুজ কর্তৃক প্রচারিত হয়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় মহাপ্রভু কর্তৃক যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয় তাহা দাক্ষিণাত্য গুজরাট কিম্বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তৎকালীন বৈষ্ণবধর্ম হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক্। বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্মেও বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান। তত্ত্বে বা দর্শনের দিক্ হইতে মহাপ্রভুর সহিত পুরীতে সার্বভৌম ও কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামীর সহিত বিচারে

দেখা যায় যে, মহাপ্রভু শাঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন এবং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশকে ভগবানের লীলা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রায় রামানন্দের সহিত ধর্মবিচারকালে মহাপ্রভু লৌকিক ধর্মকে যেরূপ বাহিরের বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে পরে কান্ত-ভাবের কথায় পৌঁছিয়া শ্রীরাধার প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে, কান্ত-ভাবাশ্রিত এই শ্রীরাধার প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভিতরের কথা। ইহাই বৈশিষ্ট্য। কান্ত-ভাব বর্ণনার পরেও যখন মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন যে, ইহার পরেও বল, তখন "রায় কহে, আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার।" ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জানিতাম না। তার পরেই শ্রীরাধার প্রেমের কথা আসিল। প্রভু অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "রামরায়, বল বল, সেই রাধাকৃষ্ণের বিলাসবিবর্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।" রাধাকৃষ্ণের বিলাসবিবর্তের কথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শেষ কথা।

বাঙ্গলার তন্ত্রে যেমন 'মাতৃ-ভাবের' প্রাচুর্য, বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্মেও সেইরূপ 'কান্ত-ভাবের' প্রাচুর্য।

এক্ষণে আপনাদিগের নিকট ক্রমে ক্রমে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার কয়েকটি মূল উপাদান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলাম। শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে লিখিয়াছেন—

"কপিলদেবপ্রিয়া ন্যায়শাস্ত্র-প্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা আর কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অবশ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কতদিন থাকিবেন। কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্মণের এই উক্তির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রকে এমন কি সাংখ্যদর্শনকেও বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার সহিত বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর রাজনীতি, সাহিত্য ও বিশেষভাবে বৈষ্ণবধর্মকেও সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি।

রাজনীতিতে, সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রে, দর্শনে, শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মে ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিশেষ বাঙ্গালী-সভ্যতার জন্ম হইল, সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহার গতিকে আপনাদের লক্ষ্য করা উচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে যাহা অর্জিত হইল সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই পরিপুষ্ট হইল। কেননা একদিনে রঘুমণির নব্য-ন্যায় বা একদিনে রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধান বা এমন কি একদিনে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালী গ্রহণ করে নাই। কোন নূতন দর্শন, কোন নূতন আচার-ব্যবহার, কোন নূতন ধর্ম কোন জাতিই একদিনে গ্রহণ করে না। ইহার জন্য সময়ের আবশ্যক হয়। কেননা ইহাকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাই হইয়াছিল।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ষোড়শ শতাব্দীর সভ্যতা অনেকটা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কি রাজনীতি, কি সাধারণ সাহিত্যের রুচি, কি লোক-ব্যবহার, কি শাক্ত বা বৈষ্ণবধর্ম বা ন্যায় অথবা অন্যান্য দর্শন সমস্তই যেন প্রাণহীন, মলিন, নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। এই রাষ্ট্রবিপ্লব, ষোড়শ শতাব্দীর ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বাঙগলার জমিদারের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ নহে। আলীবর্দ্দীর সময়ে উপর্যুপরি মারাঠা বর্গীর ক্রমাগত দশ বৎসর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের পর পলাশী প্রান্তরে ইংরেজ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের নবাব বা বাঙগলার শাসনকর্তার পরাজয়। সম্ভবতঃ ইহা বাঙগলার সমগ্র হিন্দু-মুসলমানেরও ইংরেজের নিকট পরাজয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ক্ষমতা ইংরেজের ক্ষমতার সম্যক্‌রূপে অধীনে আসিল। ক্রমে ইংরেজ জাতি বাঙগলায় তৎসঙ্গে সমগ্র ভারতে অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজত্ব বিস্তার করিলেন।

এই বৈচিত্র্যময় বাঙগলার পরাধীনতার ইতিহাস যে শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে সেই শতাব্দীতে বাঙগালী-সভ্যতার অন্যান্য বিভাগ কিরূপে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল অতি সংক্ষেপে আমি তাহা বলিয়া, আমার আলোচ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সেই অবসাদগ্রস্ত সভ্যতাকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

এই প্রসঙ্গে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার তুলনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা ও তদনুরূপ ক্ষমতা বাঙগলার জমিদারগণ ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য 'বায়ান্ন হাজার ঢালি' লইয়া আকবরের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহা একটা ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধ। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মীরকাসিম ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সামান্য মাত্র একটা হুকুমে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাঙগলার অনেক জমিদারই মীরকাসিমের দ্বারা বন্দী হইয়াছিল। কাহাকে কাহাকেও জীবিত অবস্থায় গঙ্গায় ডুবাইয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এত অল্প আয়াসে ষোড়শ শতাব্দীর বারভুঞার কোন এক ভুঞাকে সম্রাট আকবর এমন কি সেনাপতি মানসিংহ দ্বারা এরূপ করিতে পারিতেন না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌল্লা বাঙগলার অপহৃতক্ষমতা কোন জমিদারেরই সহায়তা পান নাই। বাঙগালার হৃত-গৌরব জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, সিরাজদ্দৌল্লার পূর্বকৃত মন্দ ব্যবহারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, আমার বিশ্বাস তাঁহাদের, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, এই ব্যক্তিগত আক্রোশের ও স্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্র, পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের সুতরাং বাঙগলার তথা সমগ্র ভারতের ইংরেজ অধীনতার প্রধান

কারণ। প্রাতঃস্মরণীয়া অর্ধবঙ্গেশ্বরী মহীয়সী নারী রাণী ভবানী এই ষড়যন্ত্রে ছিলেন না বলিয়া প্রবাদ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রতাপাদিত্য আকবরের মত ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সাহস—অথবা হউক দুঃসাহস—রাখিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণ-চন্দ্র সামান্য বাঙ্গলার শাসনকর্তা সিরাজদ্দৌল্লা, মীরজাফর বা মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত দূরের কথা, শুধু ষড়যন্ত্র ও তাহার ফলে বন্দী হওয়া বা বন্দী অবস্থায় পলায়ন করা ভিন্ন আর কিছুই করিবার ক্ষমতাই রাখিত না। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও তাহা রক্ষার্থে ক্ষমতা কতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই গেল রাজনীতির দুরবস্থা। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিত্য বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনকে যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ নয়।

বীরের উপযোগী সৎসাহস যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতিতে নাই, তেমনি এই শতাব্দীর সাহিত্যেও তাহা নাই। প্রমাণ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। একজন রাজপুত্র আর একজন রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী। রাজকন্যা তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। এ পর্যন্ত অতিশয় উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সেই রাজপুত্র আসিলেন, বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষাতেও তিনি রাজকন্যার নিকট জয়ী হইলেন তথাপি চোরের মত সুড়ঙ্গ কাটিয়া রঘুনন্দনের স্মৃতির বিধানের বহির্ভূত গান্ধর্ব বিবাহ, যাহা বাঙ্গালী জাতি বহু শতাব্দী পরিত্যাগ করিয়াছে অথবা যাহা রক্ষা করিবার শক্তি হারাইয়াছে তাহাই করিলেন। রাজকন্যা গর্ভবতী হইলেন। এই বিবাহ সমাজে অপ্রচলিত। কাজেই কোটাল দ্বারা প্রমোদ গৃহে রাজপুত্র চোরের মত বন্দী হইলেন। বন্দী হইবার প্রাক্কালে একজন নিকৃষ্ট লম্পটেরও, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে অপরপক্ষ রাজ-কন্যার সম্মতি ছিল, যেরূপ প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়ার প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি একটা রাজপুত্রকে দিয়াও তাহা দিতে ভরসা পাইলেন না। কালী-মাহাত্ম্য বর্ণনাই যদি উদ্দেশ্য ছিল, তবে রাজপুত্রকে, রাজপুত্র রাখিয়াও তাহা সম্ভব হইত। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ইহা চলিত না। ইহা তৎকালীন জমিদার সভার বা কতকাংশে সামাজিক জীবনের প্রতিবিম্ব। কেননা কৃষ্ণচন্দ্র যখন মীর-কাসিমের হস্তে বন্দী, যখন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আজ্ঞা তিনি প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন সেই সময় মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া তিনি পলাইয়া আসেন এবং রাজবল্লভের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ঢাকার নবাব সরকারে বহু লক্ষ টাকা মাপ লইয়া, রাজবল্লভের বিধবা কন্যার বিবাহ-বিধি প্রচলন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া, পরে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চক্রান্ত করিয়া এই বিধবা-বিবাহবিধি ব্যর্থ করিয়া দেন। ধূর্ততায় বাঙ্গলার জমিদার তখন ষোড়শ শতাব্দীর ভাঁড়ুদত্তকেও লজ্জা দেয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রের এই অবস্থায়, ষোড়শ শতাব্দীর উদ্ভাসিত বাঙ্গালী-সভ্যতার অন্যান্য

উপাদান যে স্বভাবতঃই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন। কেননা জাতীয় চরিত্রে দুর্গতি আসিলে সেই জাতির দেবদেবীরা পর্যন্ত ঐরূপ দুর্গতি হইতে মুক্তি পান না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা-সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দনের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার বিধান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধভাগ হইতেই বাঙ্গালী হিন্দু মুখে স্বীকার করিলেও কার্যকালে গোপনে অস্বীকার করিয়া আসিতেছিল। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে ও গার্হস্থ্য জীবনে একটা পরিবর্তন, শুধু পরিবর্তন নয় এক মহাবিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ মুর্শিদাবাদে ও দিল্লীতে রাজশক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় ও অপচয়। যে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সহিত স্বদেশীয় রাজশক্তির অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকে না সেই রাজশক্তি ও সামাজিক শাসন ও নিয়ম পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপ্লবের সূত্রপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাঙ্গলাদেশে তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালী-সভ্যতার কোন এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের যোগ ছিল না। বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগই বা প্রত্যেক অঙ্গই স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ইতিহাসের অনেক বড় বড় সভ্যতা এইরূপে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী-সভ্যতার দশাও ঐরূপ হইতেছিল।

তারপর ধর্ম। সাধনের ধর্ম বলিতে তখন শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মই প্রচলিত ছিল। গৃহী এবং গার্হস্থ্যের অর্থাৎ রঘুনন্দনের স্মৃতির বাহিরেও এই দুই সাধন-ধর্ম, গার্হস্থ্যাশ্রম-বিরোধী আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, কর্তা-ভজা প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ-মিলিত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্মের ধ্বংসাবশেষের অনেক স্মৃতিচিহ্ন লক্ষিত হইত। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষ বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের, চক্রের সাধনায় ও সহজিয়া সাধনায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার শাক্ত ও বৈষ্ণব বিশেষভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ও রেষারেষি এত প্রবল হইল যে, ইহারা যে এক হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বশতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ প্রায় ভুলিয়া গেলেন। শাক্তগণ বৈষ্ণবদিগের দেবদেবীকে পর্যন্ত নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন, বৈষ্ণবগণও শাক্তদিগের দেবদেবীকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। শৈব বা শাক্তগণ তুলসীপত্র স্পর্শ করা পাপ মনে করিতেন, অপরপক্ষে বৈষ্ণবগণ বিল্বপত্রের নাম পর্যন্ত মুখে আনিতেন না। অবস্থা এইরূপ।

ষোড়শ শতাব্দীর ন্যায়দর্শন গতানুগতিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধারা

বজায় রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল সত্য, কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্রে আর কোন নূতন বা মৌলিক গবেষণার উদ্ভব হয় নাই। নব্য-ন্যায় আস্তিক্য দর্শন হইলেও শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম কলহের মধ্যে এই দর্শন কোন মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশের জন্য এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজা রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীতে তাহাই করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর ষোড়শ শতাব্দীর উদ্ভাবিত সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই বিষ্ণুচক্রে মৃত সতীদেহের মত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দী ও বাঙ্গালী-সভ্যতা

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বহুধা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া এই সভ্যতার শরীরে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন বাঙ্গলা দেশকে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া আন্দোলিত করিয়াছে—তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মধ্যযুগের বাঙ্গালী-সভ্যতাকে বর্তমান যুগের উপযোগী সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া শুধু বাঙ্গলাদেশ কেন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরিপূর্ণ ভারতবাসীকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। সমগ্র ভারতবাসীকে ধর্মের বৈষম্য সত্ত্বেও একটা জাতি বলিয়া ইউরোপের সম্মুখে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাও তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। উনবিংশ শতাব্দী এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যত নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছে, ঐতিহাসিকের নিকট ততই তাহার মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যতটা না পারিয়াছে, ততটাই তাহার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। জাতি তাহার মজ্জাগত বিচ্ছিন্ন ভাব ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সমাজের নিম্নস্তরে খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতা। সুতরাং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভিন্ন আর কোনরূপ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার পৌঁছিতে পারে নাই। রাজনৈতিক সংস্কার ত নহেই। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার, অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্কার। এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আমরা দেখিব যে, সভ্যতার কোন্ কোন্ দিকে আলোচ্য শতাব্দী কিরূপে কি সংস্কার করিয়াছে। বিশেষরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে একটা শতাব্দীকে অযথা নিন্দা বা অযথা প্রশংসা করা কর্তব্য নহে। অথচ এই শতাব্দীর একটা যথাযথ সমালোচনা ব্যতিরেকে আমরা বিংশ শতাব্দীতে অসতর্ক পদক্ষেপে হয়ত আরও নিষ্ফলতার দিকে চলিয়া যাইতে পারি!

শতাব্দীর প্রথমেই দেওয়ান রামমোহন। তিনি সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই

তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সংস্কারের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও প্রচণ্ড উদ্যম করিয়া গিয়াছেন। কোন জাতির মধ্যে, কোন যুগে, একা একজন ব্যক্তি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না।

স্মৃতির ব্যবস্থায় আচারে ও ব্যবহারে বহু সংস্কারের কথা তিনি বলিয়াছেন। ব্যবহার বিভাগে দায়ভাগ আলোচনাকালে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপর পিতার অপ্রতিহত অধিকারের দাবী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমি মনে করি দায়ভাগের তাহা অভিপ্রেত নয়। স্ত্রী-জাতির বিশেষতঃ বিধবা বিমাতা ও কন্যা ও পুত্রবধূদিগের সম্পর্কে সম্পত্তির ভাগবণ্টনে তিনি প্রাচীন স্মৃতির সাহায্যে তাঁহাদের প্রাপ্যের অংশ আরও বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছেন। দায়ভাগ-সম্পর্কে তাঁহার মীমাংসা সমালোচনার অতীত নহে। তথাপি এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পরিবার এবং সমাজের মধ্যে নারীজাতির স্বাধীনতা আরো বৃদ্ধি করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। সহমরণ নিবারণ কল্পেও তিনি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। জাতিভেদকে তিনি রাজনৈতিক পরাধীনতার ফল নয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রমতে হিন্দুর সহিত মুসলমানের শৈব বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রামমোহন শাঙ্কর বেদান্তের এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেবদেবীদিগের অস্তিত্ব মায়াবাদ সাহায্যে অস্বীকার করিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা চালিত হইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি যে বেদ-বেদান্ত তাহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যখন তাঁহারা ধ্বংসোন্মুখ, ঠিক সেই সময় রামমোহন শাঙ্কর বেদান্তের ভেরী নিনাদিত করিলেন। এই অদ্বৈতবাদ ও ঐক্য-মূলক শাঙ্কর বেদান্ত দ্বারা তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের উপর শাক্ত ও বৈষ্ণবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মকেও তিনি বিচার করিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে রামমোহন যেমন সমস্ত দিকেই শাক্তধর্মের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন তেমনি বৈষ্ণব ধর্মের উপর কথঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছেন।

তারপর দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নব্য-ন্যায়ের কোন উন্নতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয় নাই। কারণ, এই শতাব্দীতে প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃত ও শাস্ত্রালোচনা প্রায় মৃতপ্রায় হইয়া যায়। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের দর্শন বাঙ্গালী বিদ্যার্থীকে অধিকতর আকৃষ্ট করে এবং রামমোহন-প্রবর্তিত বেদান্তদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের মিশ্রণ হইয়া, দর্শন শাস্ত্রের এমন এক অদ্ভুত খেচরান্ন দেখা দেয় যে ধর্মান্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ ঐ সমস্ত দার্শনিক মতবাদ দর্শনকে ধর্ম হইতে পৃথক করিতে না পারিয়া, দার্শনিক চিন্তাকে ঐ চিন্তার ধারায় সর্বপ্রকার মৌলিকতাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। বিভিন্ন ভাষ্যকারের বেদান্তদর্শনের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক নব্য-ন্যায়ের মত কোন নূতন

দর্শন উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিভাগে বাঙ্গালী মস্তিষ্কের দুর্বলতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাহিত্য, সভ্যতার এক অতি বড় অঙ্গ। আলোচ্য শতাব্দীর প্রথমে সংস্কার-কার্যের জন্য রামমোহনকে বলিতে গেলে বাঙ্গলা-সাহিত্যের গদ্যের অংশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। বাঙ্গলা-গদ্য রামমোহনের পূর্বেও ছিল। কিন্তু রামমোহন সেই গদ্যকে সাহিত্যের পদবীতে আসন দিলেন। গদ্য-ভাষা লিখিত ও কথিত থাকিলেও সাহিত্যে স্থান পাইবার মত বাঙ্গলা-গদ্য রামমোহনের রচনাবলীর পূর্বে যাহা ছিল তাহাকে সাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তা ও চেষ্টার বিশেষরূপে আলোচনা এই শতাব্দীর মধ্যে হয় নাই। তাঁহাকে কেবল ধর্মসংস্কারক বলিয়া জানাতেই এদিকে আলোচনা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ কেন, ভারতবর্ষে এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হয় নাই, যাহার সূত্রপাত রামমোহনের চিন্তা ও রচনাবলীর মধ্যে না পাওয়া যায়। জাতীয় শক্তির সমবায়ে বৈধ উপায়ে ক্রমশঃ রাজনৈতিক উন্নতি লাভের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন। একদিকে যেমন রাজার অত্যাচার তেমনি অন্যদিকে প্রজার নিষ্ফল বিদ্রোহ বা অরাজকতার তিনি ছিলেন বিরোধী।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, রামমোহন বাঙ্গালী-সভ্যতার বিশেষত্বগুলিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রবর্তিত সংস্কার-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা সত্য কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ঊনবিংশ শতাব্দীতে হুবহু রক্ষা করা যায় না। গতিশীল জাতি তাহা উন্নতির পথেই হউক, অথবা অবনতির পথেই হউক (কেন না কোন জাতিই কালস্রোতে স্থির হইয়া একই স্থানে অবস্থান করিতে পারে না। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের অনুমোদিত সমাজের গতি-বিধি আলোচনা করিলেই আপনারা তাহা দেখিতে পাইবেন।) যে কোন জাতি তিন চারি শতাব্দীর পরে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে গিয়া, আত্মরক্ষার্থে অন্ততঃ—সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্যকেই পরিবর্তন করিয়া লইতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কেহই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হুবহু রক্ষা করিতে পারিত না। কোন যুগের কোন বাঙ্গালীই পারে না। সুতরাং কোন কোন স্থানে বাঙ্গালী-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে উন্নতি বা অবনতি-মুখে তাহার প্রয়োজন ছিল। আর ঠিক প্রয়োজন না থাকিলেও অবস্থাধীনে তাহা না হইয়া উপায় ছিল না। দ্বৈতবাদী ন্যায়দর্শনের স্থানে রামমোহন শাঙ্কর অদ্বৈত আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক কর্মবাদ ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের মধ্যে তিনি বৈদান্তিক জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। গৃহীর পক্ষে যে নির্গুণ নিরাকার

ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে, ইহা যে কেবল সন্ন্যাসীর জন্য নহে, এই তত্ত্ব এযুগে তিনি আবার প্রচার করিয়াছিলেন এবং শাক্তের মাতৃভাবের উপাসনা ও বৈষ্ণবের কান্তভাবের উপাসনা এই দুই ভাবই রামমোহন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অথচ নারীজাতির উচ্চাধিকারের তিনি এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপে বাঙালী-সভ্যতার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি অতীত কাল হইতে নবযুগের বিশালতর ক্ষেত্রে পেঁৗছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার কোন কোন বৈশিষ্ট্য যে-কোন কারণেই হউক, তাঁহার হাতে পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইতিহাসের চলন্ত স্রোতের কোন বস্তুকেই চিরকাল ধরিয়া রাখা যায় না।

রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে রামমোহন হইতে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। বাঙলার শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনে যে বিশদ আলোচনা ছিল দেবেন্দ্রনাথে তাহা নাই। রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈত দেবেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করিলেন। বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিলেন। বেদের স্থানে আসিল আত্ম-প্রত্যয়। মূর্তিপূজা অবশ্য রামমোহনেও ছিল না। মূর্তিপূজা নাই, বেদ নাই, স্মৃতি-কথিত ধর্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের কোনরূপ সংস্কার বা আলোচনা নাই, আছে কেবল উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদ ও তাঁহার উপাসনা। অবশ্য তৎকালীন খৃষ্টানধর্মের প্রতিবাদও দেবেন্দ্রনাথে যথেষ্ট ছিল এবং ইহার গুরুত্ব ঐতিহাসিক বিস্মৃত হইতে পারে না।

এক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু' একটি কথা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দেশে আর একটা সম্প্রদায়ের ধর্মরূপে দেখা দিল। রামমোহনের শাঙ্কর অদ্বৈতবাদমূলক নির্গুণ একেশ্বরবাদ পরিবর্তিত হইয়া উপনিষদের সগুণ নিরাকার ঈশ্বরবাদ প্রবর্তিত হইল। "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের" স্থানে হইল "ব্রাহ্মধর্ম"। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে যে ধর্মের তত্ত্ব-মীমাংসা রামমোহন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল "আত্ম-প্রত্যয়ের" উপর ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম বেদ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পর শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'ধর্মতত্ত্ব-দীপিকা'তেও আত্ম-প্রত্যয়ের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এই আত্ম-প্রত্যয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ফরাসীর কার্তেজীয়ান দর্শন হইতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই দার্শনিক ভিত্তির উপর সগুণ ব্রহ্মবাদমূলক উপনিষদ বাক্য-গুলিকে আহরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম নির্মাণ করিয়াছেন। 'আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা' নামক একখানি চটিগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অদ্বৈতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর অদ্বৈতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবাদ

স্বীকার করিলেও তদঙ্গীয় পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন। অথচ বিবর্তবাদ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে "বিবর্ত উপাদানকারণ বলা অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র।" এ অতি অদ্ভুত মীমাংসা; পরিণামবাদও নয়, বিবর্তবাদও নয়, অথচ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশে ও গতিতে কোন একটা মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত যদি দেবেন্দ্রনাথ না দিতে পারিলেন, তবে কি করিয়া অন্ততঃ তিনি শাঙ্কর মায়াবাদের প্রতিবাদ করিলেন তাহা বুঝা কঠিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন অতিবড় সৌন্দর্যের উপাসক, তিনি সাধক ছিলেন, দার্শনিক তত ছিলেন না। তাহাতে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমা খর্ব হয় না।

আপনারা দেখিলেন, ফরাসী কার্তেজীয়ান দর্শনের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের খৃষ্টপ্রীতি সত্ত্বেও তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের "সহজ জ্ঞান"-বাদ এই দার্শনিক ভিত্তির উপরেই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাহার ভিত্তি জার্মেনীর হেগেল দর্শনের ইংলণ্ডীয় তর্জমা। তরঙ্গের পুরোভাগে ফেনিল বেদান্তের কলকল ধ্বনি থাকিলেও দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিক ভিত্তি যথাক্রমে ফরাসী, স্কট্‌ল্যাণ্ড, জার্মানী ও ইংলণ্ড হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্মেরই একটা তদঙ্গীয় মতের দার্শনিক ভিত্তি আছে। বাঙলার শাক্ত বা শৈব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ঠিক শাঙ্কর-অদ্বৈত নয়, তবে অনেকটা সেই রকম। বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি না রামানুজী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, না বল্লভাচারী দ্বৈতবাদ, ইহা জীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণের "অচিন্ত-ভেদাভেদ বাদ"। বাঙলার শাক্ত ও বৈষ্ণব বৌদ্ধ-প্লাবনের পর অনেকটা বাঙালীর নিজ প্রকৃতি হইতে, স্বরূপ হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। এই দুই সাম্প্রদায়িক সাধন-ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্বভাবের নিয়মেই, আপনা হইতেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে দেখা দিয়াছিল। উত্তর ভারতের শাঙ্কর অদ্বৈত অথবা দক্ষিণ ভারতের বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ বাঙলার কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কোন ধর্মেরই ভিত্তি হইতে পারে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেবল নব্য-ন্যায়ের মত কোনরূপ নূতন দর্শনের উদ্ভবই যে শুধু হয় নাই তাহা নহে। শাক্ত ও বৈষ্ণব বেদান্ত যেমন বাঙালীর নিজস্ব, ব্রাহ্ম-বেদান্ত বাঙালীর তেমন নিজস্ব নয়। ব্রাহ্মধর্মে বাঙলার দার্শনিক বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। অবশ্য পাশ্চাত্য দর্শনের অত্যুজ্জ্বল অথচ বলপ্রদ প্রভাব হইতে ব্রাহ্ম, শাক্ত বা বৈষ্ণব কাহারই এযুগে দূরে থাকা উচিত নয়, কেন না তাহা সম্ভব নয়; তবে দেশীয় দর্শন ও দেশীয় ধর্মের সংস্কার অর্থ যদি তাহাকে এককালে পরিত্যাগ হয় তবে তাহা পরানুকরণ মাত্র।

এইবার আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার বলিতেই যুগপৎ পৌরুষ এবং দয়ার অবতার সেই পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাই সকলের মনে আসে। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনই শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্বাপেক্ষা বড় আন্দোলন। পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ-আইন পাশ করাইলেন। পঁচিশ সহস্র হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। রামমোহন-প্রতিদ্বন্দ্বী স্যার রাধাকান্ত দেব সহমরণ নিবারণকল্পে যেমন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন, তেমনি বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করিবার বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। যাহাতে বিধবাবিবাহ-আইন পাশ না হয় তজ্জন্য তিনি ত্রিশ সহস্র লোকের স্বাক্ষরসংযুক্ত আর এক আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। রাজদ্বারে যেমন সহমরণ নিবারণকল্পে রামমোহন জয়ী হইয়াছিলেন তেমনি বিধবাবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ করার পক্ষে বিদ্যাসাগর জয়ী হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই উভয় ক্ষেত্রেই রাধাকান্তদেব রাজদ্বারে পরাজিত হইলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজশক্তির প্রভাবে যেমন সহমরণ প্রথা নিবারণ করিয়া দিলেন তেমনি বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করিয়াও হিন্দুসমাজ তাহার আশানুরূপ প্রচলন করিতে পারিলেন না। ভিন্নধর্মী ও বৈদেশিক রাজশক্তি সমাজক্ষেত্রে কোন নূতন প্রথা যত সহজে বন্ধ করিতে পারে তত সহজে প্রচলন করিতে পারে না। কেননা বন্ধ করায় কেবল বল প্রয়োগ বুঝায় আর প্রচলনকল্পে সমাজের নিজের একটা আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন হয়। সমাজের তাহা ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরাশর স্মৃতিবচন উদ্ধার করিয়া হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রথমে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন। পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পুনরায় বৃহদাকারে ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য যেমন তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় লইলেন তেমনি তিনি অকাট্য যুক্তিরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ঠিক রামমোহনের মতই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে তাহাই চিরন্তন প্রথা ছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত পদ্ধতিতে শাস্ত্র ও যুক্তির যে মণিকাঞ্চনযোগ দেখা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী-সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য যুগোপযোগিভাবে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র বা এমন কি তাঁহার পরবর্তী ব্রাহ্ম প্রচারকদের সংস্কার পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ যুক্তির প্রসারই খুব বেশী। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিন আইনে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে কতকাংশে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে তিন আইনের অসবর্ণ বিবাহে জাতিভেদ রহিত হইলেও, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার গভর্ণমেণ্ট দ্বারা আইন-

সম্মত বলিয়া গৃহীত হইলেও এবং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইলেও বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে ইহা আশানুরূপ চলিল না। ইহার কারণ মজ্জাগত রক্ষণশীলতা, প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সৎসাহসের প্রকাণ্ড অভাব এবং বৈদেশিক রাজশক্তির সহিত স্বদেশীয় সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগ নাই বলিয়া। এতক্ষণ আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের কথাই বলিলাম। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীসভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখিয়া পুনরায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহাকে সংস্কার করিয়া কিরূপে উন্নতিমুখী করা যায় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কোথাও বা রক্ষিত হইয়াছে এবং কোথায়ও বা হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের অনুকরণ-মোহ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত জাতিকে স্বভাবতঃই তাহার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে কৃত্রিম ও অসুস্থ উত্তেজনায় সময় সময় উত্তেজিত করিয়াছে। তজ্জন্য সমাজ-সংস্কারে কৃত্রিম উত্তেজনাপ্রসূত চাঞ্চল্যও দেখা গিয়াছে।

সংস্কার যুগের পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগের প্রথম অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে যে এক প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগের সূত্রপাত হয় তাহা আমি প্রথমে আপনাদের নিকট বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে ছিল দুইটি প্রধান সাম্প্রদায়িক ধর্ম—শাক্ত আর বৈষ্ণব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গেল শাক্ত, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্ম। আবার এই ব্রাহ্ম সমাজও আদি, নব-বিধান ও সাধারণ তিনি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে এক মহামিলনের জন্য যদি রাজা রামমোহনের পক্ষে শঙ্কর-অদ্বৈত প্রচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে শাক্ত-বৈষ্ণব এবং তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ব্রাহ্মগণ (যাঁহাদের কোন এক সম্প্রদায়ের ধর্মই বিশুদ্ধ শঙ্কর-অদ্বৈতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, পরন্তু যাঁহারা শঙ্কর অদ্বৈতের উপর খড়্গহস্ত) ইঁহাদের পরস্পর মতের অনৈক্যের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দকেও সেই একই মহামিলনের জন্য শঙ্কর-অদ্বৈতের ভেরী পুনরায় নিনাদিত করিতে হইল। যত্র জীব তত্র শিব। প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যেই যে ব্রহ্ম আছে এই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে নরনারী প্রত্যেকেই জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম। পতিতদেশের নর-নারীকে এই কথা আবার বলিবার একটা গুরুতর দায়িত্ব স্বামিজী অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে শাক্ত ও পণ্ডিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বৈষ্ণবধর্মের যুগাবতার বলিয়া আমি ইতিপূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। রামমোহন শঙ্কর অদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া যেরূপ তৎকালীন শাক্ত

ও বৈষ্ণবকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ নিজ নিজ জীবনের অপূর্ব উদার ধর্মবোধ ও অধ্যাত্ম অনুভূতি দ্বারা শাক্ত, বৈষ্ণব বা এমন কি ত্রিবিধ ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের কতকাংশের মধ্যেও একটা মিলন সমন্বয় বা ঐক্য দেখাইয়া গিয়াছেন; সংস্কারযুগ মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তাহা পর্যন্ত করিতে হয় নাই। ইহাতে সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে।

এই পরিত্যাগ করিবার অনিচ্ছা হইতেই প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত দেখা দিয়াছে। সমাজ-সংস্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে তাহার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে একটা রক্ষণশীলতামূলক সংস্কার যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ভাব। সমগ্র জাতিকে বিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিক্রিয়ার ভাব অনেকটা পরিহার করিতে হইবে; অন্যথা এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ সুফল দেখা যাইবে না।

কেননা, এই সমন্বয়-যুগের পৃথিবীবিখ্যাত প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে—

"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ। আর যদি কোন পুরাণ কোনরূপে বেদের বিরোধী হয় তবে পুরাণের সেই অংশ নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমরা স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই বিভিন্ন স্মৃতির উপদেশ বিভিন্ন প্রকার। শাস্ত্রের এই মতটি কি উদার ও মহান্। সনাতন সত্যসমূহ মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাঁচিবে, ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া সর্বদেশে সর্বাবস্থায়ই ঐগুলি ধর্ম। স্মৃতি অপরদিকে বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্তব্যসমূহের কথাই অধিক বলিয়া থাকেন; সুতরাং কালে কালে সেগুলি পরিবর্তন হয়। একথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে কোন সামান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়া তোমাদের ধর্ম গেল মনে করিও না। মনে রাখিও, এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকাল পরিবর্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। * * বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে। সময়-স্রোত যতই চলিবে, ততই পূর্ব পূর্ব স্মৃতির প্রামাণ্য লোপ হইবে। আর মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সমাজকে পূর্বাপেক্ষা ভাল পথে পরিচালিত করিবেন। সেই যুগের পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যকীয়, যাহা ব্যতীত সমাজ বাঁচিতেই পারে না, তাঁহারা আসিয়া সেই সকল কর্তব্য সমাজকে দেখাইয়া দিবেন।"

সংস্কার-যুগের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া স্বামিজী যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার কতকগুলি উক্তি আমি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

ঐ সমস্ত উক্তি হইতে আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, স্বামিজী সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাহা নয়। এইজন্য আমি উপরে স্বামিজীর সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞান-অনুমোদিত মতটি পুনরায় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। বস্তুতঃ, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সামাজিক অনেক গুরুতর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতাবলম্বীরা অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার আবরণে যেরূপ বিচার-বুদ্ধি ও দায়িত্ব-হীনতার পরিচয় দেন তাহাতে সাধারণের সমক্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে অযথা কলঙ্কের ভাগী করা হয়।

আমার পরবর্তী পরিচ্ছেদে রাজা রামমোহন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা কিরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দশম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস আলোচনা

শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন ও শেষে স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারে মূলতঃ শঙ্করানুগামী। রামমোহন সন্ন্যাস অপেক্ষা গার্হস্থ্যের উপর ঝোঁক দিয়াছেন; বিবেকানন্দ ব্যষ্টি-মুক্তি ছাড়িয়া সমষ্টি-মুক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন! আচার্য শঙ্কর হইতে রামমোহন ও বিবেকানন্দের যে সমস্ত দিকে একটা প্রস্থান কল্পনা করা যায় তাহার কথা পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে আমি বলিয়াছি। আচার্য শঙ্কর বা স্বয়ং বুদ্ধদেবের অদ্বয়সিদ্ধিরূপ দার্শনিক মতবাদের অন্তরালে যে একটা বিরাট সমাজ-সংস্কারের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ছিল তাহার কথাও আমি বলিয়াছি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দার্শনিকগণ নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ের গভীরতার মধ্যে এতদূর নিমগ্ন থাকিতেন যে বিষয়ান্তরে তাঁহাদের প্রবেশ ও অধিকার আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি রাজা রামমোহন একজন উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রত্যুষে তিনি কেবল শঙ্কর-অদ্বৈতের ভেরী-নিনাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পরমার্থ ও লোকব্যবহার—ইহার সমস্ত বিভাগেই তিনি তাঁহার মৌলিক গবেষণা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্কর হইতে এইখানেও রামমোহনের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। রামমোহনের পরে আর কোন সংস্কারকই জাতির সমস্ত বিভাগে এক সঙ্গে এত অধিক চিন্তা ও কার্য করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে রামমোহনের প্রতিভার সর্বতোমুখী বিস্তার আর কাহারও মধ্যেই লক্ষিত হয় না।

রামমোহন ও বিবেকানন্দে, শাঙ্কর বেদান্তের পুনঃ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটা ইতিহাস আলোচনারও সূত্রপাত দেখিতে পাই। ইঁহারা উভয়েই যে অদ্বৈত-বাদ ও মায়াবাদকে এযুগে একটা সামাজিক উদ্দেশ্য বা সংস্কার সম্মুখে রাখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহা আপনারা স্পষ্ট দেখিয়াছেন এবং ইঁহাদের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচারের মূলে সমাজ-সংস্কারের একটা অভিপ্রায় ছিল বলিয়াই ইঁহারা অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার সমকালীন বা তাঁহার পূর্বেকার ভারতেতিহাস আলোচনা করিয়াছেন এমন দেখা যায় না। তবে তাঁহার দার্শনিক বিচার প্রসঙ্গে ভারতেতি-হাসের যে কোন চিত্র আমরা পাই না তাহা নহে। কিন্তু তাহা ইতিহাস-আলোচনা নহে, তাহা বস্তুতঃ দর্শনালোচনা এবং সেই প্রসঙ্গে তৎকালীন ইতিহাসের একখানা চিত্র আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় বটে। রামমোহন ও বিবেকানন্দ শঙ্করানুগামী দার্শনিক। কিন্তু ইঁহাদের উভয়েরই ইতিহাস, বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস আলোচনায় বিস্তর মৌলিক গবেষণা বিদ্যমান। ইঁহারা কেবল দার্শনিক নহেন।

ইঁহাদের মধ্যবর্তীকালের সংস্কারকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র অক্ষয়কুমার দত্তের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর কেহ তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহেন।

যাঁহারা কেবল দার্শনিক তাঁহারা সম্ভবতঃ শুদ্ধ দর্শনালোচনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা মুখ্যভাবে সমাজের একটা জীবন ও গতি স্বীকার করিয়া তাহার সময়োপযোগী পরিবর্তন বা সংস্কার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের কেবল একটা দার্শনিক মতবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মপদ্ধতির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিলে চলে না। তাঁহাদিগকে সেই সঙ্গে জাতির অতীত ইতিহাসও আলোচনা করিতে হয়। শতাব্দীর অন্য সংস্কারকেরা যাহাই হউন, রামমোহন ও বিবেকানন্দ কেবল দার্শনিক ছিলেন না। তাঁহারা উভয়েই মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কাজেই দেশের অতীত ইতিহাস তাঁহাদিগকে বিশেষভাবেই আলোচনা করিতে হইয়াছে। কেননা ইঁহারা উভয়েই মানব সমাজের একটা জীবন ও গতি স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই গতিমুখে ভারতীয় সমাজ, পৃথিবীর অন্যান্য জীবন্ত ও চলন্ত জাতি সকলের সহিত একসঙ্গে, যাহাতে উন্নতির পথে চলিতে পারে তাহার জন্য অমানুষিক চেষ্টায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা কেহই ধারাবাহিকরূপে দেশের প্রাচীন ইতিহাস কোন বৃহৎ পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়া যান নাই; কিন্তু তথাপি এই উভয় মনীষীর রচনাবলী যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই বলিবেন যে, ইঁহাদের ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট মৌলিক গবেষণার মূল্য কত বেশী।

রামমোহন তাঁহার সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, প্রচলিত মূর্তিপূজার সহিত তখনকার দিনের যত প্রকার সামাজিক দুর্নীতি অচ্ছেদ্যভাবে

জড়িত রহিয়াছে। কাজেই সমাজ-সংস্কারের জন্য তাঁহাকে মূর্তিপূজার উচ্ছেদ-কল্পে ব্রতী হইতে হইল। সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় উচ্চাধিকার লাভের জন্যই ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজন হইল।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্ম-সংস্কারকে হিন্দুধর্মের সংস্কার বিবেচনা না করিয়া একরূপ মূলোচ্ছেদ বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেব হইতে রামমোহন রায়কে ভ্রান্ত ধর্ম-সংস্কারক বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কেন না স্বামিজীর মতে কি বুদ্ধদেব, কি রামমোহন রায়, সমাজ সংস্কারের জন্য উভয়েই ধর্মকেই একান্তভাবে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া স্বামিজী বুদ্ধদেব ও রামমোহন রায়ের উপর সুবিচার করিতে পারিয়াছেন কিনা বলা শক্ত। কেননা, ধর্মের সংস্কারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হইয়া সফলকাম হওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ বিদ্যমান। আর বিবেকানন্দের মত রামমোহনও ধর্ম ও সমাজের পরস্পর অঙ্গাঙ্গী যোগ স্বীকার করিয়াও এতদুভয়ের পরস্পর স্বাধীন ক্ষেত্র অস্বীকার করেন নাই। আমার মনে হয়, রামমোহন ধর্মকে সমাজের একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। বিবেকানন্দ ধর্মকে সমাজ হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্র নহে।

এক্ষেত্রে রামমোহনকে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও ভারতেতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেশের ইতিহাসে যে সমস্ত বড় বড় সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা কেবল "ধর্মের নামে সংসাধিত" হইতেছে। স্বামিজী বলেন, "চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর; নানক; চৈতন্য; ব্রাহ্ম-সমাজ; আর্য-সমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"

ভারতেতিহাসে প্রত্যেক ধর্মতরঙ্গের পশ্চাতেই স্বামিজী একটি "সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ" দেখিতে পাইয়াছেন। সমাজের সমসাময়িক অভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে তিনি কোন ধর্মতরঙ্গকে দেখেন নাই এজন্য তাঁহার দেখা অত্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ভারতেতিহাসের পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত সমাজের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যোগ, এইরূপ ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়া দেখার মধ্যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।

প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, একটা মূল ভাব আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি, শাখাভাবগুলি দণ্ডায়মান। ভারতেতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বা মূল ভাব ধর্মে। কাজেই তিনি অন্যান্য সংস্কারে হস্তক্ষেপ না করিয়া ধর্মসংস্কারেই প্রথম হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি জাতির মূলভাব অথবা বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে, এই জাতি যদি তাহার ধর্ম রক্ষা করিতে পারে, তবে রাষ্ট্রের অধিকার, সমাজের সংস্কার

উহা স্বাভাবিক নিয়মবশেই আপনা হইতেই হইবে। যেমন মূল স্বাস্থ্য ভাল হইলে শরীরের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপহৃত বল পুনরায় ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে সেইরূপ সমাজ-শরীরের স্বাস্থ্য হইতেছে তাহার মূলভাব, তাহার বৈশিষ্ট্য; সেই মূল ভাব অথবা বৈশিষ্ট্য যদি ক্রমশঃ স্ফূর্তি পাইতে থাকে তবে অন্যান্য ভাবগুলিও তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া বিকশিত হইবে। এই ঐতিহাসিক আলোচনার উপরে নির্ভর করিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন যে, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।" "স্বাভাবিক উন্নতি" অর্থে বুঝিতে হইবে সমগ্র সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য।

প্রত্যেক জাতির মূল ভাবের পরিপুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি ধর্ম প্রচার করিতেন। কিন্তু সকলজাতির মূল ভাব এক নয়, কোন জাতির মূল ভাব রাষ্ট্রে উচ্চাধিকার লাভ, কোন জাতির মূল ভাব সামাজিক স্বাধীনতার বিকাশ, আবার কোন জাতির মূল ভাব ধর্ম বা মোক্ষলাভ। এইজন্য স্বামিজী ইংলণ্ডে অদ্বৈত প্রচার করিবার সময় অদ্বৈতবাদের সহিত রাষ্ট্রীয় উচ্চাধিকারের সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। আমেরিকায় অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার সময় অদ্বৈতবাদের সহিত সামাজিক স্বাধীনতার সম্পর্ক দেখাইয়াছেন এবং নবযুগে বর্তমান ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রচারের সঙ্গে ধর্মের বা মোক্ষলাভের সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। অবশ্য ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রচারে এযুগে ব্যষ্টি-মুক্তি ছাড়িয়া সমষ্টি-মুক্তির অবতারণা করায় এবং বেলুড়মঠে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রাক্কালে সন্ন্যাসের আদর্শেও এই সমষ্টি-মুক্তির কথা ঘোষণা করায়, তথাকথিত মধ্যযুগের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ ও কর্মসন্ন্যাস প্রভৃতি হইতে স্বামিজী-কথিত অদ্বৈতবাদের যেমন স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে তেমনি যে সামাজিক অভাব পূরণের জন্য তিনি ভারতে শতাব্দীর শেষভাগে অদ্বৈত-পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন তাহাও সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন যে, রামমোহন ও বিবেকানন্দ কেবল অদ্বৈতবাদ প্রচারক ছিলেন না, তাঁহারা বিশেষভাবে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা নিপুণভাবে ভারতেতিহাসের গতিকে অনুসরণ করিয়া তাহার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া এই বিংশ শতাব্দীর বিশালতর ক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ ও সংক্ষেপে ভারতেতিহাসের কয়েকটি বিভিন্ন যুগের ব্যবচ্ছেদ দেখাইতে গিয়া যে সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও বহু অংশে তাহার অনুরূপ। মুসল্‌মান অধিকারের পূর্বে, বৌদ্ধ-বিপ্লবেরও পূর্বে হিন্দু রাজাদিগের সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন ও বিবেকানন্দ প্রায় একমত। হিন্দু নরপতিগণ এই সময় পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীনরাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহারা

একই ধর্ম ও আচার ব্যবহারের অনুবর্তী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর একতা ছিল না। রামমোহন বলিতেছেন—

"এই বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্য, পূর্বকালে, ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ সমস্ত স্বাধীন রাজারা একে অন্যের অধীন ছিল না। সকলেই একে অন্য হইতে স্বাধীন ছিল। কিন্তু একে অন্যের প্রতি শত্রুতাপরায়ণ থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যেকেই এক হিন্দুধর্মের অন্তর্গত ছিল। এবং সকলেই সাধারণভাবে একই হিন্দুশাস্ত্রের আচার, ব্যবহার—তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, পালন করিত।"*

এই যুগ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রামমোহন যেমন খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন রাজশক্তির একত্র সমবায়ের অভাবের কথা বলিতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তদ্রূপ এই যুগের প্রজাশক্তির খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার উপরেই আমাদের দৃষ্টিকে সমধিক আকর্ষণ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন—

"প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে, বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই। সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।"

আবার স্বামিজী ইহাও বলিতেছেন—

"শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে—"এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে"—তাহা যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না তাহাও নহে। তখন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায় এবং প্রকৃতি [প্রজাশক্তি] দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে গ্রাম্য পঞ্চায়তে নিশ্চিত বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না, এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।"

বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দুযুগ সম্বন্ধে রামমোহন রাজশক্তির দিক্ দিয়া, বিবেকানন্দ প্রজাশক্তির দিক্ দিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটা একতার অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

---

*"Wide tracts of this Empire (India) were formerly ruled by different individual princes, who, though, politically independent of, and hostile to each other, adhered to the same religious principles, and commonly observed the leading rites and ceremonies taught in the Sanskrit language, whether more or less refined."—*Raja Ram Mohan Roy.*

পরবর্তী বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে রামমোহন বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বহুস্থানে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের কথা বলিতে গিয়া স্বামিজী বলিতেছেন—

"এযুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি। বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরব-বৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই।"

বৌদ্ধযুগে বিচ্ছিন্ন রাজশক্তি ভারতক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই বৌদ্ধযুগের অধঃপতনের পরে এবং মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত যে যুগ সেই সম্বন্ধেও রামমোহন ও বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রামমোহন বলিতেছেন যে, মুসলমান অধিকারের পূর্বে সমগ্র ভারতে কোনরূপ একতা ছিল না।

প্রথমতঃ, পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন ছিল। তার উপরে এই সমস্ত স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত স্বাধীন নরপতিগণ একে অন্যের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে নিয়তই চেষ্টা করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মধ্যে একের পর আর পুনঃ পুনঃ এত বিবিধ রকমের জাতি-বিভাগ ও সম্প্রদায়-বিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছিল যে, সেই সকল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক একতা আর সম্ভব হয় নাই।

কাজেই ভারতেতিহাসের এই অধ্যায়ে বিজয়ী মুসলমান আক্রমণকারিগণ সহজেই প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।* এই সম্পর্কে রাজশক্তির বিভিন্ন অংশের যেমন, আইন-প্রণয়ন বিভাগ, বিচার-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ইহাদের পরস্পর যোগ ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিয়া রামমোহন যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে যদি পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞদের প্রভাব না থাকে তবে ইহা রামমোহনের ইতিহাস বিশ্লেষণে রাজনীতিশাস্ত্রে এক অতিবড় মৌলিক গবেষণা।

রামমোহন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দু-রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা রাজবিধি প্রণয়ন করিতেন, আর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ঐ সকল রাজবিধি দ্বারা প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণেরাও রাজ্যশাসন করিত না আর ক্ষত্রিয়েরাও রাজবিধি প্রণয়ন করিত না। রাজশক্তির

*"In consequence of the multiplied divisions and sub-divisions of the land into separate and independent kingdoms, under the authority of numerous princes hostile towards each other;—and owing to the successive introduction of a vast number of castes and sects, destroying every texture of social and political unity—the country was at different periods invaded and brought under temporary subjection to foreign princes, celebrated for power and ambition."—*Raja Ram Mohan Roy.*

এইরূপ বিভাগে প্রজার উপর যথেচ্ছ আচরণের কোনই সুবিধা ছিল না। কিন্তু চিরদিন এইরূপ চলিল না। কালক্রমে (অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের অবনতির পর) এমন ঘটিল যে, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কর্ম স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়ের ভৃত্য হইলেন। সুতরাং যথেচ্ছাচারী ক্ষাত্র নরপতিগণ অধীনস্থ ব্রাহ্মণ কর্মচারী দ্বারা ইচ্ছামত রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া প্রজার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণের স্বাধীনতালোপেই ক্ষাত্রশক্তি অথবা রাজশক্তি যথেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং ক্ষাত্রশক্তি যথেচ্ছাচারী হইয়াই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপন মৃত্যুস্বরূপ মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। রাষ্ট্রের ইতিহাসে যথেচ্ছাচার চিরকাল স্থায়ী হয় না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিবার পূর্বে রাজপুতেরা এইভাবে প্রায় সহস্র বৎসর এদেশে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। রাজার জীবনচরিতকার বলেন যে, "রাজার মতানুসারে, এ বিষয়ে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।"

স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রামমোহনের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। স্বামিজী দেখিয়াছেন যে, ভারতেতিহাসে—বৈদিকযুগে রাজশক্তি পৌরোহিত্য শক্তির অধীন, বৌদ্ধযুগে পৌরোহিত্য শক্তির পতন ও রাজশক্তির অভ্যুদয়, ফলে ভারতের একচ্ছত্র বৌদ্ধ সম্রাটগণের আবির্ভাব। পুনরায় বৌদ্ধ-যুগের অবনতির পরে স্বামিজী বলিতেছেন—

"এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইঁহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারি-ভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছিল।"

এই যুগকেই আমি ধর্মের ইতিহাসের দিক্ হইতে আমার পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

মুসলমান অধিকারের পূর্বে রামমোহন—

১) হিন্দু নরপতিদিগকে ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পর শত্রুতাচরণে বদ্ধপরিকর দেখিয়াছেন।

২) পরস্পর-বিরোধী বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত সমাজে কোনরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক একতার সম্ভাবনা বা চিহ্নও দেখিতে পান নাই।

৩) ক্ষত্রিয়ের অধীনে ব্রাহ্মণেরা কর্ম স্বীকার করায়, রাজশক্তির শাসন-বিভাগের অধীনে, ব্যবস্থা-প্রণয়ন-বিভাগকে দাসত্ব করিতে দেখিয়া, রাজ্যে প্রজার স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা দেখিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই মুসলমান অধিকারের পূর্ব-যুগ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন তাহাও দেখুন। স্বামিজী বলিতেছেন—

"এ বিপ্লবে—বৈদিককাল হইতে আরব্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ বিপ্লবে বিরাটরূপে

স্ফুটীকৃত পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এখন এই দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক; কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্যও নাই, ব্রহ্মবীর্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়—বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ, বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন, ইত্যাদি কার্য ক্ষয়িতবীর্য এ নূতন শক্তি সঙ্গম, নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল; শোণিত শোষণ, বৈরনির্যাতন, ধন-হরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসুয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাদি চাটুকার শৃঙ্খলিত পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাযোগ জালে জড়িত হইয়া, পশ্চিম-দেশাগত মুসলমান ব্যাধ নিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।"

স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তে বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণশক্তি প্রবল, বৌদ্ধযুগে ক্ষাত্রশক্তি প্রবল, বৌদ্ধযুগের পর পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় শক্তিই হীনবল। সুতরাং এই হীনবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তিই সমগ্র দেশকে মুসলমান আক্রমণকারীদিগের "সুলভ মৃগয়ায়" পরিণত করিয়া দিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে যে সমস্ত অত্যাচারের কথা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামমোহন সেই সমস্ত রাজধর্মের ব্যভিচারকে অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মুসলমান রাজত্বে হিন্দু রাজকর্মচারীদের উচ্চপদের প্রতি এবং বিশেষভাবে সাধারণ প্রজার অবস্থার প্রতি তিনি বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়া মুসলমান রাজত্বের উপর একটা অপক্ষপাত বিচার করিয়াছেন।

বিবেকানন্দ মুসলমান রাজাদিগের ধর্মানুরাগের সহিত "কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজনের" প্রতি কটাক্ষপাত করিলেও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের পথ হইতে কোথাও স্খলিতপদ হন নাই।

রামমোহন মুসলমান যুগকে দেখিয়াছেন রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়া; আর বিবেকানন্দ দেখিয়াছেন ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের দিক্ দিয়া। সাধারণভাবে বলিয়া গেলে ইতিহাস বিশ্লেষণে রামমোহন ও বিবেকানন্দে এইখানে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, রামমোহনের ইতিহাস আলোচনায় যেমন ধর্ম ও সমাজের প্রসঙ্গ আছে, বিবেকানন্দের ইতিহাস আলোচনাতেও রাজশক্তির উত্থান ও পতন বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

সমগ্র মুসলমান যুগে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের মধ্যে রামমোহন কেবল এক অধঃপতনের চিত্রই দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি রামমোহন সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিবেকানন্দ আবার এই যুগের ধর্ম-বিপ্লবের প্রতি, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানের প্রতি—রামমোহন হইতে অধিকতর সুবিচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য রামমোহন হইতে বিবেকানন্দের পক্ষে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য

সময়ের পরিবর্তন যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই রামমোহন এ যুগের শাক্ত সম্প্রদায়ের দুর্নীতিগুলিকে,—যথা মদ্যপান, শৈববিবাহ প্রভৃতি যেরূপ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার ঐ যুগের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তথাকথিত দুর্নীতিগুলির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতের সামঞ্জস্য আছে কিনা, বলা শক্ত। অন্যদিকে গোপীপ্রেমের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াও বিবেকানন্দ তান্ত্রিক বামাচারের প্রতি নিতান্তই খড়্গহস্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য তান্ত্রিক সাধনার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পরিণতি সম্বন্ধে স্বামিজী অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিসূচক মতও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এখানে ইতিহাস আলোচনার পথে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশ সম্পর্কে রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

সে যাহা হউক রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই মুসলমান বিজয়ের পূর্বে রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ে পুনরায় একটা ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই রাজপুত জাতি বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া, বহুজাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, শিথিল বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে কোনরূপ একতা আনিতে পারে নাই, কাজেই মুসলমানের গতি তাহারা রোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। এ বিষয়ে রামমোহন ও বিবেকানন্দ একমত।

কিন্তু এই নূতন ক্ষাত্রশক্তির সহিত রাজবিধি প্রণয়নকারী ব্রাহ্মণ্য-শক্তির সম্পর্ক বিচারে রামমোহন বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীনস্থ হইয়াই ক্ষাত্রশক্তিকে যথেচ্ছাচারী করিয়া মুসলমান-বিজয় সম্ভব করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, "বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান-সাম্রাজ্য-স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতি দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা।"

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় যদি বুঝিতে হয় যে, এ যুগের পৌরোহিত্য শক্তির নবজীবনের চেষ্টার অর্থ ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা, তবে রামমোহন হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত শুধু পৃথক্ নয়, বিপরীত। কেননা, রামমোহন বলিয়াছেন যে, এযুগে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্ষাত্রশক্তির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বিবেকানন্দ এযুগ পৌরোহিত্যের নবজীবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলেন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই দুই শক্তি পরস্পর স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরস্পর সহায়ক। সুতরাং ব্রাহ্মণ যেমন ক্ষত্রিয়ের অধীন হইয়া রাজশক্তির অভিপ্রেত রাজবিধি প্রণয়ন করিতেছিল, তেমনি ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির উপর সবিশেষ নির্যাতন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ফলে এই হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের শাপে আর ক্ষত্রিয়ের চাপে এযুগে বৌদ্ধধর্মাক্রান্ত বৈশ্য ও শূদ্রজাতিসকল নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাহারা ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হইয়াছিল কিনা? এবং কেই বা বলিতে পারে যে, ব্রাহ্মণ

ও ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে বৈশ্য ও শূদ্রের যে প্রবল অসন্তোষ এযুগে দেখা দিয়াছিল, তাহারি সহায়ে এবং তাহারি উপর ইসলাম পতাকাবাহী বীরগণ তাঁহাদের শুধু বিজয়স্তম্ভ নয়, সহস্র বৎসরব্যাপী সাম্রাজ্যকে নিখাত করিয়াছিলেন কিনা? ভারতেতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া এই জটিল প্রশ্নটিকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া কোনক্রমেই সংগত নহে। ভারতে মুসলমান-বিজয় এবং মুসলমান সাম্রাজ্য কিসে সম্ভব হইল এ প্রশ্নের উত্তর ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে এখনও আমরা যথাযথভাবে পাই নাই।

তারপর মুসলমান যুগে রাজশক্তি ক্ষত্রিয় নহে। এই ভিন্নধর্মী রাজশক্তির সহিত ব্রাহ্মণ্যশক্তির কোনই সম্বন্ধ রহিল না। শুধু তাহাই নয়, বিবেকানন্দের মতে মুসলমান যুগের পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি হতবল হইয়া আসিতেছিল, ইসলামে সাধারণভাবে পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ প্রভাব স্বীকৃত হয় নাই, তারপর ইস্‌লামে মূর্তিপূজা অন্যায় বিবেচিত হওয়ায়, এই ভ্রান্তধর্মের পৌরোহিত্যের উপর মুসলমান নরপতিগণ সদয় ছিলেন না। কাজেই পরাজিত পতিত জাতির ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ভিন্নধর্মী রাজশক্তির সহিত সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করিতে বাধ্য হইয়া "যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাগিল —আর বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনে আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল, তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।" ব্রাহ্মণ্যশক্তি, অর্থাৎ রাজবিধি-প্রণয়ন-শক্তি। কিন্তু মুসলমানযুগে এই শক্তি তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া এই মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে নানারূপ নিষেধবিধি প্রণয়ন করিতে গিয়া সমাজ-শরীরকে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধিয়া দিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামিজী তাঁহার একখানি চিঠিতে বলিতেছেন—"হে হরি, যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব কি বাঁ হাতে, ডানদিক থেকে জল নেব কি বাঁ দিক থেকে, তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে?"

এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ্য-শক্তির যে অধঃপতন হইয়াছে আর তাহার পুনরুত্থান ভারতেতিহাসে দেখা যায় না। স্বামিজী বলিতেছেন—"এই প্রকারে কুমারিল্ল হইতে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদি বাহু, জৈন-বৌদ্ধ রুধিরাক্ত কলেবর পুনরভ্যুত্থানেচ্ছু ভারতে পৌরোহিত্য শক্তি মুসলমানাধিকার যুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল। যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজায় রাজায়। এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল তখনও তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্যশক্তির বিশেষ কার্য ছিল না। এমন কি শিখেরা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণ চিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানকে স্ব-সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে।"

বিবেকানন্দের এইরূপ ইতিহাস বিশ্লেষণে ব্রাহ্মণ জাতির উপর কটাক্ষ আছে

বলিয়া এক সময়ে ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া আমাদের "সত্যানুরাগ" ও "স্পষ্টবাদিতার" উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস স্বামিজী ব্রাহ্মণজাতির উপর বিদ্বেষবশতঃ নিশ্চয়ই কোনরূপ কটাক্ষ করেন নাই। ইতিহাস বিশ্লেষণে ও বিশেষতঃ ভারতেতিহাসরূপ সমুদ্রমন্থনে যদি কখনো কখনো অমৃতের সহিত গরলও উঠিয়া থাকে, তবে ব্রাহ্মণ-দিগকে কেবল অমৃত দিয়া তাহাদের স্বকর্মোপার্জিত গরলের ভাগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই। ইহাতে বিবেকানন্দের প্রবল সত্যানুরাগ ও নির্ভীক স্পষ্ট-বাদিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। তদতিরিক্ত আর যাহা তাহা দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনা, অসূয়া ও ঈর্ষার বিজৃম্ভনা। সে-সব বৃত্তান্ত না তুলাই ভাল। তারপরেই বৃটিশ-যুগ। এই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েই অনেকাংশে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রোমকেরা যেরূপ গ্রীকজাতিকে হেয় করিয়াছিল এ-যুগে ইংরেজরাও তদ্রূপ ভারতবাসীকে হেয় করিয়াছে, একথাও রামমোহন ও বিবেকানন্দের মুখে আমরা শুনিয়াছি। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত হইবেন এমন আশা করা যায় না।

এ-যুগে ইংরেজ রাজশক্তি। এই রাজশক্তি আবার বৈশ্যভাবাপন্ন। এ-যুগ বৈশ্য-যুগ। ইংরেজের বৈশ্যভাবাপন্ন রাজশক্তির সম্মুখে হিন্দু ও মুসলমান তুল্য ভাবে ব্যবহার পাইয়াছেন। হিন্দুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ বা সম্প্রদায়গুলি, এই রাজশক্তির অধীনে কর্ম স্বীকার করিয়াছেন। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল বর্ণই এ-যুগে সমান দাসত্বোপজীবী। আবার বাঙলাতে স্মার্ত রঘুনন্দনে এক ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অপর দুই বর্ণের নির্দেশই নাই। অথচ কি রামমোহন, কি বিবেকানন্দ ইঁহারা উভয়েই এ-যুগে বৈশ্য ও শূদ্রশক্তির উদ্বোধনে ও সেই শক্তিকে সমগ্র জাতির অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োগে নানারূপ গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।" ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রের লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ-যুগে আবার একবার বৈশ্য ও শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থানে আর এক নূতন তরঙ্গ উঠিবে। তাহার সম্বন্ধে স্বামিজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন—

"এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"

"তোমরা উচ্চ বর্ণেরা কি বেঁচে আছ? * * এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, মরু-মরীচিকা, তোমরা ভারতের উচ্চ বর্ণেরা। * * তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি, মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির

দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝাড়-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। * * অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। * * তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো, তোমার চাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূত-স্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে"!"

বাঙ্গলার আচারভ্রষ্ট অথচ উন্নতির বিরোধী, রক্ষণশীল অথচ শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণ্যশক্তি কি ভবিষ্যতের এই মহা তরঙ্গের গতিকে রোধ করিতে সমর্থ হইবে? ভবিষ্যৎই তাহার উত্তর দিবে। আশা করি রামমোহন ও বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক গবেষণায় আমাদের বর্তমান অনেক জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসাকল্পে আমরা বিশেষরূপে সহায়তা লাভ করিব। হিন্দুসমাজের বর্তমান জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারগুলি জাতীয় একতা সাধনের ও রাষ্ট্রীয় উচ্চাধিকার লাভের পরিপন্থী কিনা তাহাও বুঝিতে পারিব।

সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য

সঙ্গীত সম্পর্কে গত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুঁথি হইয়া পড়িবে। তাহা আমার বর্তমানে উদ্দেশ্য নয়। তবে যে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা সংক্ষেপে আমাদের জানিয়া রাখা ভাল।

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মসভার উপাসনা-সময়ে ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। তাহাতে মাদ্রাজ হইতে আপত্তি হয়। এই আপত্তি হয় যে, ব্রহ্মোপাসনায় সঙ্গীত অশাস্ত্রীয়। কিন্তু রামমোহন ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি উদ্ধার করিয়া উপাসনার সময় সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া দেন। রামমোহন নিজে অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত যাহা রামমোহনের নামে প্রচলিত তাহা রামমোহন রচনা করেন নাই, তাঁহার বন্ধুরা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস যিনি লিখিয়াছেন, সেই রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীতকে খুব উচ্চস্থান দিয়া বলিয়াছেন—"তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্ম-সঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র,

পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীসমন্বিত। অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্বক উহা গাহিয়া থাকেন।

রামমোহনের ব্রহ্ম-সংগীতের কথা বলিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বলিয়াছেন—"রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উত্থিত হইয়া নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল।" রামমোহনের গানে বিষয়-বৈরাগ্য আছে, "শেষের সেদিন ভয়ংকর", স্মরণ করিয়া কেহ কেহ ভীতও হইতে পারেন। ব্রহ্ম নিরাকার, মূর্তি-পূজা ভুল, দ্বৈতভাব বর্জন কর, ইত্যাকার অনেক শাস্ত্র ও যুক্তির উপদেশ এই সমস্ত ব্রহ্ম-সংগীতে আমরা পাই। কিন্তু রামপ্রসাদ ও রামমোহনের গান যে এক পংক্তিতে চলিতে পারে, দুঃখের বিষয় আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রসাদী সংগীত ও রামমোহনী সংগীতে একটা যুগের ব্যবধান। কাব্যের রূপান্তরে ইহাদের পৃথক্ স্থান। আর বলাই বাহুল্য, রামপ্রসাদ ও রামমোহনের ধর্মমত বিরোধী না হইয়াও সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

ব্রাহ্ম-যুগের সমস্ত ব্রহ্ম-সংগীতের আলোচনা করা আমার পক্ষে এই সংকীর্ণ অবসরে সম্ভব হইবে না। বাঙ্গলা-সাহিত্যে ব্রহ্ম-সংগীতের অবশ্যই একটা স্থান আছে। কিন্তু যাহাকে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক আজকাল 'বাঙ্গলার প্রাণ' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, চণ্ডীদাসে ও রামপ্রসাদে যাহা কাব্যের রূপান্তরে শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ব্রাহ্ম-যুগের ব্রহ্ম-সংগীতে তাহার একটা মর্মান্তিক অভাবই লক্ষিত হয় বলিয়া তাঁহারা আশংকা করেন। ব্রহ্ম-সংগীতগুলি উদ্দেশ্য-মূলক হওয়াতে নাকি কল্পনার রূপান্তরে ইহার স্থান উচ্চে হইতে পারে নাই, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপ অভিমত। ইহা ছাড়া সংস্কার-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক রাজনারায়ণবাবু যাহার জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন সেই ইংরেজী ভাব ও ছন্দের, ইংরেজী সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণে ঐ সকল ব্রহ্ম-সংগীত, বাঙ্গালীর জাতীয় সংগীত হইতে পারে নাই। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের গান যেরূপ বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া গিয়াছে, বাঙ্গলার ধূলিমাখা আঙ্গিনাকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, ব্রহ্ম-সংগীত তাহা পারে নাই। ইহার কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনটাই আভিজাত্যের সংস্কার। বাঙ্গলার অশিক্ষিত নিম্নস্তরে ইহা এক শতাব্দীর মধ্যেও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। এই জন্যই একশ্রেণীর সমালোচক ইহাকে "নব নাগরিক সাহিত্য" বলিয়া বাঙ্গ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমি স্বীকার করিতেছি, এই সমালোচকদের মধ্যে একজন অর্থনীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমার বন্ধুব্যক্তিও আছেন।*

* অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি।

যাহা হউক স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজের একজন সুগায়ক ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার গান শুনিয়া সমাধিলাভ করিতেন। বাস্তবিক বিবেকানন্দের গানের খ্যাতি অল্প নহে। তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মুক্ত সদাশিব ভাব বিরাজ করিত, যাহাকে তাঁহার বন্ধু ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একটা শিল্পরসবোধসম্পন্ন সদাশিব মুক্ত ভাব* বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যখন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়া তিনি সংশয়বাদে সমাচ্ছন্ন, তখন কেবল এক সংগীতই তাঁহার নিকট অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা বহন করিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণভাবে আর্ট বা কল্পকলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে সংগীত সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে গান সহজ ও সরল হওয়া উচিত, গানের ভাব সুরের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক রকমে প্রকাশিত হইলেই ভাল। আমাদের গানের মধ্যে মুসলমানী প্রভাব বিশেষতঃ রাগ-রাগিণীর টানকে তিনি সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকা-বাঁকা ডামাডোল্, ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ্! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে-ভাষা, সে-শিল্প, সে-সংগীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সংগীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।"

স্বামিজী বলেন, ভারতে সংগীতবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বহু বহু শতাব্দী পূর্বে সপ্তস্বর, অর্ধ ও সিকি মাত্রার স্বর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এইত গেল সংগীত সম্বন্ধে। শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজী কি বলিয়াছেন, তাহাও দেখা উচিত। তিনি বলিতেছেন, আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির সময়েই শিল্পেরও অবনতি হইয়াছে।

"বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভংগী। থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রের কি ধুম।"

শিল্প-প্রসংগে তিনি গ্রীকশিল্পের সহিত হিন্দুশিল্পের তুলনা করিয়া এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন যে, গ্রীকশিল্পী গিয়াছেন স্বভাবকে, বাস্তবকে অনুসরণ করিতে আর হিন্দুশিল্পী গিয়াছেন বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া একটা আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে। অবশ্য কল্পকলা যে-ক্ষেত্রেই আদর্শ ফুটাইতে গিয়া বাস্তবকে বর্জন করে সেইখানেই কল্পকলা অবনতি প্রাপ্ত হয়।

---

*"artist nature and Bohemain temperament."

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও স্বামিজীর অন্তর্দৃষ্টি খুব গভীর। বর্তমান যুগে চিত্রশিল্পে ইউরোপের অনুকরণ যে ব্যর্থ ও লজ্জাকর, ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং চিত্রশিল্পে দেশের প্রাণ কোথায় ফুটিয়াছিল এবং কোথা হইতে তাহাকে পুনরায় অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে তাহাও সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। যেমন—

"ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশী চাল-চিত্রকরা পোটো ভাল। তাদের কাছে তবু ঝক্‌ঝকে রঙ আছে। ও সব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরে সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"

স্বামিজী বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণে এই শিল্পরসবোধ সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং পরমহংসদেব বলিতেন, যাহার শিল্পরস-বোধ নাই সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দও রাজা রামমোহনের মত কয়েকটি সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দের ব্রহ্ম-সংগীতের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, ইঁহাদের উভয়ের রচিত সংগীতগুলিই অদ্বৈত-বেদান্তানুযায়ী সাধনার পক্ষে বিশেষরূপে সাহায্য করে। যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, এই সমস্ত মোহমুদ্গর জাতীয় বৈদান্তিক সংগীতগুলি, শুনিয়াছি, উপাসনার সময় তাঁহাদের আত্মাকে সম্যক্ তৃপ্তি দিতে পারে না।

রাজা রামমোহন গাহিয়াছেন—

॥ ১ ॥

ইমন কল্যাণ—তেওটা।

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

॥ ২ ॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে?
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধভাবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য, এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

তারপর "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর। অন্যে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর" হইতে আরম্ভ করিয়া "সকলি অনিত্য হয়, দারা সুত ধন জন", "মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন, রজ্জুতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন", "ক্ষণমাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদনা", "নবদ্বার দেহ পরে", "অজপা হতেছে শেষ", সর্বশেষে "জীব-ব্রহ্ম একজ্ঞানে থাক যোগ-পরায়ণ।"

স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছেন—

॥ ১ ॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতিনেতি' বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণ ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বক্ষণ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে, অযুত অনন্ত তরংগ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি-স্থিতি—কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোররোলে ছাইল গগন, করি দশদিক্ জ্যোতিঃমগন॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ॥

॥ ২ ॥

বাগেশ্রী—আড়া।

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাংক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্মনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার॥

তারপর—স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-সাধনায় কোন কোন স্তরে "রূপের প্রসঙ্গ"ও আছে যাহা রামমোহনে নাই। তাই স্বামিজী অদ্বৈত-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে—

॥ ৩ ॥

কর্ণাটি—একতালা।

তাথেইয়া, তাথেইয়া নাচে ভোলা, বোম্, বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল।

গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।

আবার—

॥ ৪ ॥

মুলতান—ঢিমা ত্রিতালী।

মাঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া, যানেকো দে।
যমুনাকি নীরে, ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে কহত সৈঁইয়া, যানেকো দে॥

এবং সেই সঙ্গে

॥ ৫ ॥

খণ্ডন ভববন্ধন, জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময়॥
বঞ্চন কাম কাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও স্বামিজীর অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী বলিয়াছেন—

“ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।

“বাঙ্গলাভাষাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে ইহাকে শুষ্ক ও নীরস করিয়া ফেলা হইবে। বস্তুতঃ বাঙ্গলা ভাষায় ক্রিয়াপদ একরূপ নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যে এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গলার সর্বাপেক্ষা বড় কবি শ্রীকবিকঙ্কণ।

“বাঙ্গলাভাষাকে সংস্কৃতের আদর্শে না গড়িয়া বরং পালির আদর্শে গঠন করিলে ভাল হয়। কেননা পালির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। কোন বিশেষ বিশেষ শব্দকে বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, সংস্কৃতের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। নূতন শব্দ সৃষ্টি করাও আবশ্যক। যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে এজন্য শব্দ সংগ্রহ করা যায় তবে তদ্দ্বারা বাঙ্গলাভাষার বিশেষ পুষ্টিলাভ হইতে পারে।”

স্বামিজী চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন—

“বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। * * চলিতভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?

যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর, সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? ** বাঙলাদেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা;—কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা।"

কল্‌কেতার ভাষাকেই পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ সমস্ত বঙ্গের লিখিত ও চল্‌তি ভাষা করিবার জন্য স্বামিজী নির্দেশ করিতেছেন। তাঁহার মতে "কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশী নিকট, সেকথা হচ্ছে না, কোন্ ভাষা জিত্‌ছে সেইটি দেখ।"

যদি কলিকাতার ভাষাই জিতিয়া যায় তবে ত কথাই নাই। আর যদি স্বামিজী-নির্দিষ্ট কোন প্রাকৃতিক নিয়মেই কলিকাতার ভাষা, প্রাদেশিক সমস্ত ভাষাকে সমস্ত দিকে পর্যুদস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ না করিতে পারে, তাহা হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মই এক্ষেত্রে বলবান হইবে এবং এ বিষয়ে অধিক বিতণ্ডা, যাহা রামগতি ন্যায়রত্ন হইতে এতাবৎ হইয়া গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত আর কিই বা বলিবার আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

এইবার আমরা ঊনবিংশ এবং এমন কি বিংশ শতাব্দীরও একটি অতি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ যুগে সম্মিলন প্রশ্ন। এই প্রশ্ন দ্বারাই বিগত শতাব্দীর বাঙলার সমস্ত ইতিহাস-বরেণ্য মহাপুরুষেরা বিব্রত হইয়াছেন। সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এই প্রশ্নের কোন পরিষ্কার মীমাংসা আমাদের মধ্যে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। শুধু চিন্তায় নয়, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেও আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ একাধিপত্য লাভ করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষকে প্রায় ১৬০ বৎসর ধরিয়া শাসন করিয়াছে। স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যের নানাবিধ ভাবরাশি আমাদের মধ্যে আসিয়া নিক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা একই মানব-সভ্যতার বিভিন্ন বিচিত্র অঙ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। জীব-শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মানবসভ্যতারও তেমনি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শরীরের এক অঙ্গ যেমন অন্য অঙ্গের অনুরূপ না হইয়াও এক জীব-শরীরেই সংযুক্ত, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিকল অনুরূপ না হইয়াও আমরা এক বিরাট মানব-সভ্যতারই বিভিন্ন বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই সহজ কথাটি গত শতাব্দীতে অনেকে বুঝিতে না পারিয়া, কেহ

বা সমস্ত বিষয়ে পাশ্চাত্যের একটা ব্যর্থ প্রতিধ্বনি হইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন, আবার কেহ কেহবা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যতা যে মূলে একই মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত, এই কথা ভুলিয়া গিয়া সর্বাংশে পাশ্চাত্য হইতে দূরে সরিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় দলই একদেশদর্শী। এই উভয় দলই ভ্রান্ত। শতাব্দীর প্রথমে রামমোহন, শেষভাগে বিবেকানন্দ,—এই উভয়ে একদেশদর্শী চরমপন্থীদের ভ্রমাত্মক মার্গ পরিহার করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও আমাদের সভ্যতার মত একই মানব-সভ্যতার অঙ্গীভূত মনে করিয়া তাহাকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিতে বলিয়াছেন। কেননা সভ্যজাতির প্রতি সভ্যজাতির অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভবে না। তবে যেখানে এরূপ ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করা যায় না।

তাহা হইলে রামমোহন ও বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তে স্থির হইল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমাদিগের মধ্যে সাদরে আহ্বান করিতে হইবে। বর্বরোচিত অবজ্ঞায় তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিব না। কেননা আমরা ত আর বর্বর নহি। আমরা সভ্যতার বহু স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আমাদের নিজের একটা অতি-বড় গৌরবশালী প্রাচীন সভ্যতা আছে। কাজেই এ যুগের কোন সভ্যজাতির প্রতি অসভ্য ব্যবহার আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আর অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার বহুক্ষেত্রে আরো অনেক সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সুতরাং আমাদের এ অবস্থা একেবারে নূতন নয়।

তথাপি সমাজের সকল অংশের বা সকল স্তরের লোক কিছু সমান সভ্য বা অগ্রসর নহে। আমাদের নিজের সভ্যতা, নিজের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যাহাদের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাঁহাদের কয়েকজন বিগত শতাব্দীতে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া কিয়ৎকালের জন্য যে একটা উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সুখের বিষয় আমাদের জাতির ইতিহাসে তাহা স্থায়ী হয় নাই। আরও সুখের বিষয় যে, কি রামমোহন, কি বিবেকানন্দ কেহই আমাদিগকে এইরূপ স্বধর্ম-ত্যাগী বর্বর হইতে পরামর্শ দেন নাই। তাঁহারা উভয়েই পাশ্চাত্যকে প্রকৃত সুসভ্য হিন্দুর মত বরণ করিয়াছেন, ধারণ করিয়াছেন কিন্তু পাশ্চাত্যের মধ্যে আত্মবিসর্জন বা আত্মহত্যা করেন নাই। এবং উভয়েই গ্রহণের সঙ্গে পাশ্চাত্যকে কিছু দান করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন সম্বন্ধে কুমারী কলেট এ বিষয়ে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমি তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কুমারী কলেট বলিতেছেন—

"ইতিহাসে রামমোহন এমন একটি জীবন্ত সেতুস্বরূপ, যাহার উপর দিয়া ভারতবর্ষ সুদূর অতীত হইতে অতিদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অগ্রসর হইবে। তিনি ছিলেন যেন একটি খিলান, যাহা প্রাচীন জাতিভেদ ও বর্তমান মানব-প্রীতি,

কুসংস্কার ও বিজ্ঞান, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র, স্থবিরগতি আচারবাদ ও রক্ষণশীল উন্নতিশীলতা, এবং বিভ্রমকারী বহু দেবার্চনা ও অস্পষ্ট হইলেও পবিত্র একেশ্বরবাদের যে পার্থক্য তাহার সমন্বয় করিয়া গিয়াছে।"*

ইহা গেল আমাদের দেশ সম্বন্ধে রাজার এ যুগের কার্যের একটা সংক্ষিপ্ত—অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে এই বিদুষী ইংরেজ মহিলা কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন—

"রাজা পাশ্চাত্যগ্রস্ত প্রাচ্য ছিলেন না, অথবা, অপরিণত ইউরোপীয় সাদৃশ্য-যুক্ত হিন্দুও ছিলেন না। যদি তাঁহার পরিণতির প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি প্রাচীন প্রাচ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতায় উপনীত হন নাই, অপিচ, পাশ্চাত্য প্রভাবের ভিতর দিয়া এমন এক সভ্যতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাহা প্রাচ্যও নহে, প্রতীচ্যও নহে,—যাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় সভ্যতা অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর। * * আমরা এক্ষণে পূর্ব ও পশ্চিমের অভূতপূর্ব মিশ্রণের প্রথম অবস্থায় উপস্থিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মানবসমাজের উন্নতির যে দুইটি স্রোত পূর্বে পরস্পরকে রঞ্জিত করিয়াছিল মাত্র, তাহা এক্ষণে এমন এক মিলনস্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, যাহা সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত উন্নতি-সমুদ্র সম্ভাব্য করিয়া তুলিবে। প্রাচ্যের ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় বহুবিধ বিভাগের গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখে, বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহ—এমন কি তাহাদের গুরুতরগুলিও—খর্বীকৃত হইয়া ক্ষুদ্রতায় পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত অপরিমেয় সম্ভাবনার অদূরবর্তী ঊষালোকে যাঁহার জীবন-কথা আমরা বর্ণনা করিয়াছি তাঁহারই মূর্তি প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে যদি ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া গ্রহণ করাও না হয়, তথাপি যে তিনি ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের অগ্রদূত স্বরূপ তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।"†

---

*"Ram Mohan stands in history as the living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future. He was the arch which spanned the gulf between ancient caste and modern humanity, between superstition and science, between despotism and democracy, between immobile custom and a conservative progress, between a bewildering polytheism and a pure, if vague, theism."

†"The Raja was no merely occidentalised oriental, no Hindu polished into the doubtful semblance of a European, * * * If we follow the right line of his development we shall find that he leads the way from the orientalism of the past, not to, but through Western culture towards a civilization, which is neither Western nor Eastern, but something vastly larger and nobler than both. * * *. We stand on the eve of an unprecedented inter-

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে রামমোহনের স্থান কোথায়, আশা করি আপনারা তাহা এক্ষণে আরো বিশদরূপে আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

রামমোহনের পরে প্রাচ্যের সাধনা পাশ্চাত্য দেশে এবং পাশ্চাত্যের সাধনা প্রাচ্য দেশে আনিবার ভার স্বামী বিবেকানন্দই লইয়াছিলেন। সে কর্তব্য তিনি কতদূর পালন করিয়া গিয়াছেন তাহার বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তবে তাঁহার কার্যের যে ফল দেখা দিয়াছে, ভারতে ও পাশ্চাত্যে এই উভয় দেশেই তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিন পাইতেছি।

রামমোহন সম্বন্ধে মিস্ কলেট যাহা বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও সিস্টার নিবেদিতা অনেকটা তদনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

রামমোহনের পর হইতেই বাঙলায় একটা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ যুগ বহিয়া গিয়াছে। অবশ্য রামমোহনের পরে সকল মনীষী ব্যক্তিরাই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছেন, এমন কথা আমি বলি না। তবে সমাজে অন্ধ অনুকরণের একটা প্রবল মোহ বা ভাবের প্রবাহ চলিয়াছিল ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বিবেকানন্দকে এই যুগের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। তাঁহার নিজের জাতি সম্বন্ধে কাজেই একটা স্বাজাত্যাভিমান সময় সময় অত্যন্ত প্রখর ও উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে গেলে ইহা হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃতিতে অতিবিনয় নামক পদার্থটির একান্ত অভাব ছিল। অশোকের পরে এ-যুগে হিন্দুধর্মকে ভারতের বাহিরে প্রচার করিবার একটা দায়িত্ব বিবেকানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটা কতবড় কল্পনা, কতবড় বিশ্বপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান কার্য করিয়াছে তাহার পরিমাণ হয় না। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার অপূর্ব ভাষায় 'দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্' গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বামিজী ভারতের বাহিরে ভারতের সভ্যতা প্রচার ব্যপদেশে যখন বহির্গত হ'ন তখন তিনি সগর্বে বলিয়াছিলেন—

---

mingling of East and West. The European and Asiatic streams of human development, which have often tinged each other before, are now approaching a confluence which bids fair to form the one ocean river of the collective progress of mankind. In the presence of that greater Eastern question, with its infinite ramifications, industrial, political, moral and religious, the international problems of the passing hour, even the gravest of them, seen dwarfed into parochial pettiness. The nearing dawn of these unmeasured possibilities only throws into clearer prominence the figure of the man whose life-story we have told. He was, if not the prophetic type, at least the precursive hint, of the change that is to come.''

"আমি এমন ধর্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াছি, বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান আর খৃষ্টানধর্ম যাহার সুদূরবর্তী প্রতিধ্বনি মাত্র।" *

কেশবচন্দ্রের পর বাঙলায় এমন একটা কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কেশবচন্দ্র তিন আইনের বিবাহবিধি পাশের সময় বলিয়াছিলেন যে, "আমি হিন্দু নহি বলিতে প্রস্তুত আছি।" অবশ্য রাজনারায়ণবাবু এজন্য তখনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি এই ধর্ম যাহার প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এক অভূতপূর্ব তরঙ্গ তুলিয়া গেলেন? সিস্টার নিবেদিতার কথায়—

"For Western as for Eastern the soul's quest was the breaking of this dream, the awakening to a more profound and powerful reality. . That all men alike had the same vast patentiality."

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কথায়--

"Vivekananda went about preaching and teaching the creed of the universal Man and the absolute and inalienable sovereignty of self."

যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনের কথা ভাবেন, যাঁহারা এই উভয় সভ্যতার পরস্পর সাহচর্যের ফলে এক অভিনব উন্নততর মানব সভ্যতার বিকাশ তাঁহাদের স্ব স্ব বিশেষ সভ্যতার মধ্যেই সম্ভব বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা যে কেবল আমাদের দেশেই কম তাহা নহে, পাশ্চাত্যেও তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরি পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই উভয় সভ্যতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এবং উভয়েরি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক আদর্শ মূলতঃ অক্ষত রাখিয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও সাহচর্য দ্বারা উভয়েই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে বিশ্বাস করিয়াছেন। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য শুধু বজায় রাখা নহে, পাশ্চাত্যকে উহা দিয়া উপকৃত করিতে হইবে। একটা বিশেষ সভ্যতার বংশধররূপে বাঁচিয়া থাকিবার ইহাই কারণ। নতুবা শুধু বাঁচিয়া থাকিবার কোন সঙ্গত কারণ কোন জাতিই দিতে পারে না। ইতিহাস অকারণে বাঁচিয়া থাকাকে বড় আমল দেয় না। সভ্যতার মাপকাঠিতে তাহার মূল্য নাই বলিলেও চলে। সংস্কার যুগে এক রামমোহন ব্যতীত পাশ্চাত্য হইতে গ্রহণের কথাই শুনা গিয়াছে; বিবেকানন্দের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এই সম্পর্কে গ্রহণের সহিত দানেরও প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিশিষ্ট রকমে দান না করিয়া গ্রহণ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। সংস্কার যুগে এক

*"I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child, and Christianity, only distant Echo."

রামমোহন ব্যতীত পাশ্চাত্যকে কেহ বিশেষ কিছু দান করেন নাই। বিশেষতঃ পরাধীন জাতির নিকট হইতে স্বাধীন জাতিরা সভ্যতার উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। পাশ্চাত্যকে যে আমরা দান করিতে পারি, একথা সংস্কার যুগ কল্পনাও করে নাই। পাশ্চাত্যকে অনুকরণের মোহ এমনি পাইয়া বসিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দই স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন ও নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমরাও পাশ্চাত্যকে অনেক জিনিষ দিতে পারি। আমাদের সভ্যতার নিকটেও পাশ্চাত্য জাতি সকল অনেক-কিছু ভাল শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এবং সামরিক-শক্তি-সম্পন্ন স্বাধীন সভ্যজাতি সকলের মধ্যে ঘরে বাহিরে এত রকম উৎপাত উপদ্রব সহ্য করিয়া পৃথিবীতে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার ইহাই কারণ, ইহাই দাবী।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্পর্কে স্বামিজী বলিতেছেন—আজ যাঁহারা "সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী" লইয়া সমুপস্থিত দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদিগকে জলদগম্ভীরস্বরে সতর্ক করিয়া স্বামিজী বলিতেছেন—

"বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।"

"মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না।"

পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিবার অছিলায় তাহার সম্মুখীন হইবার সময় ইহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলার সাবধান বাণী।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাতির উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে কিছু বলিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতি সম্পর্কে আন্দোলন

(ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে নারীজাতির উন্নতি সম্পর্কে একটা আন্দোলন হইয়াছিল। সেই আন্দোলনের এক অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। কিন্তু তৎপূর্বে অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পরিবার ও সমাজের মধ্যে নারীজাতি কিরূপ

ব্যবহার পাইতেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহাদের অধিকার ছিল এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ছিল না, পুরুষজাতি সাধারণভাবে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহার একটা আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে যদি নারী-সমাজে বা এমন কি নারী-চরিত্রে কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, কোন কোন আচার যদি পরিহার করা কর্তব্য মনে হয়, কোন কোন ব্যবহার যদি পরিবর্তন করা সংযুক্তি হয়, তবে বুঝিতে হইবে পরিহার ও পরিবর্তনযোগ্য সেই সমস্ত আচার-ব্যবহার নারী-সমাজে একদিনে দেখা দেয় নাই। ইতিহাসের পথে, সমাজের উন্নতি বা অবনতি-মুখে সেই সমস্ত আচার-ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিকাশ ও বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত বিকাশমান আচার-ব্যবহার আমাদের দেশের নারী চরিত্রকে, ভাল ও মন্দ দুই দিকেই একটা বৈশিষ্ট্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

আমি ষোড়শ শতাব্দীর কথা এইজন্য তুলিলাম যে, এই শতাব্দী হইতেই নব্য-ন্যায়, নব্য-স্মৃতি, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের নব কলেবর নব রূপান্তরে দেখা দেয়। বিশেষতঃ এই শতাব্দীর রাজনীতিক্ষেত্রে দিল্লীর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বাঙ্গলার ভূঞা-জমীদারগণের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ও বিশেষভাবে সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহার সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডী এই যুগের সাহিত্য। বস্তুতঃ, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের মধ্যে এই শতাব্দীতে পুরাতন ভিত্তির উপর একটা নূতন বাঙ্গালী-সভ্যতার পত্তন হয়। সভ্যতার এই পুনর্গঠনকালে বিশেষতঃ—আচার-ব্যবহার-সংক্রান্ত স্মৃতি-শাস্ত্রের দিক্ হইতে নারীজাতি সম্পর্কেও একটা পরিবর্তন ও সংস্কার স্বভাবতঃই হইয়াছিল। সুতরাং সর্বপ্রথম রঘুনন্দনের স্মৃতির দিক্ হইতেই আমরা পরিবার ও সমাজের মধ্যে এবং বিবিধ ধর্ম কর্ম সংক্রান্ত আচারে ও সম্পত্তির উপর অধিকারে এই শতাব্দীর নারী-জাতি কিরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠ তাহাই লক্ষ্য করিব।

রঘুনন্দন, সাধারণতঃ স্মার্তভট্টাচার্য—এই নামে খ্যাত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। ত্রয়োদশ হইতে তিন শতাব্দী বাঙ্গালী-হিন্দু, পাঠান-মুসলমানের অধীনে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল। প্রতিবাসী বৌদ্ধগণও তখন লুপ্ত বা এমন কি হীনবল হয় নাই। বৌদ্ধ ও মুসলমানের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজে ধর্মে কর্মে ও আচার-ব্যবহারে যে পরিবর্তন আসিয়া দেখা দিল, সেই শিথিলতা দূর করিয়াও পরিবর্তনমুখে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য রঘুনন্দন বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামে এক সুবৃহৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্মৃতির মীমাংসা গ্রন্থ উপঢৌকন দিয়া যান। ব্যবহারের দিকে অর্থাৎ দায়ভাগ সম্পর্কে নারীজাতির অধিকার নির্ণয়ে রঘুনন্দন তাঁহার পূর্বগামী জীমূতবাহন অপেক্ষা কোন মতেই উদারতা দেখান নাই। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা অপেক্ষা

জীমূতবাহনের দায়ভাগ—পরিবার মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির অধিকার নির্ণয়ে ও ভাগ-বণ্টন-সম্পর্কে পুরুষের ব্যক্তিত্বকে অধিকতর প্রসারতা দিয়াছে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে একান্নবর্তী পরিবারের নিষ্পেষণ হইতে অনেক রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু কি জীমূতবাহন কিংবা রঘুনন্দন পুরুষের ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও পরিপুষ্টির জন্য বিষয় অধিকারে যে স্বাধীনতাকে বাঙ্গালী-সমাজে আহ্বান করিলেন, নারীজাতির ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার জন্য তাহা করিলেন না। কিন্তু এই সম্পর্কে আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, জীমূতবাহন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগের এবং রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। ঐ সুদূরবর্তীকালে কেবল বাঙ্গালী কেন, মধ্য-যুগের সমকালীন ও তাহার কিঞ্চিৎ পরে, পৃথিবীর কোন সুসভ্য জাতিই ব্যবহার শাস্ত্রে নারীর অধিকারকে বিশেষ উচ্চ স্থান দেয় নাই। অবশ্য প্রাচীন যুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিতে নারীজাতির বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকার ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সুতরাং আপনারা দেখিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্তভট্টাচার্য বিষয় অধিকারে নারীজাতিকে কোন নূতন অধিকার দিলেন না। এমন কি, স্মৃতি-শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক বলিয়া ইতিহাসে এত বড় পরিচয় যাঁহার, তিনি মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণ করিয়াও নারীজাতির অধিকার কিঞ্চিন্মাত্রও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। নারীজাতির একটা পৃথক্ অস্তিত্ব, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রথমে যে পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির উপর তাঁহাদের একটা ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ইহা বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি স্বীকার করিলেন না। সম্ভবতঃ এমন একটা ধারণা তখন ছিল বা এখনও যে একেবারে নাই তাহা নহে যে, সকল অবস্থাতেই নারীজাতি পুরুষের অধীন হইয়া বাস করিলেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। পুরুষ-নিরপেক্ষ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব তখন কল্পনায় আসিত না। এইরূপ একটা ধারণা বা কারণ ব্যতিরেকে চতুর্দশ বা ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতি অমান্য করিয়া নারীজাতির বিষয়-সম্পত্তির উপর অধিকারকে এত অধিক খর্ব করিতে পারিত না।

রঘুনন্দনের স্মৃতির তিনটি ভাগ—আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত। ব্যবহার-ভাগে নারীজাতির কি স্থান তাহা দেখিলেন। এখন আচার বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, রঘুনন্দনীয় স্নান, দান, ব্রত, উপবাস, দেব-প্রতিষ্ঠা, দীক্ষা, আহ্নিক, মঠ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে'র কোন এক তত্ত্বই বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে এত সহজে প্রচারিত হইয়া এবং এত দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত না যদি নারীজাতি ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ ও বহন না করিতেন। ইহা নারীচরিত্রের একটা বিশেষত্ব। বিশেষতঃ নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন আচারকে রঘুনন্দন পরিবর্তন করিতে যাইয়া আরো অধিক কঠোর করিয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত আচার ধর্মের সহিত বিধিবন্ধ হওয়ায় এবং নারীজাতির

স্বভাবে রক্ষণশীলতা-মূলক অন্ধ ধর্মভাব প্রবল থাকায় ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে বাঙালী হিন্দুনারীগণ এই আচারগুলিকে যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছেন। আচার পুরুষদের অপেক্ষা নারীগণই অধিক পালন করেন। তবে আচার পালনে নারী-ভাবাপন্ন পুরুষ যে না আছে তাহা নয়। আর আচার লঙ্ঘনে পুরুষভাবাপন্ন নারীও যে না আছে, তাহাও নয়। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে হইলে স্বভাবতঃ পুরুষ অনাচারী আর নারী আচারী। গতিশীল সমাজের পরিবর্তন মুখে যখন নারীগণও পুরুষের মত অনাচারী হইতে আরম্ভ করেন তখন সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লবের স্বাভাবিক কারণ আছে, আবার ভাল মন্দ দুইটা দিক্‌ও আছে।

এখন দেখিতে হইবে রঘুনন্দন কোন্ কোন্ আচারকে কঠোর করিলেন আর কোন্ কোন্ আচারকে শিথিল করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তখন নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে সিদ্ধ চাউল, মৎস্য ও মশুর ডাইল খাইত দেখিয়া রঘুনন্দন ইহার ব্যবস্থা দিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি অনিবার্য যুগ-প্রয়োজনে আচারকে শিথিল করিলেন। আবার প্রাচীন মতে, যতক্ষণ একাদশীর তিথি থাকিত ততক্ষণ উপবাস করিলেই একাদশী পালন করা হইত। রঘুনন্দন এই প্রথা রহিত করিয়া বিধি দিলেন যে, একটা গোটা দিন ও রাত্রি উপবাস করিতে হইবে। প্রাচীনমতে নিয়ম ছিল, বিধবাগণ অল্পবয়স্কা, অসুস্থা বা রুগ্না হইলে এবং একাদশীর উপবাসে অসমর্থ হইলে অনুকল্প করিতে পারিতেন। রঘুনন্দন বিধবার পক্ষে কোন অবস্থাতেই অনুকল্পের বিধি দিলেন না। এইখানে তিনি আচারকে কঠোর হইতে কঠোরতর করিলেন।

যেমন বিষয়-সম্পত্তির অধিকারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিকার প্রাচীন স্মৃতি হইতে রঘুনন্দনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তেমনি আচার সম্পর্কেও পুরুষের পক্ষে কোন কোন আচার শিথিল হইয়া, নারীজাতি সম্পর্কে কোন কোন আচার কঠোর হইয়াছে। কাশীরাম বাচস্পতি ও রাধামোহন গোস্বামী রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের দুইখানি টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত টীকাকারগণও আমাদিগকে সুস্পষ্ট বুঝাইতে পারেন নাই যে, ষোড়শ শতাব্দীর কোন্ বিশেষ যুগপ্রয়োজনে বাঙলার হিন্দুনারীগণের অধিকার, কি দায়ভাগে বা কি আচার ও প্রায়শ্চিত্তে অর্থাৎ পরিবার ও সমাজে, এতদূর পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। এই ব্যবস্থা ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়া আসিয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বা স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল হইতে পারে নাই। আমি এই সম্পর্কে পূর্বে যাহা বলিয়াছি আবারও তাহাই বলিতেছি যে পুরুষনিরপেক্ষ রমণীর কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতার কথা জাতীয় চিন্তায় তখন স্থান পায় নাই।

এই ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতির ব্যবস্থার উপরেই বাঙালী হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি। এবং এই ব্যবস্থাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত

চলিয়া আসিয়াছে। নারীজাতির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়া অনুসরণ করিতে হইলে এই স্মৃতির ব্যবস্থাই অবলম্বন। এই মধ্যযুগের স্মৃতির মধ্যে নারীজাতি সম্পর্কে বাল্যবিবাহ আছে, সহমরণ আছে, বিধবার পুনরায় বিবাহ নিষিদ্ধ আছে অবরোধ-প্রথা আছে, স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ অভাব আছে, পুরুষের বহু বিবাহও আছে আর অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নারীজাতি সম্পর্কে সংস্কারের জন্য যে-সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যে-সমস্ত আচার জাতীয় উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সমস্ত গুলিরই মূল ষোড়শ শতাব্দীর স্মৃতিতে ও সামাজিক জীবনে পাওয়া যায়। ক্রমে এই সমস্ত আচার পরিবর্তন মুখে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নারীজাতির অধিকারকে এতদূর ক্ষুন্ন করে যে, পুনরায় রাজা রামমোহন নারীজাতির অবস্থার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নারীজাতির অবস্থার উন্নতিকল্পে, তিনি পারমার্থিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

এতক্ষণ স্মৃতির কথাই হইল। স্মৃতি কেবল গার্হস্থ্য অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকেই নিয়মিত করে। কিন্তু গার্হস্থ্যের বাহিরেও ষোড়শ শতাব্দীতে, নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম কেবল গৃহীর জন্য ছিল না। গৃহত্যাগী স্মৃতির সম্যক্ শাসনের বাহিরের নরনারীর জন্যও শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম ছিল। বাঙ্গলার লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম এই কাল হইতেই বিশেষ করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের আবরণে সর্বশ্রেণীর নরনারীকে অবলম্বন করিয়া গা ঢাকা দিতে আরম্ভ করিল। বীরাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ে একশ্রেণীর নারী ভৈরবীরূপে আবির্ভূত হইল। বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের মধ্যেও একশ্রেণীর নারী পরকীয়া সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া দেখা দিল। গৃহস্থের নিকট এই সমস্ত রমণীগণ অশ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন না। বরং ধর্মের আবরণে তাঁহারা বিশেষরূপেই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম তাহার মৃতচিতা-ভস্ম এই সমস্ত সাধকদের মধ্যে ভাল মন্দ একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উপঢৌকন দিয়া অন্তর্হিত হইল। কালক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের, যথাক্রমে বীরাচারী ও সহজিয়া সাধকগণ নরনারী সম্পর্কে, নারীজাতিকে গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে ধর্মের ও একপ্রকার স্বাধীনতার আবরণে লালসাবদ্ধ মূঢ়তায় ও জড়তায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

স্মৃতির কঠোর বন্ধনের ও গৃহস্থাশ্রমের বাহিরে শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে নারীগণ যে একটা অবাধমুক্ত স্বাধীনতা পাইত তাহাই তাহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করিত। শাক্তের "মাতৃভাব" ও বৈষ্ণবের "কান্তভাব" আধ্যাত্মিক দিক্ হইতে বড় জিনিষ হইলেও ইহা অবনতির মুখে নারীর স্বাধীনতাকে অজ্ঞানতায়

ও স্বেচ্ছাচারিতায় পঙ্কিল করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে নারীজাতি সম্পর্কে ইহারও সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুধু দায়ভাগে নয়, এক্ষেত্রেও রাজা রামমোহন সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী ১৮০০—১৮২৫ খৃষ্টাব্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর চারি ভাগের প্রথম ভাগেই যে সংস্কার স্রোত দেখা দেয়, সেই স্রোতাবর্তের চারিটি ধারার কথা আমি প্রথম পরিচ্ছেদেই বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছি। এই চারিটি ধারা যথাক্রমে, (১) শ্রীরামপুরের পাদরীদের খৃষ্টানী সংস্কার ধারা, (২) হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট ডিরোজীও ধারা, (৩) রাজা রামমোহনী ধারা এবং (৪) স্যার রাধাকান্ত দেবের রক্ষণশীল ধারা। এই চারিটি ধারাকে ভিত্তি করিয়া এই অত্যল্পকাল মধ্যে বাঙ্গলা-দেশে নারীজাতির উন্নতির জন্য কিরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহাই অগ্রে দেখিতে হইবে।

আপনারা জানেন, আমাদের বিধবাগণ মাত্র একশত বৎসর পূর্বে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন। এই সহমরণ প্রথা, লর্ড বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে রাজবিধি দ্বারা রহিত করা হয়। কিন্তু এই সতীদাহ নিবারণকল্পে যে আন্দোলন হয় তাহা এই প্রথা রহিত হইবার পূর্বে প্রায় পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। একদিনে বা বিনা আপত্তিতে এই প্রথা রহিত হয় নাই। নারীজাতি সম্পর্কে সমগ্র শতাব্দীতে এই সতীদাহ নিবারণই সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। এই সংস্কারের সঙ্গে রাজা রামমোহনের নাম চিরকাল ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিখিয়া রাখিবে। এই প্রথা রহিত হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজ রামমোহনের প্রতি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, রাজা তাহাদের দ্বারা গুপ্তভাবে হত হইবার পর্যন্ত আশঙ্কা করিতেন এবং রাস্তায় ভ্রমণকালে পোষাকের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লুক্কায়িত রাখিতেন। একথা স্মরণ করিয়া শতাব্দী পর বাঙ্গলার নারীজাতির এই নির্ভীক ও পরম বান্ধবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ও সম্ভ্রমে চক্ষু বাষ্পার্দ্র না হইয়া পারে না।

রাজা রামমোহন রায় রংপুর হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আসিবার পূর্বে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদেশ মত বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড্‌ সাহেবকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সতীদাহ প্রথা হিন্দু-ধর্মানুমোদিত কিনা? এবং যদি না হয়, তবে ইহা রহিত করা যায় কিনা? আর যদি হয়, তথাপি সহমরণের সময় স্ত্রীলোকদিগকে যাহাতে নেশা করান না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর একখানি পত্র ঐ বৎসরেই নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মাকে দেওয়া হয়। তাহাতে গভর্ণমেণ্ট

জিজ্ঞাসা করেন যে, সহমরণ-প্রথা শাস্ত্রসম্মত কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? উক্ত শর্মা উত্তরে জানান যে, শিশুসন্তানবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী, অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবাগণ সহমৃতার যোগ্যা নহেন। এই সকল প্রতিবন্ধক না থাকিলে সহমৃতা হইতে নিষেধ নাই। ঔষধ বা মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচারবিরুদ্ধ। অঙ্গিরা, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ ইহার প্রবর্তক।

ইহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সতীদাহ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন,

প্রথম, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদিগকে যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়েরা সহমৃতা হইবার প্রবৃত্তি দিতে বা উক্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়, কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না।

তৃতীয়, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সহমরণে উদ্যতা রমণীর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে।

চতুর্থ, সহমরণে উদ্যতা রমণী গর্ভবতী কিনা জানিতে হইবে।

পঞ্চম, উপরি-উক্ত কারণ থাকিলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সতীদাহ অসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে।

হেষ্টিংসের সময় সতীদাহের একটা তালিকা সংগৃহীত হয়। পার্লামেণ্টে ঐ তালিকা প্রচারিত হয়! সেখানেও একটা আন্দোলন হইয়া পরিণামে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রথা রহিত হইবার পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ সম্পর্কে আর একটা পুলিশ-রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। তাহাতে দেখা যায় কেবল বাঙলা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ঐ বৎসর ৫৭৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। কুড়ি বৎসরের কম হইতে ষাট বৎসরের অধিক বয়স্কা বিধবাও ইহাতে ছিল।

এ পর্যন্ত আমরা সতীদাহ নিবারণকল্পে গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতিপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে এই প্রথা নিবারণকল্পে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা ও উদ্যমের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব এবং তৎপূর্বে সতীদাহকালে কিরূপ বলপ্রয়োগ করা হইত তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

যদি এরূপ বিশ্বাস আপনাদের থাকে যে, সতীদাহের সময় বলপ্রয়োগ করা হইত না তবে তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। সদ্য-বিধবা শোকে মুহ্যমান, তাঁহার সহমরণের জন্য বিষয়লোলুপ নিকট-আত্মীয়ের সহমরণে উত্তেজনা ও পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গবাসের প্রলোভন, তারপর মাদকদ্রব্য সেবন—ইহাই ত একপ্রকার বলপ্রয়োগ; তারপর চিতায় ঐ বিধবাকে মৃত স্বামীর সহিত রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া, শয়ন করাইয়া দেওয়া হয় এবং বাঁশ দ্বারা চারিদিকে চাপিয়া রাখিয়া পরে অনেক কাঠ চিতার উপর চাপান হয়। অগ্নিসংযোগের পর অগ্নির উত্তাপে যদি বিধবা-

গণ চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেন তবে জোরপূর্বক তাঁহাদিগকে ঐ জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত চাপিয়া রাখা হইত। ইহা যদি বল-প্রয়োগ না হয় তবে বলপ্রয়োগ কি? স্বদেশী ও বিদেশী অনেক মহাত্মার চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রন্থরূপে এই সম্পর্কে এখনো আছে।* বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে রামমোহন বলিতেছেন—

"সংকল্পবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বন্ধন কর, পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও, যাহাতে ঐ বিধবা আর উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওনকালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখ। এই সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন্ হারীতাদি বচনে আছে, তদনুসারে করিয়া থাকহ? অতএব কেবল জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী-হত্যা হয়।"

এরূপ নৃশংস বর্বরোচিত নারী হত্যাকাণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীগণ করিতে লজ্জা অনুভব করিতেন না। পরন্তু রক্ষণ-শীল সমাজ এই প্রথা রহিত হইলে হিন্দুধর্ম লোপ পাইবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পরেও এই প্রথাকে পুনরায় প্রবর্তন করিবার জন্য বিলাতে আপীল পর্যন্ত করিয়াছিলেন।

সভ্যজাতির মধ্যেও কোন কোন বর্বরোচিত আচার কিরূপে প্রশ্রয় পায়, এই সম্পর্কে রাজা রামমোহন যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজাকে একজন তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতত্ত্ববিদ্ বলিয়া নিঃসন্দেহে অভিহিত করা যায়। রাজা বলিয়াছেন—

"অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে, এ যথার্থ বটে; কিন্তু বালক-কাল অবধি আপন প্রাচীনলোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রী-দাহ পুনঃ পুনঃ দেখিয়া এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধে-সংস্কার জন্মে; এই নিমিত্ত, কি স্ত্রীর, কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ-মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগ-মহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত দয়া হয়।"

বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে রাজা সর্বত্রই সুবিচার করেন নাই এমন নহে।

---

*(1) "The Suttee's Cry to Britain," —by *J. Paggs.*

(2) "Wanderings of a pilgrim in search of the picturesque during four and tweenty years in the East with Revelations of life in the Zenana." by *Fanny Parks.*

যাহা হউক, আপনারা দেখিলেন গভর্ণমেণ্ট দেওয়ান রামমোহন রংপুর হইতে কলিকাতা আসিবার দশ বৎসর পূর্ব হইতেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন। রামমোহন আসিয়া এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পূর্বে অপর কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীই এই কার্যে গভর্ণমেণ্টকে তেমন সাহায্য করিতে সাহসী হন নাই। রামমোহন সাহসী হইলেন, কেন না তাঁহার সাহসের অন্ত ছিল না। রামমোহন হইতে ঘনশ্যাম শর্মার পার্থক্য এইখানে। সমাজ-সংস্কার শুদ্ধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না। সংস্কারকের নৈতিক সাহসের উপরেই তাহার প্রধান নির্ভর।

গভর্ণমেণ্ট এই প্রথা রহিতকল্পে শাস্ত্রের পোষকতা চাহিয়াছিলেন। রামমোহন যথাক্রমে "প্রবর্তক ও নিবর্তকের" বাদানুবাদচ্ছলে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে তাহার সার মর্ম এই যে—(১) সহমৃতা না হইলে যে প্রত্যবায় হয়, শাস্ত্রে এমন কোন আদেশ নাই। (২) সহমৃতা হইবার প্রধান কারণ স্বর্গে, পতি-সঙ্গ লাভ করা ইত্যাদি। কিন্তু স্বর্গাদি সুখভোগেচ্ছাও সকাম কর্ম। শাস্ত্রে তাহা নিন্দিত। সুতরাং শাস্ত্র-নিন্দিত সহমৃতা না হইয়া মোক্ষলাভের জন্য বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য যাপন করাই অধিকতর শাস্ত্রসম্মত। (৩) শাস্ত্র বলে স্বাধীন ইচ্ছায়, সুস্থ অবস্থায়, সংকল্প করিবে, চিতায় উঠিবে—জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহকে ভস্মে পরিণত করিবে। তাহা না হইয়া—বলপূর্বক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া চিতায় রাখা হয়, তৎপূর্বে ভাং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া একরূপ অজ্ঞান করা হয়। ইহা শাস্ত্রের আদেশ নহে। ইহা পুরুষের পক্ষে জ্ঞানতঃ বলপূর্বক নারীহত্যা করা। সুতরাং অশাস্ত্রীয় এই প্রথা রহিত হওয়া বিধেয়।

বাঙ্গলাদেশে, সমাজ-সংস্কারে শাস্ত্র অপেক্ষাও প্রবলতর বিঘ্ন দেশাচার। দেশাচার সম্পর্কে রামমোহন বলিয়াছেন যে—(১) সতীদাহ প্রথায় স্ত্রী-বধ, ভগিনী-বধ, মাতৃবধ করা হয়। (২) ব্রহ্ম-বধও করা হয়। কেননা, উহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের বিধবাও ছিলেন। শোকে মুহ্যমান বিধবাকে অশাস্ত্রীয় স্বর্গাদির প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি মৃত্যুর পর আত্মসাৎ করা ও তাহাদিগকে বন্ধনপূর্বক অগ্নিতে দাহ করা দেশাচার হইলেও ধর্ম নহে। ইহা অধর্ম। কেবল এদেশের লোক কেন, যদি সকল দেশের লোকে একমত হইয়া এরূপ স্ত্রী-হত্যা করে তথাপি ইহা অধর্ম। অনেকে একমত হইয়া বধ করাতে ঈশ্বর-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

এই সতীদাহ নিবারণকল্পে তিনি বাঙ্গলাদেশের নারীজাতির সম্পর্কে যে একটি সাধারণ উক্তি করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ হইলেও তাহা আমি উদ্ধার না করিয়া পারিতেছি না।

"নিবর্তক। এই যে কারণ কহিলা তাহা যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের সুন্দর-

রূপে বিদিত আছে; কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্যন্ত করা লোকতঃ ধর্মতঃ বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্বদা করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমতঃ—বুদ্ধির বিষয়।—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাত আছে; বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

"দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশ্যে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

"তৃতীয়তঃ—বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, বিবেচনা কর যে কত স্ত্রী, পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক; তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের

এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্যন্ত যে, কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

"চতুর্থ—যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক-এক পুরুষের প্রায় দুই-তিন-দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

"পঞ্চম—তাহারদের ধর্মভয় অল্প! এ অতি অধর্মের কথা, দেখ, কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ-পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাঁহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই-চারিবার সাক্ষাৎ করেন; তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্মনির্বাহ করেন; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহাদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক লইয়া কি কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থান-মার্জন, ভোজনাদি পাত্র-মার্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে এবং সূপকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিত কালে করে; যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাইসকল ও অমাত্যসকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন, এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতৃবিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; ঐ রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। আর অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাঁহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম, তাহাও করেন, মধ্যে মধ্যে কোনো কর্মে

কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে। আর যাহার স্বামী দুই-তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এ ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে, চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" ইতি—

সমাপ্ত ১৭৪১ অগ্রহায়ণ॥

রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর চারিভাগের প্রথম ভাগে নারীজাতি সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, যাহা আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও উপরে উদ্ধৃত করিলাম। জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহার অপেক্ষা নারীজাতির সম্বন্ধে অধিকতর উদার কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর সভ্যজাতিদিগকে বলিতে পারেন নাই।* রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চারিভাগের প্রথম ভাগের মধ্যেই এই সমস্ত কথা বাঙ্গালী জাতিকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা পৃথিবীর সভ্যজাতিসকল গ্রহণ করিয়া উন্নতিলাভ করিতেছে। যেহেতু, নারীজাতির উন্নতি ছাড়া, এ-যুগে সভ্যতাভিমানী কোনও জাতিরই উন্নতি সম্ভব নহে। সভ্যজাতি জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা শুনিল, কিন্তু বাঙ্গালীজাতির মধ্যে মিলের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পূর্বে যে মহাপুরুষ নারীজাতি সম্বন্ধে এত অধিক উদার কথা বাঙ্গলাদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন;—হিন্দু

---

* The Subjection of Women by *John Stuart Mill*—(1969).

জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও রঘুনন্দন, রঘুমণি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালীজাতি তাহার কথা আজও এক শতাব্দী পরে শুনিল না। "আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতি" নারীজাতি সম্বন্ধে অধিকতর আত্মবিস্মৃত।

রাজা রামমোহন রায় শতাব্দীর প্রথমভাগেই নারীজাতির বিষয়-সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে দায়ভাগ-সম্পর্কে যথেষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে সে অধিকার খর্ব করা হইয়াছে।* এবং উনবিংশ শতাব্দীর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বাঙলাদেশে মাতা, বিমাতা, স্ত্রী, কন্যা ও বিশেষতঃ বিধবা পুত্রবধূ ধনী ব্যক্তিদের পরিবার মধ্যেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে নিতান্তই বঞ্চিতা। সম্পত্তির উপরে অধিকার ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য নারীজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন; ইহা রামমোহন শতাব্দীর প্রথমেই বুঝিতে পারিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু রামমোহনের এক শতাব্দীর পরেও ঐ সম্পর্কে দায়ভাগ আইনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন সংস্কার হয় নাই। হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিষয়-সম্পত্তির উপর নারীজাতির অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতীদাহ ও বহুবিবাহ প্রথা সমাজে অধিকতর প্রচলন হইতে আরম্ভ করে, ইহাই রামমোহনের অভিমত। বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে রাজা রামমোহন প্রাচীন স্মৃতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নারীজাতির সম্মানহানিকর কু-প্রথা প্রাচীন স্মৃতিকে বহু অংশে অমান্য করিয়া সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ নিবারণকল্পে রাজা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন রাজ-কর্মচারীর নিকট প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহার স্ত্রীর শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কোন দোষ আছে। যদি ঐ ব্যক্তি তাহা প্রমাণ করিতে না পারে তাহা হইলে সে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্ট রাজার এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই, করিলে বহুবিবাহ প্রথা আরও দ্রুত সমাজ হইতে লোপ পাইত। এখন যে লোপ পাইতেছে, তাহা কেবল দরিদ্রতার নিষ্পেষণে।

নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দোলন প্রবল হইলেও, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর তাহাই অভিমত হইলেও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত দেখা দেয়। স্যার রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোন বিদ্যালয়ে বালকদের সহিত বালিকাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তকে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার বিরোধীদিগের মতের তিনি খণ্ডন

---

* Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females—(1822) *Raja Rammohan Roy*.

করেন। স্যার রাধাকান্ত দেব সহমরণ-প্রথা উঠাইয়া দিবার বিরোধী হইলেও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনে তিনি শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন অগ্রণী ব্যক্তি। এক্ষণে আমরা শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে প্রবেশ করিব।

ঊনবিংশ শতাব্দী—১৮২৫ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ

আপনারা দেখিলেন যে, সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও এই প্রথা শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রহিত হয়।

স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শেষেই বেশী লক্ষিত হয়। মহাত্মা হেয়ার যেমন বালকদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন, মহাত্মা বিটনও (বেথুন?) সেইরূপ এদেশের বালিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই মহাত্মা বিটন্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই দুই পণ্ডিতের সহায়তায় স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে বিপুল আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাতে উক্ত দুই পণ্ডিতের সহিত মহাত্মা বেথুনের নামও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মহাত্মা বেথুনের নামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই অদ্যকার বেথুন কলেজ। বালিকাদের শিক্ষার জন্য সহরে ও মফঃস্বলে আর যত কিছু স্কুল হইয়াছে তাহা এই ইতিহাসে স্মরণীয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের অনুকরণে।

এইবার আমরা শতাব্দীর মধ্যভাগে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৫৩ এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা-বিষয়ক প্রস্তাব' লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালী সমাজের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা রামমোহনের পরে নারীজাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি লইয়া এমন তেজস্বী পুরুষ বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর আবির্ভূত হন নাই। সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার মাত্র পঁচিশ বৎসর পরেই যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, "বিধবাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে এবং শাস্ত্রে তাহার নির্দেশ আছে", তখন পণ্ডিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে আন্দোলন দেখা দিল তাহার তুলনা নাই।* মাত্র পঁচিশ

---

* বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন ও পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণকল্পে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিমত যে, "পণ্ডিতমণ্ডলী একত্র করিয়া বিচার করাইলে কোন বিষয়ের যে নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবেক, তাহার প্রত্যাশা নাই।" কারণ তাঁহারা "জিগীষার বশবর্তী হইয়া স্ব-স্ব মত রক্ষা বিষয়ে এত ব্যগ্র হন যে প্রস্তাবিত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে দৃষ্টিপাত মাত্র থাকে না।" তাঁহারা "ক্রোধে অধৈর্য" হন। "কেবল কতকগুলি অলীক, অমূলক আপত্তি উত্থাপন" করেন। "এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।"

বৎসর পূর্বে যে বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত চিতায় উঠাইয়া দিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্বক জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইত সেই বিধবাদিগকে কিনা পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং আবার স্যার রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন, যাহাতে বিধবা-বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইতে না পারে। তিনিও পণ্ডিতদিগের সাহায্যে পরাশরের বচন "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"র ভিন্ন অর্থ করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজকে স্যার রাধাকান্ত বলিলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও দেশাচারবিরুদ্ধ। কিন্তু তথাপি বিধবা-বিবাহ আইন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হইল। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে দায়ভাগ আইন সম্পর্কে যে অন্তরায় ছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। বিধবা-বিবাহের সন্তান-গণ আইনতঃ হিন্দু বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু এই বিধবা বিবাহ আইনে বহুবিবাহ প্রথা দূরীভূত হইতে পারিল না। কেননা, বিধবা-বিবাহও হিন্দু-বিবাহ এবং হিন্দু-বিবাহে বহু-বিবাহ অসিদ্ধ নহে। এই বিধবা-বিবাহের মূলে জাতিভেদ প্রথাও রহিয়া গেল। ভিন্ন জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ হইলে তাহা হিন্দু-বিবাহ হইবে না, যেহেতু তাহা দেশাচারবিরুদ্ধ। যাহা হিন্দু-বিবাহ হইবে না, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিধবা-বিবাহ হইলেও সেই বিধবা-বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হইবে না। ইহাই আইনের মর্ম। বিশেষতঃ পুন-র্বিবাহিতা বিধবা তাহার পূর্ব-স্বামীর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইবেন। অত্যন্ত দ্রুত উন্নতিশীল সমাজ-সংস্কারকগণ বিধবা

বিধবা-বিবাহরূপ সমাজ-সংস্কারে শাস্ত্র ও যুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া চলিতে ও স্বীকার করিতে পারেন।" বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রমতে কর্তব্য প্রতিপন্ন করিয়াও সমাজে প্রচলিত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া তিনি আক্ষেপ করিয়া-ছেন, "দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এদেশের পরমগুরু, দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ। ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্।"

দেশের সামাজিক আচার "বিধাতার সৃষ্ট নহে," এবং অপরিবর্তনীয়ও নহে। "ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে সৃষ্টিকাল অবধি আমাদের দেশের আচার পরিবর্তন হয় নাই, এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে।" অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এদেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষে ইদানীন্তন লোক, পূর্বতন লোকদিগের সন্তানপরম্পরা, এরূপ প্রতীত হওয়া অসম্ভব।"

সমাজ-সংস্কারে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ "বিধেয় নহে"। এই আপত্তি "নব্য

বিবাহের সঙ্গে এই সমস্ত অন্তরায় থাকাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। আমরাও মনে করি, কপর্দকহীন নিঃসম্বল বিধবার বিবাহ বা স্বাধীনতা পরিবার ও সমাজে অসম্ভব। বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও রামমোহন ইহা সম্ভবতঃ অধিক বুঝিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার দুইটি কারণ এই আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। প্রথম কারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় সমাজে অত্যন্ত দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে—সে ভ্রূণহত্যার কলঙ্ক উদ্ঘাটন করিবার ইচ্ছা আমার নাই। দ্বিতীয় কারণ, বিধবাদিগকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে না দেওয়ায় পুরুষ নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে। প্রথম কারণের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশী জোর দিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণটির উপরেই ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র একমাত্র নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের ধারণা দুই কারণের উপরেই নির্ভর করিয়া সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ১৪।১৫ বৎসর পর ব্রাহ্ম-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ লইয়া আর একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। সকল ব্রাহ্মগণ সেই সময় অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজ-সংস্কারে স্বভাবতঃ রক্ষণশীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিদেশী গভর্ণমেণ্টের আইনের দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নানারূপ বাধা-আপত্তি ও

সম্প্রদায়ের লোক" উত্থাপন করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, "এই আপত্তি শুনিয়া আমি কিয়ৎক্ষণ হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য, একথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর। যদি এদেশের লোক সামাজিক দোষের সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান হয় এবং অবশেষে কৃতকার্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আহ্লাদের, সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনা-শক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যদ্রূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্নে, সেই চেষ্টায় ইষ্টসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করা যায় না। ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্নে ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এদেশের সে-দিন সে-সৌভাগ্য-দশা উপস্থিত হয় নাই এবং কতকালে হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সে-দিন, সে-সৌভাগ্য-দশা, কস্মিনকালেও উপস্থিত হইবেক না।" * * * "আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অপদার্থ, আমাদের হতভাগা সমাজ অতি কুৎসিত দোষ-পরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এদিকের চন্দ্র ওদিকে উঠিলেও, এরূপ লোকের ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দোষ সংশোধন, কস্মিনকালেও সম্পন্ন হইবার নহে।" সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর মহাশয় গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। রাজা রামমোহনও তাহা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুর তৎকালীন সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই উভয় সংস্কারক এ-বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন।

ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল আইনের সাহায্যে বিধিবন্ধ করাইয়া দেন। এই বিলের নাম "সিভিল ম্যারেজ বিল"—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তিন আইনের বিবাহ। এই বিলের আশ্রয়ে যাঁহারা বিবাহ করেন তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য করা হয় যে, তাঁহারা হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি কোন ধর্মের লোক নহেন। এখন বিবাহের সময় "আমি হিন্দু নই", একথা বলিতে অনেক ব্রাহ্মদেরও হিন্দুত্বাভিমানে আঘাত লাগে, এবং ইহা লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তরও আছে দেখা যায়। যাহা হউক, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এই তিন আইনের বিবাহ মূলে-ভিত্তি বিবাহে জাতিভেদের উচ্ছেদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহে জাতিভেদ আছে কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিন আইনের বিবাহে জাতিভেদ নাই, বাল্যবিবাহও একরূপ নাই; বহুবিবাহ তো মোটেই নাই। কেবল কবুল জবাব দিয়া হিন্দুত্ব বর্জন অপরাধ ব্যতিরেকে নারীজাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাদের সুবিধা ও সুযোগ এই বিবাহে যথেষ্ট অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী—১৮৭৫ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ

শতাব্দীর এই শেষভাগকে আমি প্রথম বক্তৃতাতেও একটা প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ইহা রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ। এই যুগে সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে, অথচ একটা সমন্বয়ের ভাবও আছে। এখন দেখিতেছি প্রতিক্রিয়ার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

নারীজাতি সম্পর্কে এই প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের মনোভাব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের ভগ্নী নিবেদিতার লেখার মধ্যে আমরা কিছু-কিছু পাইয়া থাকি। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মিলন হয় তাহাতে ভগ্নী নিবেদিতা হিন্দু-নারীজাতির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাপূর্ণ কথা বলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।* তিনি বলেন, হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ একবার হইলে আর ইহজন্মে তাহা ছিন্ন করা যায় না। হিন্দু নারীগণ বলিয়া থাকেন যে আমরা এক-

*"Marriage in Hinduism is a sacrament and indissoluble. The notion of divorce is as impossible as the remarriage of widow is abhorrent. Even in orthodox Hinduism this last has been made legally possible by the life and labours of the late Pandit Iswarchandra Vidyasagar, an old Brahmanical scholar, who was one of the stoutest champions of individual freedom, as he conceived of it that the world ever saw. But the common sentiment

বার জন্মি, একবার মরি এবং একবার বিবাহ করিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আইনতঃ বৈধ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর মনের ভাব বিধবা-বিবাহের পক্ষে অনুকূল নয়। বিধবা-বিবাহ হওয়া ভগ্নী নিবেদিতার অভিমত নহে। এই অভিমত বিদেশিনী মহিলার হইলেও শতাব্দীর শেষভাগে এই মনোভাবই সাধারণে প্রচলিত এবং প্রতিক্রিয়ামূলক। আমি বিশ্বাস করি ইহা অনিষ্টকরও বটে।

আমাদের দেশের সহিত পাশ্চাত্যদেশের নারীজাতির অবস্থা তুলনা করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের নারীগণ যেমন পরিবারের মধ্যে পবিত্রতা রক্ষার্থে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তেমনই পাশ্চাত্যদেশের নারীগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের শক্তির উদ্বোধনার্থে পারিবারিক বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াও কৃতকার্য হইয়াছেন। অবশেষে ভগ্নী নিবেদিতা, সুখের বিষয়, এরূপ আশাও পোষণ করেন যে, হিন্দু-নারীগণ পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়াও সমাজে ও রাষ্ট্রে আপন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রশক্তির উদ্বোধনে সহায়তা করিবেন। অন্যপক্ষে, পাশ্চাত্য নারীগণও বিবাহ-বন্ধনকে হিন্দুনারীর মত অচ্ছেদ্য মনে করিয়া পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষাকল্পে যত্নবতী হইবেন।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করিলে তিনি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিতেন যে, "আমি কি বিধবা যে তোমরা আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতেছ?" আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, "কোন জাতির উন্নতি যদি সেই জাতির বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে তবে সেরূপ উন্নতিশীল জাতি আমি এখনও দেখি নাই।"* ইহা প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের কথা। তাঁহার কথার গূঢ়

---

of the people remains as it was, unaffected by the changed legal status of the widow. . . ."

"............In India the sanctity and sweetness of family life have been raised to the rank of a great culture. Wifehood is a religion, motherhood a dream of perfection." "* * * The Woman of the East is already embarked on a course of self-transformation which can only end by endowing her with a *full measure of civic and intellectual personality*. Is it too much to hope as she has been content to quaff from our wells in this matter of the extension of the personal schope, so we might be glad to refresh ourselves at hers, and gain therefrom a renewed sense of the sanctity of the family, and particularly of the inviolability of marriage."—Sister Nivedita: "*The Present Position of Woman*"—*a paper communicated to the first Universal Races Congress in* 1911.

*"If the prosperity of a nation is to be gauzed by the number of husbands its widows get, I am yet to see such a prosperous nation."—*Swami Vivekananda.*

মর্ম এইরূপ অনুমান হয় যে, সধবা, বিধবা, কুমারী যিনিই হউন না কেন, সর্বপ্রথম জ্ঞান-শিক্ষা লাভ করিবেন এবং জ্ঞানলাভ করিবার পরে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিতা হইয়া বিবাহ করিবেন। বিধবাকে জোর করিয়া বিবাহে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতে গেলে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। শতাব্দীর শেষভাগে উগ্র সন্ন্যাসী কোন অবস্থাতেই নারীজাতির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "হিন্দুর ধর্ম লইয়া আমেরিকার সমাজ গড়িতে পার?"

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে তিনি বলিয়াছেন যে—

(১) প্রথমে একজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

(২) প্রথমেই একেবারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

এই দুইটি উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়া স্বামী বিবেকানন্দের অনভিপ্রেত ছিল না। তবে এই সম্পর্কে কম বাধা-বিপত্তির পথে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামিজী এই অভিমত প্রকাশ করিলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ অতীত হইবার পরে বাঙগালী হিন্দু-সমাজে এই কথার গুরুত্ব আরও অনুভূত হইতেছে।

নারীজাতি সম্পর্কে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন—যে বিদ্যালয়ে কুমারী ও ব্রহ্মচারিণী রমণীগণ আধুনিক সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সে কল্পনা আর তাদৃশ কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁহার ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ

স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক অতি প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক বলিয়া ইতিহাসে স্থান পাইবেন। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যদেশে—সাধারণতঃ লোকেরা তাঁহাকে একজন হিন্দুধর্মের প্রচারক বলিয়াই জানিতে পারিয়াছে। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন না। ইতিহাসেও তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশ ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে তিনি বর্তমানকালের উপযোগী অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের একটা আত্ম-সংবিৎ ছিল। তাঁহার প্রচারকার্যের ফল,

ভবিষ্যতে কিরূপ আকার ধারণ করিবে—স্বীয় অমানুষিক কল্পনাবলে তাহাও তিনি অনুমান ও কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

কোন জাতির মধ্যে এক সময়ে এক সঙ্গে দুইজন বিবেকানন্দ থাকিতে পারে না। বাঙ্গলায়—ভারতে বা এমন কি ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসর—একজন বিবেকানন্দই ছিল। ইহা অত্যুক্তি নয়—ইহা ইতিহাস, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

প্রখর ব্যক্তিত্বশালী এত বড় একজন অদ্ভুতকর্মা জগদ্বরেণ্য ধর্মপ্রচারকের ধর্মজীবনকে তাহার বিচিত্র অভিব্যক্তির পথে অনুসরণ করা অতীব দুরূহ কার্য! তাঁহার ধর্মজীবনের অনেকগুলি স্তর আছে। একের পর আর সেই সমস্ত বিভিন্ন স্তরগুলির উল্লেখ সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ধর্মজীবনের এক স্তরের সহিত অন্য স্তরের কি সম্বন্ধ—ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা আর যাহাই হউক—সহজ নহে; এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত স্তরগুলির অন্তরালে কি এক যোগসূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চালিত হইয়া এই সকল বিভিন্ন—আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন স্থলে পরস্পরবিরোধী—স্তরগুলিকেও একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহা নির্ধারণ করা আরও সহজ নহে। কি এক অখণ্ড প্রচণ্ড জীবনী-শক্তি স্বীয় দুর্নিবারবেগে নিজের অন্তরে ও বাহিরে কত সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্য দিয়া আপনার পথ আপনি করিয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়াছে,—তাহার সেই অপূর্ব-গতি-মুক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহার প্রত্যেকটি পা ফেলার সহিত সমগ্র জীবনের একটা ধারাবাহিক গতিকে সুসংবদ্ধ করিয়া ফুটাইয়া তুলা সহজ ত নয়ই, অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু গতিপথে স্তর হইলেও জীবন এক।

বাল্যের স্বভাব-ধ্যানী, প্রচলিত দেবদেবীর পূজায় অনুরক্ত বালক—কি করিয়া যে একদিন মূর্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বসিল—কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে নাস্তিক না হইলেও সংশয়বাদের কাছাকাছি তার্কিক যুবা গুরুবাদ, অবতারবাদ, মূর্তিপূজা ও অদ্বৈতবাদ—সমস্তই দূরীভূত করিয়া দিয়াছে—তখনকার ব্রাহ্ম-সমাজের দেখাদেখি এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনার কথাও ভাবিতেছে, অথচ পরক্ষণেই এ সমস্ত ধূলির মত মন হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিছুতেই তাহার ধর্মপিপাসা মিটিতেছে না। কিসের তাড়নায় উন্মাদের মত নরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বেড়াইতেছে? আবার কোন্ শক্তি জীবনের উপর আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে? অদ্বৈতবাদ আসিতেছে আবার প্রতীকোপাসনা আসিতেছে। কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইতেছে না। পিতৃবিয়োগ, জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতাচারণ, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, কোথায় সগুণ ঈশ্বর, কোথায় নির্গুণ ব্রহ্ম, কোথায় অখণ্ডের ধ্যান আর কোথায়ই বা সেই উগ্র তীব্র ও এমন কি তিক্ত বিশ্লেষণমূলক যুক্তিবিচার? আবার ধীরে ধীরে একি মোহজাল, এ কাহার স্পর্শ এবং ইহা কিসেরই বা জন্য? রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিতা এ মৃন্ময়ী না

চিন্ময়ী? কে দেখায়? কে দেখে? কিসে এই অসম্ভব সম্ভব হয়? হেদুয়ার লৌহ বেড়ায় মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে মনের মধ্যে বিচার চলিতেছে—জগৎ আছে কি নাই; পরমহংস কে, মানুষ না অবতার? বেদান্তের দিক্ দিয়া, না পুরাণের দিক্ দিয়া? তারপরে অন্য স্তরে আত্মপ্রশ্ন; পরমহংসই গুরু না পওহারী বাবা? ভারতে দুঃখ দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা জগদ্দল পাথরের মত জাতির বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। যার পেটে ভাত নাই তার আবার ধর্ম কি! যার মা ভাই খেতে পায় না, তার পক্ষে কি মুক্তি সাজে? যে ভগবান আমাকে এখানে খেতে দিতে পারেন না—তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—এ আমি বিশ্বাস করি না। কে চায় নিজের মুক্তি? মুক্তির বাপ নির্বংশ? দু'চারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা? লাখ নরকে যাব, যদি মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়। সমস্ত জগতের মুক্তি না হ'লে আমার মুক্তি নাই। আমি ও জগৎ যে এক। সুতরাং সমস্ত জগতের মুক্তি ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। দেশের একটা কুকুর যে পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে, সে পর্যন্ত আমি মুক্তি চাই না। তোমরা কে যে আমার দেশের মূর্তিপূজাকে গালি দেও, অদ্বৈতবাদকে উপহাস কর—খৃষ্টানই হও আর ব্রাহ্মই হও—তোমরা তফাৎ যাও। এই মহৎ জীবনের উপকার যবনিকা অপসারণ করিলে পর এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর স্রোতমুখে ভাসমান প্রস্ফুটিত পদ্মের মত একের পর আর আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

এক স্তরে দেখিতে পাই তিনি মূর্তিপূজক, দ্বিতীয় স্তরে তিনি মূর্তি পূজার বিরোধী সম্প্রদায়গুলির উপর খড়্গহস্ত। এক স্তরে দেখিতে পাই তিনি অদ্বৈতবাদের ঘোর বিরোধী, আমি-তুমি ঘটি-বাটি সব ঈশ্বর—একি আবার একটা কথা? আবার অন্য স্তরে দেখিতেছি—অদ্বৈতবাদের একজন এ-যুগের বড় মীমাংসক এবং সর্বাপেক্ষা নির্ভীক প্রচারক। এক স্তরে দেখিতে পাই—পরোপকার, অন্য স্তরে দেখিতে পাই—জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা,—"দরিদ্র নারায়ণের" সেবা। এই সমস্তই ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর—একের পর আর এ সমস্তের ভিতর দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। পরিশেষে দ্বিতীয়-বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রাক্কালে কাশ্মীরে ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে দেবীর আদেশবাণী শ্রবণে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে যে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পৃথিবীর জীবনলীলা যে ক্রমশঃ একটা বড় পরিণতির মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইতে চলিয়াছে—বিকাশের এই স্তরে আমরা তাহা দেখিতে পাই। এই স্তরে তাঁহার কর্মজীবনের অবসানে কর্মসন্ন্যাসের অবস্থা আমাদের চক্ষুকে বাষ্পার্দ্র করিয়া তোলে—হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

মনুষ্যজীবনের একটা গতি আছে, তাহার বিকাশ আছে এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তাহাতে উন্নতি এবং অবনতির অবসর আছে। জীবনের এই সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে আমরা সেই জীবনের বিকাশের ধারাকে এবং সেই

বিকাশের মূল উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করিতে পারি, জীবনের সেই লক্ষ্যকে কতকটা নির্ধারণ করিতে পারি। জীবনের প্রবাহে আবর্ত্ত আছে। সেই আবর্ত্তের, সেই ঘুরাফেরার মধ্য দিয়াই আমরা মূলে এক অখণ্ড প্রবাহের গতিমুক্তি ও চরম পরিণতিকে নির্দেশ করিতে পারি। বিকাশের এই সমস্ত বিভিন্ন স্তর বিচ্ছিন্ন নহে। তাহারা সকলেই এক অখণ্ড জীবনের বিকাশ—বিশ্ব-সংসারের কিছুই বিচ্ছিন্ন নহে। যাহা আপাতদৃষ্টিতে এমন কি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তাহার অভ্যন্তরেও ঐক্য বিদ্যমান। ধর্মজীবনের বিকাশের যে স্তরে বিবেকানন্দ পৌরাণিক অবতারবাদ স্বীকার করিতেছেন না, আবার সে স্তরে "যেই রাম সেই কৃষ্ণ একাধারে রামকৃষ্ণ, কিন্তু বেদান্তের দিক দিয়ে নয়"—এই কথা শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত নেত্রে থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন, এই উভয় স্তরকে প্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ উহা মূলে একই জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। বাহিরের বিকাশে যাহা স্ববিরোধী, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পরিবর্তনমুখে তাহা ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়াফলে স্বাভাবিক। যাঁহারা মনে করেন স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-জীবনে কোন বিকাশ নাই, বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তর নাই, কেননা তিনি স্বয়ম্ভু প্রাকৃতিক বা জীবধর্মীর নিয়মের ঊর্ধ্বে, তাঁহারা কি বলেন বুঝা কঠিন। আবার যাঁহারা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মমতের কোন স্থিরতাই নাই, একবার যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেছেন আবার পরক্ষণেই তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার মত সকল পরস্পর-বিরোধী, পূর্বাপর ঐ সমস্ত মতের মধ্যে কোন ঐক্য নাই, তাঁহারাও যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রথম হইতে শেষাঙ্ক পর্যন্ত স্বামিজীর জীবন-নাট্যের এক অখণ্ড বিচিত্র লীলাভিনয় দেখিতে সমর্থ হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"মশারি তুলিয়া দেখরে মুখ।" প্রত্যেক মহৎ জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে। অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু ইহাতে নাই। স্থাণুর মত অচল একটা বিশেষ আদর্শকে যাঁহারা স্বামিজীর জীবনের বিকাশোন্মুখে প্রত্যেক স্তরেই দেখিতে চান অথবা দেখিতে পান তাঁহারা ভ্রান্ত আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদ কল্পিত। ইহা মায়িক, ইহা জড়বাদের নামান্তর মাত্র। তাঁহারা জীবনবাদী নহেন। তাঁহারা জীবনের ধর্মকেই অস্বীকার করেন। কেন না জীবনের ধর্মই পরিবর্তনোন্মুখী। যাঁহারা বিকাশের বিভিন্ন স্তর দেখিতে ইচ্ছুক নহেন বা ঐরূপ দেখা অন্যায় কিংবা পাপ মনে করেন তাঁহাদের ধারণা, স্বামিজীর ধর্মজীবনের বিকাশে নানারূপ স্তর দেখিতে গেলে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমাকে খর্ব করা হইবে। কিন্তু ইঁহাদের ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। মনুষ্য-জীবন ত দূরের কথা, যাহা জীবনধর্মী তাহাই পরিবর্তনশীল। এই বিশ্ব-সংসারই পরিবর্তনশীল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিকাশকে, বিকাশের পথে বিভিন্ন স্তরগুলিকে যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকেই অস্বীকার করেন। কেননা, পরিবর্তনই

জীবনের চিহ্ন, পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উন্নতি ও অবনতির অবসর আছে বলিয়াই এই জীবন-সংগ্রাম। লীলাই হউক আর মায়াই হউক, পরিবর্তনকে কে কোথায় অস্বীকার করিতে পারে? প্রত্যক্ষকে কে অস্বীকার করিবে? স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনে পরিবর্তন আছে, বিকাশ আছে, বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও ক্রম-পরিণতিও আছে। হয়ত বা উন্নতি এমন কি অবনতিরও অবসর আছে। মায়াকে অবলম্বন করিয়া যে অস্তিত্ব, যে প্রবাহ তাহাতে দোষ থাকা অসম্ভব নয়।

অন্যদিকে যাঁহারা পরিবর্তন মাত্রকেই দুর্বলতা, অস্থিরতা মনে করেন, তাঁহারা জীবনধর্মের স্বাভাবিক গতিকে বুঝিতে পারেন না, পরিবর্তনের মুখে ধর্মজীবনের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে পৌঁছিবার মধ্যে যে সেতু বিদ্যমান সেই বিভিন্ন স্তরের পরস্পর যোগের সেতু যে এক অখণ্ড মানব-মন, সেই মনের ক্রিয়াকে, মনের অখণ্ডতাকে তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই—বিভিন্ন স্তরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া একান্ত সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হন। যাঁহারা মনকে বুঝিতে পারেন না তাঁহারা আত্মাকে কি করিয়া বুঝিবেন? বস্তুতঃ যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে তাহা সকলেই এক প্রচণ্ড জীবনীশক্তির অধীনে, এক অখণ্ড মনের ধারা-বাহিক চিন্তাসূত্রে একত্র গ্রথিত। জীবন-প্রবাহ এক। প্রবাহে তরঙ্গ আছে, তরঙ্গে উত্থান ও পতন স্রোতকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মুক্তি শুধু স্থিতি নয়। গতির মধ্যেও মুক্তি আছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের যে উদ্দামপ্রচণ্ড গতিবগে তাহাই তাঁহার জীবনের মুক্তিরও ইতিহাস। তাঁহার জীবনের শিক্ষাস্থিতি মুক্তি নয়, গতি মুক্তি।

প্রথমোক্ত সমালোচকগণ একের জন্য বহুকে অস্বীকার করেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকগণ বহুকে দেখিতে গিয়া এককে দেখিতে পান না, অন্তর্দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া পড়েন। শাস্ত্র বলেন, আমাদিগকে চক্ষুষ্মান হইতে হইবে। বস্তুতঃ, যিনি এক, তিনিই ত বহু। এই পরিদৃশ্যমান বহু যদি এক হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া থাকে তবে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বহুবিধ স্তরও তাঁহার এক অখণ্ড মনের ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। ইহা তাঁহারই প্রচারিত অদ্বৈত-বেদান্ত আর ইহারই আলোকে তাঁহার জীবনের গতিকে—ইতিহাসকে—আমি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

কিন্তু এই ধর্মজীবনের বিকাশ কি কেবল আপনাতে আপনি সম্ভব? আমরা ইতিহাস ও জীবনচরিত আলোচনায় প্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিতে বাধ্য এবং প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়াই যাহা পরোক্ষানুভূতির বিষয় তাহাকে অনুসন্ধান করিব। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিকাশ আলোচনা করিতে গিয়াও আমাদিগকে যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা প্রত্যক্ষ নয় তাহাকেও অনুসন্ধান করিতে হইবে। অবিশ্বাস করিলে চলিবে না।

অদ্বৈত বেদান্ত বলে যে, এক পরমাত্মাই আছেন আর কেহ বা কিছুই নাই; চক্ষে দেখা গেলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাই। আমি এবং আমার বাহিরে যাহা দেখিতেছি ইহা সকলেই স্বরূপতঃ সেই এক পরমাত্মা। সুতরাং সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমার জন্মও মিথ্যা, মৃত্যুও মিথ্যা। জীবনধারণ ত মিথ্যা বটেই। হয়ত অদ্বৈত বেদান্ত প্রচারও মিথ্যা। আমার জীবনের যত বিকাশ ও পরিবর্তন সকলই কল্পনা মাত্র। কেননা, উপাধিবিশিষ্ট এই যে ক্ষুদ্র আমি, এই আমিই একটা প্রকাণ্ড ভ্রম। সংসার-নাট্যের যত কিছু লীলাভিনয় চলিতেছে তাহা সমস্তই এই মহা ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে। এই ভ্রমকে দূর করাই জীবের লক্ষ্য। এই ভ্রমের নিরসনেই জীবের মোক্ষ। 'অহং' ও 'ইদং'-এর যত অস্থিরতা—যত পরি-বর্তন—সমস্তই মায়াপ্রসূত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্ম এক।

কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ত চারটিখানি কথা নয়। "কেবল সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন যাঁহারা" এই অদ্বৈত সাধনে তাঁহারাই শুদ্ধ অধিকারী—একথা শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহনই বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে শতাব্দীর শেষ ব্যক্তির জীবনের আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন নহেন—সেই সমস্ত নিম্নাধিকারীরাই জগতের স্রষ্টা, ত্রাতা, সংহর্তা একজনকে লক্ষ্য করিয়া নিরাকার সগুণ উপাসনা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার ধর্ম-জীবনের চরম পরিণতিতে পৌঁছিয়া অদ্বৈত বেদান্তকেই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন এবং অধিকারীভেদে রাজা রামমোহনের মত তিনিও সগুণ নিরাকার, ঈশ্বরোদ্দেশে প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—ধর্মসাধনার ধারায় ইহা ক্রমোন্নতিশীল মানবচিন্তার তিনটি স্তরভেদ মাত্র।

বিকাশ বা পরিবর্তনকে বুঝিবার দুইটিমাত্র প্রসিদ্ধ উপায় চিন্তারাজ্যে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম উপায়, যাহার বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার স্বরূপের কোনই পরিবর্তন হইতেছে না, সমস্ত পরিবর্তন লীলাটার কোনই পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। বস্তুতঃ আত্মার পরিবর্তন বা বিকাশ সম্ভবই নয়। দ্বিতীয় উপায়, যাহার বিকাশ হইতেছে, স্বরূপতঃ উত্তরোত্তর তাহার পরিবর্তন হইতেছে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হইতেছে, দধি হইতে ঘোল হইতেছে, ঘোল হইতে মাখন হইতেছে, মাখন হইতে ঘৃত হইতেছে। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, এক দুগ্ধই দধি, ঘোল, মাখন ও ঘৃতের মধ্যে অবস্থান করিতেছে তবে তাহা দধি নহে, যাহা দধি—তাহা ঘৃত নহে, একের স্বরূপ বা গুণ অন্যে নাই। এখানে অনেকাংশে স্বরূপের ও স্বধর্মের বিনাশ দেখা যাইতেছে। অথচ ইহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্রও আছে, কেননা ইহারা সকলেই একই দুগ্ধের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিকে এইরূপ দুগ্ধ হইতে ঘৃতে পরিবর্তনের যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল, সেই

দৃষ্টান্তের অনুপাতে হয়ত কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিকাশকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা ভ্রমাত্মক। তাঁহার জীবনের সে সমস্ত বিভিন্ন স্তর একের পর আর আমরা দেখিয়াছি, তাহা দেশে ও কালে, কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়া লোকলোচনে ঐরূপ প্রতিভাত হইয়াছে মাত্র—যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার অবশ্যই একটা ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত বিকাশ বা পরিবর্তনের কোন পারমার্থিক সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তাঁহার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা বিকাশ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

পরিণামবাদই হউক অথবা বিবর্তবাদই হউক, লীলাই হউক বা মায়াই হউক পারমার্থিক দৃষ্টিতেই হউক বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই হউক—বিবেকানন্দের ধর্ম-জীবনের যে পরিবর্তন, পরিবর্তনের মুখে যে সকল বিভিন্ন স্তর আমাদের সম্মুখে একে একে ধীরে ধীরে প্রকট হইয়াছে, সেই প্রত্যক্ষকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা জীবনের দিক দিয়া, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ও বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়া পারি না। কিন্তু ইহা দ্বারা বিবেকানন্দের যে অংশ দেশ, কাল ও সমস্ত কার্য-কারণ সম্পর্কের অতীত, তাহার অস্তিত্বও কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। যাহা ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, যাহা বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে তাহাকে অযথা বিতণ্ডার বিজৃম্ভণে জড়িত করা কোনক্রমেই সঙ্গত হয় না। অস্বীকার করা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ছোট-বড় সমস্ত জীবনের, জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের এমন একটা দিক্ আছে যাহা বহু পরিমাণে অদ্যাপিও অস্পষ্ট। ইহা স্বীকার না করিলে সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। মানবজীবনের ঘটনাবলী কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়া যিনি দেখাইতে ইচ্ছা করেন, সত্যকে অতিক্রম করা কোনক্রমেই তাঁহার উচিত হয় না।

অপ্রত্যক্ষ, অদৃশ্যে কি কারণে বিবেকানন্দের ধর্মজীবন বাঙলায় শতাব্দীর শেষভাগে আসিয়া প্রকট হইল কে বলিতে পারে? কেহই পারে না। ঐ সম্বন্ধে সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হইতে যাহা কিছু সম্প্রতি বলা যাইতে পারে, ইতিহাসে স্মরণীয় মহাপুরুষদের জীবনের ব্যাখ্যাকল্পে তাহা যথেষ্ট নহে। যাহা ঘটিয়াছে তাহার পূর্বাপর চিন্তা করিয়া আমরা একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, অনুমান করিতে পারি মাত্র। বিবেকানন্দ কলিকাতায় কায়স্থ জাতির মধ্যে একটা শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে আধারের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করা যায় কিরূপে? স্বরূপে সকলেই সেই এক ব্রহ্ম হইলেও আমাদের যাহা কিছু বলিবার কহিবার তাহা ত বহু অংশে এই আধারকে লইয়াই। দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে এই প্রপঞ্চময় অথচ অনির্বচনীয় চৈতন্য-সমন্বিত আধারের যে লীলাভিনয়—তাহাই ত জীবন—তাহাই

ত ইতিহাস। গতিমুখে তাহাই ত বিকাশ। আর জন্ম ও মৃত্যুর পরিসরের মধ্যে তাহাই ত চঞ্চল ও মুখর। স্তব্ধ অন্ধকারের ইতিহাস ত আমরা জানি না। কেহ ত তাহা আজিও ঠিক ঠিক বলিতে পারিল না।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতামহ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। বিবেকানন্দের পিতা সহজ দাতা, মুক্তস্বভাব, সংগীতপ্রিয়, কথঞ্চিৎ পাশ্চাত্য ও মুসলমানভাবাপন্ন যুক্তিবাদী ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। বিবেকানন্দের মাতা শিবের উপাসিকা নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন। বংশানুক্রমে ইঁহাদের নিকট হইতে কি সংস্কার বিবেকানন্দের মধ্যে আসিয়া পোঁছিয়াছিল, কে বলিবে? বিবেকানন্দও সন্ন্যাসী হইলেন। তিনিও মুক্তস্বভাব, সংগীতপ্রিয়, পাশ্চাত্যদর্শনের যুক্তিবাদী, নির্ভীক এমন কি যাহাকে বলা যায় ডানপিটা যুবক ছিলেন। সর্বত্যাগী উমানাথ শংকরও তাঁহার উপাস্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য বাহ্য সাদৃশ্যের অন্তরালে, ভিতরে ভিতরে যে কি এক অদৃশ্য শক্তি বংশানুক্রমের মধ্য দিয়া কার্য করিয়াছে তাহার অনেকটা অংশই আমাদের দৃষ্টির সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে। কেবল বংশানুক্রম ও তাহার অবস্থাধীন ক্রমপরিণতি স্বামী বিবেকানন্দের অদ্ভুত জীবনকে সম্ভব করে নাই। মহৎ জীবনের ব্যাখ্যা বংশানুক্রমে হয় না। ইহা নূতন সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলিকাতার এক গলির মধ্যে কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল রামমোহন ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়া কেশবচন্দ্রের হস্তে শতাব্দীর এই অভিনব ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনকে পোঁছাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছেন, কেননা আর মাত্র তিন বৎসর পরেই কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথের সহিত জাতিভেদের সমস্যা লইয়া কলহ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকে দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার একমাত্র নেতা হইয়া ইহাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিলেন। রামমোহন মূর্তিপূজা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন—দেবেন্দ্রনাথ বেদের স্থানে আত্মপ্রত্যয়কে ঈশ্বর-উপলব্ধি ও ধর্ম-সাধনার ভিত্তি করিয়াছেন, রামমোহনের শংকরানুবর্তী অদ্বৈতবাদ পরিহার করিয়া এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের খৃষ্টভক্তি দেখা দিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্ট-বিভীষিকা দেখিতেছেন। মহাপুরুষবাদের পূর্বাভাষ প্রকট হইয়াছে; বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে ছয় বৎসর হইল রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ তখনও সাধারণভাবে হিন্দু-ধর্ম ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন, ডিরোজীওর শিষ্যদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই যুক্তিবাদ, স্বাধীনচিন্তা, সমাজ-বিদ্রোহ, নাস্তিক্যবাদ একেবারে তিরোহিত হয় নাই, ইতস্ততঃ তাহার স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে, একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। অন্যদিকে স্যার রাধাকান্তের ধর্মসভা রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গলার

পল্লীতে পল্লীতে হরিসভারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ এই বিচিত্র বিপ্লবের মধ্যে আত্ম-রক্ষার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টার পরিচয় দিতেছে। কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে যখন এইরূপ সংস্কার ও সংরক্ষণের বহুবিধ তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমাজ-চিত্তকে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিতেছে, তখন একদিন—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন।

যে ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাকে পরবর্তী জীবনে কার্য করিতে হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনারা পাইলেন। এই ক্ষেত্রের আবহাওয়া তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহাও সবিশেষ আলোচ্য। কিন্তু যেমন বংশানুক্রম তেমনি কেবল পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা ও ঘটনা-বৈচিত্র্য তাঁহার জীবনকে সম্ভব করে নাই। কোনও মহৎ জীবনকে তাহা করিতে পারে না।

তিনি প্রথম যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজে গিয়া যোগদান করিলেন কিসের প্রেরণায়? তখনকার দিনে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া আর প্রচলিত প্রথা বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একই কথা। যুবক নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ প্রচলিতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের বীজ প্রথম হইতেই অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছিল। ইহা তাঁহার প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান একটা ঘটনা বা উপলক্ষ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় মাত্র।

তাঁহার ধর্ম-জীবনের বিকাশের পরবর্তী স্তরে ব্রাহ্মধর্মের সেই সহজ জ্ঞানে সহজ-লভ্য বা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই বৎসরেই পরমহংসদেবের সহিতও তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে তখন সংশয়বাদের মতে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের সহজলভ্য আস্তিক্য-বুদ্ধি তখন পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাবে তাহার মন হইতে স্খলিত হইতেছিল। মানসিক বিকাশের ইতিহাসে ইহা তাঁহার পক্ষে এক অতি সঙ্কটকাল বলিয়া ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন।* এই সময়ে

**A fellow student's reminiscences by Dr. Brojendranath Seal*—"This was beginning of a critical period in his mental history. * * J. S. Mill, upset his first boyish theism and easy optimism which he had imbibed from the outer circles of the brahmo Samaj. The arguments from Causality and Design were for him broken. * * He was haunted by the problem of the Evil in Nature and Man. * * Hume and Spencer settled him in Scepticism. * * But music still stirred him * * gave him sense of unseen realities. * *

সংশয়বাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেও, ঈশ্বর লাভের জন্য এক তীব্র ব্যাকুলতা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। এই ব্যাকুলতার বশবর্তী হইয়াই তিনি এই সময় ইতস্ততঃ যার-তার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, মহাশয় আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ামুখে এই সংশয়বাদাচ্ছন্ন সংকটকালের এই প্রচণ্ড ধর্ম-পিপাসা, ঈশ্বরকে জানিবার জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহার জীবনকে সংশয় বা নাস্তিক্যবাদের মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই—ইহা তাঁহার জীবনকে গতিমুখে খরবেগে চালিত করিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে নাই। মানসিক বিকাশের পথে এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁহাকে নিরন্তর তাড়না করিয়া এক অতি বড় পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে।

তাঁহার বংশানুক্রম, তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁহার চারিদিকের মানসিক আব্-হাওয়া ছাড়াও তাঁহার ধর্মজীবনের বিকাশে আর একটি বস্তুর উল্লেখ অতিশয় আবশ্যক। বিবেকানন্দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলিয়া এক অতি প্রচণ্ড সারবান বস্তু ছিল এবং ইহা অতি প্রচুর পরিমাণেই ছিল। এই স্বাতন্ত্র্য বোধ, এই আত্মসংবিৎ, এই প্রবল সত্যানুরাগ, এই তীব্র ব্যাকুলতা—ইহা ছিল বলিয়াই কি হিন্দু-সমাজ, কি ব্রাহ্ম-সমাজ—কোন সমাজেই তিনি রাজা রামমোহনের ভাষায় "কেবল স্ববর্গের

It was at this time that he came to me. * * He asked for a course of Theistic philosophy. * * I named some authorities. But Intuitionists and Scotch commonsense school confirmed him in his unbelief. * * * I gave him a course of readings in Shelley. It moved him. I spoke to him of a higher unity that of *Para Brahma* as the Universal Reason. * * The Sovereignty of Universal Reason and the negation of the individual as the principle of morals satisfied his intellect * * gave him conquest over scepticism and materialism. * * But this brought him no peace. * * The conflict now entered deeper in his soul. * * His senses were keen and acute, his natural cravings and passions strong and imperious, his youthful susceptibilities tender, his conviviality free and merry. * * The struggle soon took a seriously ethical turn,—reason struggling for mastery with passion and sense. * * He confessed that Reason could not hold out arms to save him in the hour of temptation. * * He sougt for a power unto delivernce. This quest brought him to the Paramahansa of Dakshineswar, in a doubting spirit, who spoke to him with an authority as none had spoken before and by his *sakti* brought peace into his soul and healed the wounds of his spirit, * * finding assurance in the Saving Grace and Power of his Master he went about preaching and teaching the creed of the Universal Man and the absolute and inalienable sovereignty of the self. —"Life of Swami Vivekananda" by *Eastern and Western Disciples. p.p. 172—177.*

ক্রিয়ানুসারে কার্য করিতে" পারেন নাই। কেননা "তাহা পশু জাতীয়ের ধর্ম হয়।" তাঁহার প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা বস্তু ছিল যাহার জন্য তাঁহাকে সমস্তই নিজের চক্ষে দেখিয়া লইতে হইয়াছে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভব করিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেবকেও তিনি একদিনে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহাকে অনেক পরীক্ষা করিতে হইয়াছে—অনেক দিন লাগিয়াছে।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে রামকৃষ্ণদেবের সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতের দিনই রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর একদিন যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নভেম্বর মাসে ঘটে। পরমহংসদেব তখন দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া, তারপর ছয় বৎসর নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রায় সাত বৎসর যাবৎ দিব্য-ভাবের প্রেরণায় ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত আছেন। কেশবচন্দ্র ইহার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বেই আসিয়াছেন। রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিও দুই বৎসর পূর্বে আসিয়াছেন। এইবার নরেন্দ্রনাথ আসিলেন। সিন্ধু শেষ বিন্দুকে গ্রাস করিল। পৃথিবী বুঝিবা ইহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ যেদিন প্রথম আসিলেন সেই দিনই পরমহংসদেব নরেন্দ্রের সহিত পূর্বপরিচিত পরম আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যেন কতদিনের চেনাশুনা। পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, তুমি কেন এতদিন আস নাই, আমি যে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিয়া আছি। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথ সুরেশ (সুরেন?) বাবুর কলিকাতার বাড়ীতে পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন করেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সমাধিভাবাপন্ন করিয়া দেন। তাঁহাকে নররূপী নারায়ণ বলেন, সন্দেশ খাওয়ান এবং একা একদিন আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের একে বিচার-বুদ্ধি প্রবল, তার উপর ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে স্খলিত হইয়া তখন তিনি একদিকে যেমন সংশয়-বাদের মধ্যে পতিত হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে এই সংশয়বাদের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায় অন্বেষণে ইতস্ততঃ ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন যে, বাহির হইতে কোন একটা দৈবশক্তির অনুগ্রহে নরেন্দ্রনাথ এই সময় তাঁহার মানসিক সঙ্কট ও সংশয়ের অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা ঠিক তখনি এই মহামিলনের সূত্রপাত দেখা দিল। ইহা কি এক পরম আশ্চর্য ঘটনা নয়? ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ-কথিত এই দৈব-শক্তি, এই দেব-অনুকম্পা পরমহংসদেবের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। আপনারা জানেন, কেমন করিয়া ভবিষ্যের ইতিহাস এই ঘটনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিল।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রথম দিনের স্পর্শজনিত সমাধিকে অবিশ্বাস করিলেন। ভাবিলেন, ইহা একটা বাতুলতা মাত্র। দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় প্রায় একমাস পরে

দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের দিনেও রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণ পদ দ্বারা তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে সমাধিগ্রস্ত করিয়া দিলেন। সেদিনেও নরেন্দ্রনাথ ইহাকে একটা সম্মোহন-বিদ্যা বলিয়া মনে মনে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় দিনে অনেক লোকের ভিড় ছিল। রামকৃষ্ণদেব এইদিন নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সমীপবর্তী যদু মল্লিকের উদ্যানবাটিতে গমন করিলেন এবং সেদিনেও নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া সমাধিভাবাপন্ন করিলেন। তৃতীয় দিনে সমাধিভাবাপন্ন হইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ওগো তুমি আমার এ কি কর্‌লে? আমার যে বাপ মা আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তবে এখন থাক্। একবারে কাজ নেই, কালে হবে।"

এইদিন রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের মনে সত্যিকারভাবে গভীর প্রশ্ন-সমূহ উত্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? আমার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন যুবককে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল স্পর্শমাত্রে সংজ্ঞাহীন করিয়া দিতে পারে যে শক্তি, সে শক্তি কিসের? এই অর্ধ-উন্মাদ পূজারী ব্রাহ্মণ কি সেই শক্তির ধারক-বাহক-ও-পরিচালক? কে ইনি? স্বামী সারদানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" লিখিয়াছেন যে, প্রথম সাক্ষাতের ৩।৪ বৎসর পর তবে নরেন্দ্রনাথ, পরমহংসদেবের নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে, পরমহংসদেবের দেহরক্ষার মাত্র বৎসর খানেক পূর্বে নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিলেন। গুরুবাদ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট, পাশ্চাত্য সংশয়বাদমূলক দর্শনাদির নিকট যে সমস্ত শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন তাহা এই-রূপে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মধর্মের নিকট হইতে যে সগুণ নিরাকার এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও একদিনে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কোন কিছু পরিত্যাগ করিতে হইলে মানুষ তাহা একদিনে পারে না। পরমহংসদেব, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তাঁহাকে 'অষ্টাবক্রসংহিতা' প্রভৃতি অদ্বৈতবাদমূলক শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িতে দিতেন। কিন্তু হইলে কি হয়, নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, আমি আর—ঈশ্বর এক, এরূপ ভাবা মাথা খারাপের লক্ষণ। আর ইহা পাপও বটে। এককালে পাপবোধও নরেন্দ্রনাথের ছিল। তা'ছাড়া অদ্বৈতবাদের যে ব্রহ্ম, সে ত একরকম নাস্তিকতার নামান্তর মাত্র। ঘটি ঈশ্বর, বাটি ঈশ্বর—এ সব যদি পাগলামি না হয় ত পাগলামি কি গাছে ধরে? শ্রীরামপুরের পাদ্রী-মহোদয়গণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা ডফ্ একদিকে; আবার অন্যদিকে উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের তরফ হইতে অদ্বৈত-বাদের বিরুদ্ধে ঘোর রোলে এই কথাই বলিয়া আসিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব আবার একদিন নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিলেন, নরেন্দ্রর অদ্বৈতানুভূতি হইতে আরম্ভ হইল। জগৎ আছে কি নাই, হুঁস নাই। হেদুয়ার রেলিংএ মাথা ঠুকিয়া তবে বিশ্বাস করিতে হয় যে, তিনি জাগিয়া আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন। ধর্মজীবনের পরিবর্তন মুখে তাঁহার এক সময়ের স্বীকারোক্তিতে বলিতে হয় যে, এইবার পরম-

হংসদেবের স্পর্শে অদ্বৈত বা অখণ্ডের সমাধিতে মগ্ন হইয়া সত্যই নরেন্দ্রনাথের মাথা খারাপ হইল! ধর্মজীবনে মতের পরিবর্তন কি অদ্ভুত! প্রচারক-জীবনের গৌরবময় স্তরে আমরা দেখিতে পাই, এই নরেন্দ্রনাথ কি প্রচণ্ড তেজের সহিত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন স্তরের যোগসূত্র কোথায়? এই দুই বিভিন্ন স্তর—আমরা একের পর আর কেন দেখিতে পাইলাম? ইহা কি ঘাত-প্রতিঘাতমুখে আপনাতে আপনি বিকাশ? স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার কি তাঁহার সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় না ইহা তাঁহার গুরুদেবের ইচ্ছায়? ইহা কি তাঁহার স্বভাবের বিকাশ না পরমহংসদেবের প্রভাব? এ মত-পরিবর্তন কেন হইল, কে করিল? জীবনে সমস্ত সমস্যার উত্তর মিলে না। জীবনের সমস্ত অংশটা আমরা দেখিতে পাইনা। যাহা আমাদের লোকলোচনের অন্তরালে সংঘটিত হয়, তাহার অনেক কারণ ঐতিহাসিক জীবনচরিত লেখক বা তীক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদের নিকটেও অদ্যাবধি অজ্ঞাত। কাজেই সমস্ত সমস্যারই উত্তর দিবার চেষ্টা করা বৃথা শক্তিক্ষয় না হইলেও অনেকটা পণ্ডশ্রম ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "আমাদের বেদান্তে ফিরিয়া আসা" অপেক্ষা নরেন্দ্রনাথের অদ্বৈত বেদান্তে ক্রম পরিণতি লাভ করা অধিকতর চমকপ্রদ, পরম আশ্চর্য এবং অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এইবার নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ উপস্থিত। সময় বুঝিয়া জ্ঞাতিরা ভদ্রাসনখানি গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত। বাঙলা দেশের জ্ঞাতিরা ইহা করিয়া থাকেন। ভ্রাতা, ভগিনী ও বিধবা মাতাকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ কপর্দকহীন নিঃসম্বল। আহার কোন দিন জুটিত, কোনদিন জুটিতনা। যাহার বাল্য ও কৈশোর সমৃদ্ধির ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছে, অদৃষ্ট চক্রের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে সহসা একদিন যদি তাহাকে পথের ধূলিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহারা ছিল তাহারা যদি ঘরে গিয়া দুয়ার দেয়, যদি তাহার দিনান্তে একমুষ্টি শাকান্নও না জুটে, তবে ভুক্তভোগী ভিন্ন সে কষ্ট কে বুঝিতে পারিবে? হে বাঙলার যুবকগণ, তোমাদের মধ্যে কতজনই না এইরূপ বুভুক্ষিত হইয়া আজ এই সহরের পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছ, তোমাদের গৃহে ভ্রাতা, ভগিনী ও বিধবা মাতা অনাহারে তোমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, তোমরাও কি নরেন্দ্রনাথের এই কালের অবস্থাটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না? এই সময় নরেন্দ্রনাথের পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আর জুতা কিনিয়া পরিতে পারেন নাই, এই সহরে নগ্নপদে একদিন পথ চলিতে হইয়াছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ছিন্ন মলিনবাসে আবৃতদেহ এই নিরুপায় অভিমানী যুবা সহরের সমস্ত বড় বড় অফিসের দরজায় সামান্য বেতনের একটি চাকরীর জন্য মাথা খুঁড়িয়া যখন ব্যর্থ মনোরথে সমস্ত দিনের উপবাসের পর ক্ষুধায় ও চিন্তায় জর্জরিত দেহমন লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন সহসা বৃষ্টি আসিয়া গতিরোধ করিল। তিনি পথের পার্শ্বে প্রথমে দাঁড়াইলেন, পরে আর

না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন, অবশেষে সমস্ত রাত্রি পথের পার্শ্বে পড়িয়া নিদ্রায় অচৈতন্য রহিলেন।

বন্ধুগণ! সংসারে ইহাও সম্ভব। সমস্ত পৃথিবী একদিন যাহার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিল, এই সহরে ভাবিতে পার একদিন তাঁহার জন্য একমুষ্টি খাদ্য মিলে নাই! এই ক্ষুধিত কেশরী এই লোকারণ্যময় গহনে একদিন না খাইতে পাইয়া যে শক্তিকে উদ্বোধন করিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ ভূ-ভারতে আজ এমন অন্ধ কে আছে যে তাহার জাজ্বল্যমান ফল দেখিতে পাইতেছে না? যাহার দিক হইতে সকলে মুখ ফিরায়, বুঝিবা অলক্ষ্যে কিছু আছে বা কেহ আছে, তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায়!

নরেন্দ্রনাথের দৈন্যাবস্থা পরমহংসদেব জানিতে পারিলেন। মায়ের কৃপায় মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হইল। সে বিস্তারিত বিবরণ আপনারা 'লীলা-প্রসঙ্গে' পাঠ করিবেন। নরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চাঁপাতলার স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন,—মাত্র চারি মাসের জন্য।

এই দারিদ্র্যের মধ্যে সুখী লোকের ভগবান আবার অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিল। নরেন্দ্রনাথ শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বে একদিন প্রভাতে ভগবানের নাম লইতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মা ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান, আর ভগবান। ভগবান ত সব কল্লেন।" ইহার আঘাতও বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিকাশে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। "যে ভগবান আমাকে ইহলোকে খাইতে দিতে পারেন না তিনি যে পরলোকে আমাকে সুখে রাখিবেন তাহা আমি বিশ্বাস করিনা।"

তারপর এইবার নরেন্দ্রনাথ রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিতা মৃন্ময়ী কালীর মধ্যে চিন্ময়ী মূর্তিও দেখিতে পাইলেন। ইহাও সম্ভব হইল। আমার সামান্য ধারণা এই যে, জীবনের বিকাশে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। আজ যাহা অসম্ভব, কাল তাহা অত্যন্ত সম্ভব। ইহা বিচিত্র, ইহা অদ্ভুত। তথাপি ইহা জীবন, ইহা সত্য, ইহা প্রত্যক্ষ।

ধর্মজীবনের বিকাশের পথে কি করিয়া যে অসম্ভবও সম্ভব হয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে তাহা আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেন। পরমহংসদেবের দেহভস্ম লইয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। নরেন্দ্রনাথের উদারতায় কলহের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি একদল গোঁড়া শিষ্যেরা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পরমহংসদেবের নামে একটি পৃথক্ সম্প্রদায় করেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর হইতেই স্বীয় মতাবলম্বী গুরুভ্রাতাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। বরাহনগর মঠে সর্বপ্রথম এই সঙ্ঘবদ্ধ কার্যের সূত্রপাত দেখা যায়! বর্তমান ভারতের প্রথম বৈদান্তিক সন্ন্যাসী

এই সংঘ-গঠন কল্পনায় তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তারপর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। উপর্যুপরি দুই দুই বার পীড়িত হইয়াও তিনি সাক্ষাৎভাবে সমগ্র দেশের পরিচয় না লইয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পর তিনি দু' তিন বৎসর বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে বাস করেন। তারপর হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে পর্যন্ত তিনি ভারত ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। বর্তমান ভারতকে জানিতে হইলে ইহার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে জানিতে হয়। নরেন্দ্রনাথ তাহাদের পরিচয় নানা সম্পর্কের ভিতর দিয়া ইতিপূর্বেই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের ছাড়া ভারতবর্ষের আরও দুই শ্রেণীর মনুষ্যকে জানা প্রয়োজন! ভারতের করদ ও স্বাধীন নরপতিগণ—যাঁহারা ইংরাজের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করিয়া নামমাত্র কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা অদ্যাবধি রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহার কোটী কোটী দীনদরিদ্র সর্বত্র ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন জাতির মনুষ্য সমষ্টি—যাহারা আজ ক্ষুধার তাড়নায় জীবন্ত নরকঙ্কালে পর্যবসিত হইয়াছে—এই দুই শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার প্রায় ৪।৫ বৎসর কাটিয়া গেল।

এইরূপে ভারতের সর্বশ্রেণীর মনুষ্যদের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে আমেরিকাস্থিত চিকাগো সহরের ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম-মহাসভায় যাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন একত্রিশ বৎসর মাত্র। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় বাঙ্গলাদেশ তখন স্বামী বিবেকানন্দকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় স্বজাতীয়েরা তাহাদের মহাপুরুষকে চিনিতে পারে না।

আপনারা সকলেই জানেন চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক গুরুকৃপায় কিরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সম্মুখে এই চিকাগো ধর্মসভার মধ্য দিয়া স্বামিজীর অভ্যুদয় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। কিসে ইহা সম্ভব হইল? কেই বা জানিত এইরূপ হইবে? স্বামিজীর ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশের এই আলোচনায় এই ঘটনার অতিবিস্তৃত বর্ণনা দ্বারা আপনাদিগকে আমি বিব্রত করিব না। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এ যুগের ইতিহাসে স্মরণীয়। কেননা, ঐ বৎসর দেওয়ান রামমোহন দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করিয়া ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দও বাঙ্গলার ইতিহাসে স্মরণীয়। কেননা এই বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। এ যুগের বাঙ্গলার ইতিহাসে এই দুইটি তারিখ স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

আমেরিকা হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ডে প্রচার শেষ করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

করেন। অশোকের পর ভারতের বাহিরে এত বড় ধর্মের প্রচার ভারতেতিহাসে আর দেখা যায় না। বাঙগলার শিক্ষিত অথচ উপেক্ষিত যুবকগণ, মনে রাখিও—বাঙগলা-দেশে তোমাদের মত একজন উপেক্ষিত যুবক ইহা একদিন এ যুগেও সম্ভব করিয়া দিয়া গিয়াছে।

তখন আলমবাজারে মঠ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ গঙ্গার পশ্চিম পারে নীলাম্বর মুখার্জির উদ্যানে মঠ উঠাইয়া আনিলেন। তারপর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে তিনি রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বিধিমত সঙ্ঘবন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার তাঁহার গুরুর নির্দেশ অনুসারে প্রায় সমস্ত কর্মই শেষ হইয়া আসিল।

কিন্তু এখনও তাঁহার অদ্ভুত ধর্মজীবনের সমস্ত বিকাশ শেষ হইয়া যায় নাই। এই বৎসরেই তিনি কাশ্মীর ভ্রমণে বহির্গত হন এবং ক্ষীর-ভবানীর মন্দিরে গিয়া বিজয়ী মুসলমান কর্তৃক মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, তিনি ঐ মুসলমান আক্রমণের সময় জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এই মন্দিরটি ভগ্ন হইতে দিতেন না। এই প্রকার আক্ষেপ বীরোচিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে। মা ভবানী, দৈববাণী করিলেন যে, এ তোমার কিরূপ স্পর্ধা! আমি তোমাকে রক্ষা করিব, না তুমি আমাকে রক্ষা করিবে! আমি কি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তে সপ্ততল সোনার মন্দির নির্মাণ করাইতে পারি না? রজোগুণাচ্ছন্ন উদ্ধত, শান্ত হও।

বিবেকানন্দের চৈতন্য হইল। বিজয়ী বীর যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার মানসিক বিকাশের পথে যে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল তাহার সঙ্গে তুলনায় পূর্বের অন্যান্য পরিবর্তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যদিও বিবেকানন্দের আত্মনির্ভরশীলতা তাঁহার মানসিক বিকাশে কোন স্তরেই স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় নাই, তথাপি এই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন একটা প্রখর স্বাজাত্যাভিমান নিয়ত জাগ্রত ছিল যে, অনেককে তাহার তীব্রতা কষ্টের সহিত অনুভব করিতে হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল এ যুগে পৌরুষের প্রচণ্ড অবতার সন্ন্যাসী, ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে দৈববাণীর পর হইতে যেন মরিয়া গিয়া আর এক ভিন্ন মানুষ হইলেন। কে জানে, হয়ত সেইটাই তাঁহার ভিতরের মানুষ বা "পাকা আমি" কিনা? আর তাঁহার নিজের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের কোন স্পৃহা বড় একটা দেখা গেল না। তিনি ঐ বৎসরই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করিলেন বটে কিন্তু এবার যেন সেই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের উগ্র প্রচারক মরিয়া গিয়াছে, এবার তিনি শুধু দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বেড়াইয়া আসিলেন।

তাঁহার এই সময়ের মনের অবস্থা অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁহার একখানি চিঠিতে

এই সময়ের মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় আপনারা পাইবেন। তজ্জন্য চিঠিখানি দীর্ঘ হইলেও আমি তাহা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কালিফোর্ণিয়া
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০।

কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মন-প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্ছি। লড়াইয়ে হার জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরা নেইয়া"—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু।

যতই যা হ'ক্, জো, আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক্ হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত! ঐ বালক ভাবটাই হচ্চে আমার আসল প্রকৃতি—আর, কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছু কালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুল্‌চে। বন্ধন সব খসে যাচ্ছে। মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে। কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে: জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই! ঐ তিনি বল্‌ছেন—"মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে, সংসারের ভালমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুক্‌গে। (তুই) ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছে পিছে চলে আয়।"—যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সাম্‌নে অপার নির্বাণ সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তি ভঙ্গ কচ্ছে না!

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি; এত যে দুঃখ ভুগেছি. তাতেও খুসী; জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুসী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুসী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমায় মুক্তি

দিক্, অথবা দেহ থাক্‌তে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে এটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।...অনেকদিন হ'ল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বলবার আর অধিকার নেই।...তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাক্‌তুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, —দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত! আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়। প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়।
ইতিপূর্বে আমার কর্মের ভিতর মান যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে, তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে—যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত, অদ্ভুদ রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!
আহা? হা—কি স্থির প্রশান্তি চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে! আর শান্তি,—মধুর, মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখছি, শুনছি সকলকে ছেয়ে রয়েছে। মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই, প্রভু যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে; কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্ছে না, কুৎসিতও বোধ হচ্ছে না।—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে। কেননা, নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভালমন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে। আর, সর্বাপেক্ষা উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্বে যে বোধটা ছিল, সকলর আগে সেটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে। ওঁ তৎ-সৎ।

তোমাদেরই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর তিনি আবার বেলুড়মঠে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে রাত্রে ঠিক নৈশভোজনের পূর্বে ফিরিয়া আসিলেন। সে এক অতি হাস্যকর উপাদেয় ঘটনা যাহা বালকস্বভাব বিবেকানন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী পূর্ববঙ্গ প্রচারে বহির্গত হইলেন, সাধু নাগ মহাশয়ের পর্ণের কুটীরকে এই পৃথিবীবরেণ্য ধর্মপ্রচারক তীর্থজ্ঞানে অভিবাদন করিয়া আসিলেন। পর বৎসর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। দেহের গতি দেহলাভ করিল। আত্মার অবিরাম গতি আবার কোন-মুখে কোন দিকে ধাবিত হইল বা হইল কিনা কে বলিবে, কেইবা তাহা জানে।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের বিচিত্র বিকাশের যে ইতিহাস, আমি তাহার এক অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এবারের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আশা করি আপনাদের মধ্যে এই আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া নানাদিক হইতে ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত হইয়া উঠিবে।

সম্পূর্ণ

॥ শ্রীগিরিজাশংকর রায়চৌধুরী প্রণীত ॥

॥ শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ ॥

॥ ভগিনী নিবেদিতা ॥
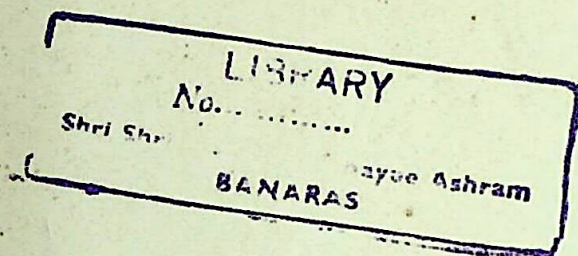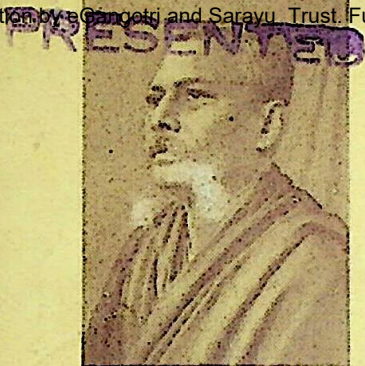
শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

জন্ম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার তুয়াজানী গ্রামে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে বি. এ. পাশ ক'রে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞান-রাজনীতিতে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাশ করেন। ছাত্র জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও রামমোহনীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনি 'দেবালয়' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করেন ও ১৯১৬।১৭ থেকে ১৯২১।২২ পর্যন্ত 'নারায়ণ'-এর সম্পাদনার ব্যাপারে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বীরভূম, দেবালয়, নারায়ণ, উদ্বোধন, ভারতবর্ষ, জয়শ্রী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় ১৯১০।১১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় ৪৫ বছর অবধি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক ও সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত দেশবন্ধুর 'রামপ্রসাদ', 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য', 'রাজা রামমোহন রায়' (জীবন চরিতের নূতন খসড়া), 'প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী-যুগ', 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এডভোকেট হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল প্র্যাক্টিসও করেন। তিনি একজন সুবক্তা ও সার্থক সাংবাদিক। তাঁহার কৃতি সাংবাদিক ছাত্রদের ভিতর ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অন্যতম। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও আনন্দবাজার প্রভৃতি বহু পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এককথায় বাংলার মননশীলতার ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থকারের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।